বিভ্রান্ত নিশান

আবু আহম্মদ ফজলুল করীম

বিভ্রান্ত নিশান

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐতিহাসিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দর্শন।

আবু আহম্মদ ফজলুল করীম।

(আল করীম ও জরীন চশম)

"মুসলমান কে হিন্দু করা সম্ভব নয়। কিন্তু হিন্দীভাষী করা সম্ভব। আমাদের এই সেকুলার রাষ্ট্রে এমন একটি দল আছে, যে মুসলাান কে পারলে বিতাড়ন করবে, না পারলে হিন্দুবানাবে। তাও যদি না পারে, তবে সংস্কৃতির দিক থেকে হিন্দুতে পরিণত করবে"।----অন্নদা শংকর রায়।

[বি, দ্র. 'বিভ্রান্ত নিশান' বাংলাদেশী জাতীয়তবাদ-- স্বাধীনতা সংহতি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। পৃঃ ৩৮]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিভ্রান্ত নিশান

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দর্শন।

প্রকাশকঃ আবু আহম্মদ ফজলুল করিম।
প্রকাশ কালঃ- ভাদ্র, ১৪০২
সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫
[প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদঃ হাফিজুল্লাহ কবির

প্রাপ্তিস্থানঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ
ও নওরোজ সাহিত্য সম্ভার
বাংলাবাজার, ঢাকা।
মডার্ণ বুক সেন্টার
ইসলামিয়া মার্কেট,
নীলক্ষেত, ঢাকা।

বর্ণ সংযোজনঃ গ্রাফিক স্ক্যন লি:
৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায়ঃ কালার লিংক,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

শুভেচ্ছা বিনিময়ে ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

বিভ্রান্ত নিশান

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐতিহাসিক,
রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দর্শন।

উৎসর্গ

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী
ঈমানী শক্তির উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

বিভ্রান্ত নিশান

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতির দর্শন।

মোনাজাত

ইয়ারব,

তোমার এই গোনাগার বান্দার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা ও শ্রমলব্ধ এই 'বিভ্রান্ত নিশান' প্রকাশকালে, হে আমার পরওয়ার দেগার,

তোমার আরশ মোবারক তলে

বান্দার এই আরজ--

সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী এই "বিভ্রান্ত নিশান" যদি তোমার রহমে দেশের বিপথগামী আত্ম বিস্মৃত কোন বান্দাকে বিবিধ বিভ্রান্তি হতে রক্ষা পেতে সহায়ক হয় তাহলে তার বরকতে,

হে গফুরুর রহিম, রহমানের রহিম,

রসূলে করীমের (দঃ) পাক রুহ মোবারকের উপর সালাম পৌঁছিয়ে দিও এবং তার বরকতে সালাম পৌঁছিয়ে দিও সকল ইমানদার বান্দার রুহের উপর-খাস করে সত্য সন্ধ, সত্য, পথাবলম্বী আমার আব্বা হুজুরের রুহের উপর, দুই আম্মা হুজুরের রুহের উপর এবং সকল মরহুম আত্মীয়-স্বজনের রুহের উপর।

হে আল্লাহ,

আমীন, সুম্মা আমীন।

তোমার গোনাগার এক বান্দা

আবু আহম্মদ ফজলুল করীম।

১/৯/৯৫ ঢাকা।

www.pathagar.com

বিভ্রান্ত নিশান সম্বন্ধে অভিমত ও সমালোচনা

আমার ছাত্র জীবন থেকেই জনাব আবু আহমদ ফজলুল করীম লেখক হিসাবে আমার পরিচিত। তবে এই নামে নয়। আল করিম ও জরীন চশম ছদ্মনামে তিনি লিখতেন। এই দুই নামেই তাকে আমি জানতাম।

ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে আমার জানাশুনা অনেক পরে। সাংবাদিকতা নিয়ে আমি ঢাকা আসার পর।

তার লেখার ভক্ত হিসাবে আমার শুরু থেকেই মনে হয়েছে তিনি 'শখ' এর লেখক নন, 'প্রয়োজন' এর লেখক। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতি হিসেবে মুসলমানদের সংগঠিত হবার যে প্রয়াস এবং লক্ষ্যে পৌঁছার যে সংগ্রাম জনাব আবু আহমদ ফজলুল করীম জাতির সে প্রয়াস এবং সংগ্রামের প্রয়োজনকেই লেখার উপজীব্য বানিয়েছেন।

১৯৪৭ এর ভারত বিভাগ এবং ১৯৭১ এর স্বাধীনতার পরেও তার লেখার মূল বিষয় বদলায়নি। কারণ লেখকের মতে জাতির বিকাশ এবং জাতি গঠনের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি।।

এই শেষ না হবার বিষয়টিই বক্ষ্যমান গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। আমি মনে করি প্রবন্ধের বক্তব্য গুলি শুধু পাঠকের মনকে নাড়াই দেয়না তাকে পথও প্রদর্শন করে যা আমি মনে করি আজকের দিনে খুব বেশী প্রয়োজন।

আবুল আসাদ

সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম।

১৮/১২/৯৪

অভিমত ও সমালোচনা

প্রবীন লেখক আবু আহমদ ফজলুর করীম প্রণীত 'বিভ্রান্ত নিশান' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিষয়ের উপরে তথ্য ধর্মী ও বিশ্লেষনাত্মক আলোচনার পরিচয় পেয়েছি।

প্রকাশিত গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যে ধারা অনুসৃত হয়েছে, তার সাথে আমি পুরোপুরি একমত হতে না পারলেও এ জাতীয় বিতর্ক অব্যহিত থাকা আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করি এ গ্রন্থ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অধিকতর আলোচনায় উৎসাহ যোগাবে।

সৈয়দ জাফর

যুগ্ম সম্পাদক, দৈনিক দিনকাল।

৭/১/৯৫

www.pathagar.com

অভিমত ও সমালোচনা

বাংলাদেশের জন্মের পর দুই দশককাল অতিবাহিত হতে চলেছে; কিন্তু এখনও আমাদের জাতিসত্ত্বার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতদ্বৈধতার অবসান হয়নি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, একটি মহল আমাদের জাতীয়তার পরিচিতি হিসাবে কারণে-অকারণে বাঙ্গালীত্বের ঢোল পেটানোর কোশেশ করে থাকেন। অবিভক্ত বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষাভাষীদের উপেক্ষা করে কেন তদানীন্তন পাকিস্তানে স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিল সেই সিদ্ধান্তের মধ্যেই আমাদের জাতীয়তা তথা জাতিসত্ত্বার মূল যোগসূত্রের সন্ধান করা প্রয়োজন। একথা আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ঠ যে, উপমহাদেশের মুসলমানদের জাতীয়তাবাদ মূলতঃ তাদের ধর্মীয়, ঐতিহ্যগত, তামুদ্দনিক স্বাতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা দীর্ঘকাল থেকেই অব্যাহতভাবেই চলে আসেছে। এহেন প্রচারণার অসারতা নিয়ে প্রবীণ লেখক জনাব এফ, করীম 'বিভ্রান্ত নিশান' নামে একটি কলাম- এ আগামীকাল ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করবেন তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর একটি চমৎকার বিশ্লেষণ। এর পাশাপাশি আমাদের জাতিসত্ত্বার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করাও হবে 'বিভ্রান্ত নিশান' এর অন্যতম প্রতিপাদ্য।

দৈনিক মিল্লাত- ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

www.pathagar.com

অভিমত ও সমালোচনা

বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর '৯২ তারিখে 'দৈনিক মিল্লাত' বিভ্রান্ত নিশান' কলামে আল-করিম পরিবেশিত 'বাঙ্গালী বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' শীর্ষক যে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে তা অনেকেরই চক্ষুরুন্মীলন ঘটিয়েছে। আমারা 'বাঙ্গালী' না বাংলাদেশী এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে অনেকেই ভুগছিলেন। মিল্লাতে প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদনটি পড়লে নিশ্চয়ই তথাকথিত বাঙ্গালীদেরও ভ্রমোপনোদন করা সম্ভব হবে।

এদশে নামধারী মুসলমান-যাঁরা 'বাঙ্গালী' হওয়ার জন্য আদা পানি খেয়ে লেগে গেছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করছি-বসন্তবাবুর প্রদত্ত সংজ্ঞা (১৯৭৩ সালে দিল্লী হতে প্রকাশিত বসন্তকুমার চ্যাটার্জি কর্তৃক লিখিত 'Inside Bangladesh to day') এবং বিশ্লেষণানুযায়ী তাঁরা 'বাঙ্গালী' হতে চান কিনা, চাইলেও হতে পারবেন কিনা। তিনি বলেছেন- ' এই বাঙ্গালী' ভদ্রলোকের সমাজ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ নামে সুপরিচিত। এই তিন শ্রেণীর উচ্চবর্ণের হিন্দু সমবায়ে বাঙ্গালী গঠিত। আমাদের যাঁরা বাঙ্গালী হতে চান- তাঁরা কি ব্রাহ্মণ না বৈদ্য না কায়স্থ? কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত না হলে বাঙ্গালী হবেন কিভাবে? তিনি আরও বলেছেন, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের শ্রেণীভুক্ত হতে হলে-আদি হিন্দু হতে হবে।' যাঁরা এদেশে বাঙ্গালী রূপে পরিচিত হতে চান তাঁরা কি 'আদি হিন্দু'? দীক্ষিত বা নয়া হিন্দু হলেও তো 'বাঙ্গালী' হওয়া যাবে না। তবে তাঁরা 'আদি হিন্দু' হিসাবেই কি পরিচয় দিয়ে যাবেন? শেষে বসন্তবাবু মন্তব্য করেছেন- 'কোন নিম্নবর্ণের প্রকৃতিপূজক হিন্দু বা উপজাতীয় বা মুসলমান অথবা অন্য কোন শ্রেণীর কেউ কখনও 'বাঙ্গালী বলে পরিচিত হতে পারে না তা সে যতই না কোন বাংলা বলতে পারুক- বা তার সামাজিক অবস্থা ও বিদ্যাবত্তা যাতই হোক না কেন। নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও বাংলা বললেও সামাজিক অবস্থা ও বিদ্যাবত্তা থাকলেও যেখানে বাঙ্গালী হতে পারবে না সেখানে আমাদের মধ্যকার তথাকথিত মুসলমানরা বাঙ্গালী হওয়ার দুরাকাংখা করছেন কিভাবে?

-দৈনিক মিল্লাত ৪/১০/৯২

www.pathagar.com

বিভ্রান্ত নিশান

সূচিকা

		পৃষ্ঠা
১।	পেশ কালাম-লেখকের কৈফিয়ত	১২
২।	বাঙ্গালী বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ	১৯
৩।	সার্বভৌম বাংলাদেশ বনাম বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ	২৩
৪।	বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, সংহতিঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন	২৯
৫।	উপ মহাদেশে আর্য্য সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন	৩৯
৬।	হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবদের আদর্শিক দ্বন্দ্ব	৪৩
৭।	বাঙ্গালী বর্ণ হিন্দুদের ইসলামী ঐক্য ভীতি	৪৫
৮।	ভাষা আন্দোলনে মিঃ জিন্নাহ	৫৫
৯।	হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা	৬৪
১০।	বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা	৭৫
১১।	রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদঃ মুসলিম বিদ্বেষ	৮৬
১২।	আগ্রাসনবাদী হিন্দু সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ	১০০
১৩।	রবীন্দ্রনাথের দেশ প্রেম ও বিপ্লবী মানসের স্বরূপ	১০৭
১৪।	রবীন্দ্রনাথের প্রজাপীড়ক দরিদ্র শোষকের ঐতিহ্য	১১৪
১৫।	নজরুলের দেশ প্রেম ও বিপ্লবী মানস	১২১
১৬।	দেশ প্রেমের নিরীখে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল	১২৯
১৭।	পুনশ্চঃ	১৩২
১৮।	ছবি পরিচিতি	১৭৩

সংসক্তি

ক -	ইতিহাসের রূপান্তর ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একদিক	১৩৯
খ -	বাংলাদেশ গঠনে কৃতিত্ব-ইন্দিরা, মুজিব না জিন্নাহর	১৪৭
গ -	নেহেরু, জিন্নাহ এবং ভারত বিভাগ	১৫১
ঘ -	উপমহাদেশ যখন বিভক্ত হলো	১৫৬
ঙ -	১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময় বঙ্গদেশ বিভক্ত হল কেন? কারা ভাগ করল?	১৬৩
চ -	ভারত বিভাগ কেন হল?	১৬৭
ছ -	মহারাষ্ট্র পুরান	১৭১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পেশ কালাম

লেখকের কৈফিয়ত

বাংলাদেশের জন্মের পর একযুগের অধিককাল অতিবাহিত হতে চলল কিন্তু এখনও দু' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবিনাশী গুরুতর মতদ্বৈততা বিদ্যমান। অথচ এর নিরসন আজ অত্যন্ত জরুরী। কথাটা আমাদের জাতীয়তা সম্বন্ধে। এই দেশে-পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কর্তৃক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ও স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এই বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে– পশ্চিমবঙ্গসহ বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে ছড়িয়ে পড়া বাংলা ভাষাভাষী 'বাঙ্গালী' নামধারী বাংলাদেশ বহির্ভূত সকল জনগোষ্ঠীর স্বার্থে নয়। উল্লেখ্য, এই সংগ্রামের সহযোগিতা প্রদান করেছে দেশের এমন অনেক জনগোষ্ঠী যাদের কেউ কেউ বাংলাভাষাভাষী নয়। অর্থাৎ যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, অর্থাৎ যারা 'বাঙ্গালী' নয়। যেমন, কিছু উর্দুভাষী অবাঙ্গলী, যথা নওয়াবজাদা খাজা নসরুল্লা, বিশিষ্ট শিল্পপতি মিঃ ইসপাহানী (ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা), পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালী চামকা, মিজো সম্প্রদায়, মোমেনশাহী জামালপুরের অবাঙ্গালী গারো উপজাতীয়গণ ও দিনাজপুরের সাঁওতাল উপজাতীয়গণ।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত এই সকল সম্প্রদায়ের জনগণের স্বার্থে, যাদের রাজনৈতিক পরিচিতি প্রকাশে বাংলাদেশী বলা যায় কিন্তু কোনক্রমেই 'বাঙ্গালী' বলা চলে না। অন্যথায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসামের বাংলাভাষাভাষীদেরকেও এক রাষ্ট্রীয় গন্ডীর মধ্যে এনে একইভাবে তাদের স্বাধীনতা অর্জন হতে পারতো, এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি এবং তা হতে হতো সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এই অঞ্চল ভারত হতে ছিনেয়ে নিয়ে যেমনটি হয়েছিল বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে-অবশ্যই এই সকল অঞ্চলের বাংলাভাষী জনগণের সক্রিয়, সশস্ত্র সহযোগিতার মাধ্যমে। সেই সঙ্গে যুক্তযুক্তভাবেই বাংলাদেশের উপরোক্ত অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর আনুগত্যের দাবী পরিত্যাগ করার প্রশ্নও প্রকট হয়ে দেখা দিত। অবশ্য 'বাঙ্গালী' জাতীয়তাবাদের অপর এক ফলশ্রুতি হতে পারে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দুর্লভ এই স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে 'বাঙ্গালী' নামধারী উক্ত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এক হয়ে ভারত রাষ্ট্রে বিলীন হয়ে যাওয়া। যদিও বাংলা ভাষা এবং দু'শ বছরের ব্রিটিশ গোলামির আমলের

www.pathagar.com

পরিচিতি "বাঙ্গালী" নামটুকু ছাড়া বাংলাদেশের অন্তত এগারো কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উপরোক্ত বাংলাদেশ বহির্ভূত "বাঙ্গালী" নামধারী প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর কোন আত্মিক সম্বন্ধে, নাড়ীর যোগসূত্র নেই এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যগত, সংস্কৃতিগত এবং ঘরোয়া কথাবার্তার পরিভাষার দিক দিয়ে যাদের সঙ্গে মিলের চাইতে গরমিল বেশি। জাতীয়তার পরিচিত সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন অথরিটি-বিশেষজ্ঞ মিঃ রেনান বলেন, একটি জাতি হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা বিভিন্ন ঐতিহ্য পরম্পরায় আত্মার সম্বন্ধে একীভূত-শুধুমাত্র ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে এক ভূখন্ডে বসবাসকারী নয়। এ ক্ষেত্রে ভাষাও একমাত্র বিবেচ্য নয়, যদিও অন্যান্যের মধ্যে ভাষাও এক গুরুত্ববহ উপদান। এই আত্মিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপার ধর্মবিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম যদিও সেই সঙ্গে সম ঐতিহাসিক ঐতিহ্যগত পটভূমিও সবিশেষ গুরুত্ববহ।

এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহুদী জাতি, অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও যাদের কোন নিজস্ব রাষ্ট্র বা আবাসভূমি ছিল না-অন্ততপক্ষে বিগত দুই-আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে। দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া আরবী, মধ্য আমেরিকান, ব্রিটিশ, জার্মান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ ইহুদীদের মধ্যে ভাষাগত একাত্মতাও ছিল না। তবুও প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরে বিশ্বের সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করেও মাতৃভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের জাতীয়তা ইহুদীই ছিল। কারণ তাদের সবার মধ্যেই সেই মূল ভিত্তি, ধর্মীয় ঐক্যবন্ধনের কারণে পরস্পরের মধ্যে আত্মার নিবিড় সম্বন্ধে নাড়ীর যোগসূত্র অক্ষুণ্নই ছিল।

এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, এদেশীয় কোন কোন বৈদগ্ধশালী ব্যক্তি সভাসমিতিতে তাদের কথনে, বলনে এবং কাগজে, বই-পুস্তকে, তাদের লেখনে, আমাদের জাতীয়তার পরিচিতি হিসাবে কারণে-অকারণে বাঙ্গলিত্বের ঢোল পিটানোর প্রচষ্টা চালিয়ে থাকেন–যদিও তারা স্বাধীন-সার্বভৌম এই বাংলাদেশেই বসবাসকারী এবং সেই হিসাবে যদিও এই দেশের স্বার্থ রক্ষা করা ও এই দেশের নিরাপত্তার পরিপন্থী সকল প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকা তাদের নৈতিক দায়িত্ব, যদিও বাকশালোত্তর সকল বাংলাদেশ সরকার সব সময়েই বাংলাদেশী (বাঙ্গালী নয়) নাগরিকত্বের কথাই বলে আসছেন। প্রকৃতপক্ষে এইসব অতিবুদ্ধি মহলের এহেন প্রচার প্রচারণা আমাদের জাতীয় সংহতি বিনষ্টকারী উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা ছাড়া অন্যকিছু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্ন এসে পড়ে যে, বাঙ্গালীত্বই যদি আমাদের জাতীয়তাবোধের মূল ভিত্তি, তাহলে পশ্চিমবাংলা নিয়ে একরাষ্ট্র-সোহরাওয়ার্দী- শরৎ বোস- এর যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা ব্যর্থ হল কেন? একথা আজ কারো অজানা নেই যে, যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল যুক্ত বাঙ্গালীত্বের রাজাধারী বর্তমানের 'এপার বাংলা

www.pathagar.com

ওপার বাংলার' প্রবক্তাদের পূর্বসূরি বাঙ্গালীকূল শিরোমণি শ্রামাপ্রদাস মুখার্জি প্রমুখ (হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক সভাপতি) হিন্দু বাঙ্গালীদের প্রচন্ড বিরুদ্ধতার কারণে। এই উপলক্ষে যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হিন্দু নেতৃবর্গের রায় বিশেষভারে লক্ষ্যণীয়। যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতা মিঃ গান্ধী রায় দিয়েছিলেন এই বলেঃ দুর্নীতির মাধ্যমে ক্রীত ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত, আন্তরিক বিভেদ এবং হিন্দুদের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি হিসাবে সরল বিশ্বাসে কৃত দেশ ভাগাভাগির চাইতে অনেক বেশি খারাপ। যুক্ত বাংলার মিঃ সোহরাওয়ার্দীর মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনকারী হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির রায়ঃ' "ভারতের বাকী অংশে ভাগাভাগি যদি নাও হয়, হা হলেও বাংলাকে ভাগ করতেই হবে।"

[৯ হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা পৃঃ]

তারপর অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক এসম্বেলীয় মুসলিম মেম্বারগণ পূর্ব ও পশ্চিবঙ্গের মধ্যে ভাষাগত সাদৃশ্য এবং তথাকথিত সকল বাঙ্গালীত্ব সত্ত্বেও কেন ১৩০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ভিন্ন ভাষাভাষী (পাঞ্জাবী-সিন্ধী-পশ্তু) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে যোগ দেবার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন? পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে ভাষাগত সাদৃশ্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের সঙ্গে ভাষাগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই আপাতঃ অদ্ভুত বন্ধন যখন সম্ভবপর হতে পেরেছিল, তখন নিশ্চয়ই তা ভাষাগত ঐক্যের চাইতেও মহৎ এবং শক্তিশালী বিশেষ কোন উপাদানের কারণেই। এই বিশেষ উপাদানের মধ্যেই আমাদের জাতীয়তার মূল ভিত্তি, যোগসূত্র সন্ধান করা প্রয়োজন। ভাষাগত ঐক্য বাঙ্গালীত্বের মধ্যে নয়। বলা বাহুল্য এই মূল ভিত্তি ধর্মীয়, ঐতিহ্যগত ও তামুদ্দুনিক ঐক্য যা ছিল একজন বঙ্গ ভাষাভাষী (মিঃ এ, কে, ফজলুল হক) কর্তৃক উত্থাপিত ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবেরও মূল ভিত্তি। এই লাহোর প্রস্তাব দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদ (এবং হিন্দুদেরও বটে) মূলত তাদের ধর্মীয়, ঐতিহ্যগত ও তামুদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জন্মের যৌক্তিকতাও এই লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই রয়ে গেছে। এই বাংলাদেশ সেই লাহোর প্রস্তাবেরই ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি, স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি নিহিত। ওপার বাংলার উদ্দেম্যমূলক বৈরী প্রচার প্রচারণা সত্ত্বেও এই মূল ভিত্তি এখনও অক্ষুন্নই রয়ে গেছে, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী কতিপয় রাজনীতিকের হীন ষড়যন্ত্রে, সাবেক পাকিস্তানের জঙ্গী রাষ্ট্রনায়কদের নির্বুদ্ধিতা ও জুলুম-অত্যাচারের কারণে এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানের বাংলাদেশের)

www.pathagar.com

রাজনৈতিক নেতৃবর্গের ক্ষমতালিপ্সার ফলে এবং সর্বোপরি পাকিস্তানের জন্মলগ্ন হতেই পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোপন ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের পরিবর্তে রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের জন্ম। অবশ্য এই রক্তাক্ত বিপ্লবের আসল নিদান ছিল পর্দার অন্তরাল হতে পরাশক্তিদ্বয়ের অবিভক্ত পাকিস্তানকে 'কাট্‌টু সাইজ' করার গোপন যোগসাজশ এবং একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র কর্তৃক উপমহাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে শতাব্দীর সুযোগ গ্রহণ করার দুরভিসন্ধি। একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ পাকিস্তানের সামরিক সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের পরদিন সাতাশে মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় ঘোষণা করেনঃ যারা জিজ্ঞেসা করেন ইস্ট পাকিস্তান সংকটে সময়োচিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কিনা, তাদের আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কার্য। সময় চলে গেলে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন মানে হয় না। (ভারতের বাংলাদেশ সংক্রান্ত দলিলঃ প্রথম খন্ড পৃঃ ৬৬৯)। চারদিন পরে লোকসভায় প্রস্তাব পাস হয় পাকবাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামরত 'ইস্ট পাকিস্তানের' লোকদের ভারতের আন্তরিক সহানুভূতি-সমর্থন জানিয়ে এবং এই দিনই ভারতের ইনস্টিটিউট অব স্ট্রাটেজিক-এর ডিরেক্টর মিঃ কে, সুব্রমোনিয়াম এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে বলেন-এই কথা ভারতকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, পাকিস্তান ধ্বংসে আমাদের স্বার্থ। এই সুযোগ আর কোন সময় আসবে না। এই আমাদের জন্য শতাব্দীর সুযোগ। (হিন্দুস্থান টাইমস, নিউদিল্লী ১লা এপ্রিল ১৯৭১) বস্তুতপক্ষে জাতির অগ্রগতির পথে শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের পরিবর্তনের রক্তাক্ত এই বিপ্লব ছিল একটা দুঃখজনক ঘটনা। (যদিও প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার সার্থক বাস্তবায়ন)। অন্যথা শান্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে যুগের প্রয়োজনে বাংলাদেশের জন্ম দু'দিন পরেই ছিল এক প্রকার অবধারিত, অবশ্যম্ভাবী। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সক্রিয় সহায়তায় রক্তপাতের মাধ্যমে অর্জিত এই বাংলাদেশ তাই জন্ম হতেই ভারতের রাহুগ্রাসের মুখে। তাই হারাতে হয়েছে বেরুবাড়ী, গঙ্গার পানি, দক্ষিণ তালপট্টি।

যাই হোক, বাংলাদেশের ভারতীয় এজেন্টদের বৈরী প্রচার প্রচারণা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানসহ সকল মুসলিম দেশের সম্বন্ধ অত্যন্ত হৃদ্যতামূলক এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে সেই মূল ভিত্তি, সেই যোগসূত্র শক্তিশালী রূপেই এখনও বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের মুসলমান পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল ঠিকই। তবে সে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তৎকালীন পাক সরকারের শোষণ, পীড়ন, অত্যাচার এবং বিমাতাসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানী জনগণের বিরুদ্ধে নয়-পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও নয় তথা পাকিস্তান কনসেপ্টের বিরুদ্ধেও নয়, দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধেও নয়-

www.pathagar.com

যা ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চের শেরে বাংলা ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত ইতিহাসখ্যাত লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে বিধৃত– অর্থাৎ উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই যুদ্ধের সময়ে মুক্তি বাহিনী যুদ্ধ করে মুসলিম হিসেবেই-ইসলামাবাদ দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা বা সমাজতন্ত্রে ধ্বজা উড়াবার জন্য নয়। মুক্তিযুদ্ধকালে তারা বন্দে মাতারাম, জয় বাংলা বা হর-হর-বোম বলে নয়-আল্লাহু আকবর বলেই তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। ভারতে ইস্টার্ণ কমান্ডের তৎকালীন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা তাঁর যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণে স্বীকার করেছেন যে, যুদ্ধকালে অর্থাৎ মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রাক্কালে মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনী আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করত। এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুসলমানগণের আকর্ষণ ভারতের পরিবর্তে পাকিস্তানসহ সকল মুসলিম দেশের প্রতি। এখনও ক্রিকেট হকি সহ আন্তর্জাতিক যেসব লেখাধুলা হয় তাতে পাকিস্তানের বিজয়ে এদেশের মুসলমানগণ দারুণ উল্লাস প্রকাশ করে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন তখন মনে থাকে না। অনেক ভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের নিকটও এই সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছেঃ "যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় তাহলে ভারতের আশ্চর্য হবার কিছু নাই। যেদিন আমার সৈনিকগণ বাংলাদেশেকে মুক্ত করে সেদিনই আমি একথা উপলব্ধি করি। বাংলাদেশীদের কখনই ভারতের প্রতি তেমন ভালবাসা ছিল না। আমি জানতাম ভারতের প্রতি তাদের ভালবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।"

[ফিল্ড মার্শাল মানেকশ' -ভারতের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান - [Statesman-29-4-88] এইসব স্পষ্ট ভাষণের জন্যে ইন্দিরা গান্ধী মানেকশ'র-ফিল্ড মার্শাল পদবী খারিজ করতে চেয়েছিলেন।]

সত্য কথা এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এই মৈত্রীবন্ধন ধ্বংস করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য দানের ভারতের মূল লক্ষ্য এবং আজিও ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সেই একই লক্ষ্যে পরিচালিত। এই উদ্দেশ্য সাধনে অর্থ, ছল, বল, কৌশল সকল অস্ত্রই সে পরিচালনা করে আসছে। এই সত্যও সঠিকভাবে উপলব্ধি করা দরকার, আমাদের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাম্প্রদায়িক ভারতের এই পররাষ্ট্রনীতির করুণ স্বীকার মাত্র। এদের একমাত্র কর্ম যেনতেন প্রকারে, মুসলমানদের এই মৈত্রীবন্ধন নষ্ট করে পরস্পরের

www.pathagar.com

মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। এদিকে ভারতের এই নীতির সার্থক রূপায়ণে নিয়োজিত আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলোর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানমালা যাতে করে ভারতের মূল লক্ষ্য অর্জনে অনন্তকাল ধরে এই বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখা যায়। কাজেই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি এগারো কোটি মুসলমান অধ্যুষিত এই বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের পরিচিতির প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গের বর্ণহিন্দুদের পরিচিতি "বাঙ্গালীর" মধ্যে সন্ধান না করে "বাংলাদেশীর" মতো কনো বাস্তবানুগ পরিভাষা ব্যবহার করা যে সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত এবং রাজনৈতিক দিক থেকে নিরাপদ (এবং আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থেও বটে) সে সত্য দিবালোকের মত পরিষ্কার। এতদসত্ত্বেও এসব বিকৃত বিকৃত মস্তিষ্ক তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মহলের জন্ডিসাক্রান্ত চোখে এসত্য প্রতিভাত হবে কিনা বলা দুষ্কর। তবে যারা অজ্ঞতা বা অনবধানতাবশত "বাংলাদেশীর " পরিবর্তে "বাঙ্গালী" পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন তাদের অবগতির জন্য আমাদের জাতীয়তাবাদের চেতনার মূল ভিত্তি ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও তামুদ্দুনিক বেশিষ্ট্যগুলির আলোচনা প্রয়োজনীয় বিবেচনায় এই প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছিল বিশেষত বিভাগোত্তর জাত সেইসব তরুণ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে-যারা বাংলাদেশের জন্মের এবং জন্মপূর্ব ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখে না, যারা বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যবিনাশী উপরোক্ত স্যাবোটাজ জাতীয় প্রচার প্রচারণার কারণে নিজেদের জাতীয়তার পরিচিতিবোধ সম্বন্ধে এখনও দুঃখজনক বিভ্রান্তির করুণ শিকার। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি মূলত বিভিন্ন প্রামাণিক তথ্য ও ইতিহাসভিত্তিক। লেখকের নিজস্ব মতামত এখানে অতি অল্পই আছে। যাও কিছু আছে সে সকলই খ্যাতনামা-হিন্দু-মুসলমান রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, মনীষীবৃন্দের মতামত, বক্তৃতা, অভিমত দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থিত। এই প্রবন্ধাবলীতে উপস্থাপিত সকল বক্তব্য সম্বন্ধে সবাই যে একমত হবেন-এমনটা হয়তো নাও হতে পারে। তবে আমাদের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে লেখকের যে মূল প্রতিপাদ্য সে সম্বন্ধে জাতীয় কল্যাণকামী বিরুদ্ধ মতপোষণকারী কেহ আছেন বলে মনে হয় না। প্রবন্ধগুলি কয়েক বৎসর পূর্বে (১৩৮৫-৮৬ বাংলা) প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক আজাদে ও সাপ্তাহিক জাহনেনও পত্রিকায়, কখনো স্বনামে (আবু আহমদ ফজলুল করীম), কখনো বা আল করীম ও জরীন চশম এবং সাম্প্রতি মিল্লাতে আল-করিম-এই তাখালুসের মাধ্যমে)।

এই কিতাবে যে সকল উদ্ধৃতি ও রেফারেন্স দেয়া হয়েছে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সংসক্তি অংশে যেসব উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তার জন্য সেসব পত্রিকা ও লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিশেষ করে ইনকিলাব, খন্দকার হাসনাত করিম ও কাজির দরবারে।

www.pathagar.com

বহুদিন বহু প্রকার চেষ্টা ও প্রচেষ্টার পর অবশেষে আল্লার রহমে অনুজ প্রতিম সালেহ আহমদের আন্তরিক সহযোগিতার ফলে বইটির প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে।
শোকর আলহাম দলিল্লাহ্

আরজ গোজার
বিনীত খাদেম
আ, আ, ফ, করীম
১২/৯/৯৫ ইং ঢাকা।

www.pathagar.com

'বাঙ্গালী' বনাম 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'

কিছুদিন আগে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' উৎসবে বাংলাদেশের জনৈক মহারথী বয়ান করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করেছেন। এদিকে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' উপলক্ষে কোন একটি সংস্থা (বাংলা একাডেমী) ঘোষণা করেছে যে, "রবীন্দ্রনাথ 'আমাদের' সংস্কৃতি" । এসমস্ত আলাপ আলোচনা যখন এ দেশেই চলছে এবং এ দেশের জনগণের অর্থে পোষিত ব্যক্তি এবং সংস্থা কর্তৃক তখন এ কথা ধরে নেয়া অন্যায় হবে না যে, এ সকল আলাপআলোচনায় 'আমাদের' বলতে ঠিক আমাদেরেই অর্থাৎ বাংলাদেশী জনগণকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু 'বাঙ্গালী' শব্দটা শুনে মনে একটু খটকা লাগে, যে এরা কারা?

'বাঙ্গালী কারা'?

মুসলমান সালতানাত, এর কালে আমরা ছিলাম মুসলমান, তবে সে মুসলমান বাংলাদেশের যাতে করে এ ভৌগোলিক পরিচয়টা বোঝা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সিভিলিয়ন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তার বহুদিনের পরিশ্রমের ফল The Indian Musalman গ্রন্থে এ দেশের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের "বাঙ্গালী" নয় 'বাংলাদেশের মুসলমান' রূপেই বর্ণনা করেছেন।

পাকিস্তান আমলে আমরা বাঙ্গালী ছিলাম না, ছিলাম পাকিস্তানী-তবে ভৌগোলিক পরিচয়ের সুবিধার জন্য 'পূর্ব পাকিস্তানী'। এরপর ৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরে প্রথমবারের মত এই ভূ-খন্ডের নাম হল বাংলাদেশ। আমরা 'বাঙ্গালী' হলাম, যার কিছু অংশ পশ্চিবঙ্গেও আছে। অর্থাৎ এপার ওপার দুই বাঙ্গালী। এই দুই 'বাঙ্গালী'র মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করার জন্য যে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সীমারেখা থাকে তাকে নেহায়েতই কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী প্রতিপন্ন করা হয়। তবে ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর আমরা নিজেদের পরিচয় খুঁজে পেলাম 'বাংলাদেশী' শব্দটির মধ্যে যাতে করে মৎসন্যায় রাজনীতির কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন না হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজেদের স্বাধীন সত্তা নিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি।

তাহলে কে 'বাঙ্গালী' আর কে বাংলাদেশী? আগস্ট বিপ্লব পূর্ববর্তী সরকারের তল্পীবাহকরা এখনো পূর্বতন অর্থাৎ ১৫ আগস্ট (৭১)-পূর্ব আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের 'বাঙ্গালী' বলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে-"বাংলাদেশী" বলে নয়।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বৃটিশ শাসনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বাংলা ভাষাভাষী উচ্চবর্ণের হিন্দুরা 'বাঙ্গালী' বিশেষণে আর মুসলমানরা মুসলমান হিসেবেই পরিচিত ছিল, যদিও মুসলমানদের ক্ষেত্রে পরিচয়ের সুবিধার্থে দিল্লীর, পাটনার, কলিকাতা,

www.pathagar.com

ঢাকার বা চাটগাঁর বিশেষণ প্রয়োগ করা হত। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকগণ মুসলমান হিসেবেই এদেশের মুসলমানদের চিহ্নিত করেছেন, 'বাঙ্গালী' বিশেষণে নয়। এককালের গোঁড়া কংগ্রেসী এবং হিন্দু-মুসলিম মিলনের সমর্থক মাওলানা মোহাম্মদ আলী ১৯১২ সালেও এই কারণেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে, 'বাঙ্গালী' কথাটা যা বাঙলা ভাষাভাষী হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতি (তার মতে) প্রযোজ্য হওয়া উচিত ছিল, তা বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুরাই দেশে বা বাইরে একচেটিয়াভাবে দখল করেছে।

"It is the Hindu minority of Bengal that has monopolsed throghout the country and even abroad cognomen of Bengale which should have been applicable to the Hindus and Muslims of Bengal alike" Mohammed Ali "The Comrade" 6/4/1912.

এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস, যখন তিনি রোগাক্রান্ত নজরুলের 'আমার কিছু হোল না' এই আক্ষেপের জবাবে বলেছিলেন, 'কেন, তুমি মুসলমানদের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ট কবি, (মুজফফর আহমদঃ কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, পৃঃ ৪৫১) সজনী বাবু 'বাঙ্গালী'দের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলেননি। তখন পঞ্চম দশকের শুরুতেও 'বাঙ্গালী' বিশেষণ এই অর্থেই ব্যবহৃত হত এবং এটাই ঐতিহাসিক সত্য। হিন্দুরা বাঙ্গালী মুসলমানদের কখনও 'বাঙ্গালী' বলে গ্রহণ করেনি। [ইতিহাসের রূপান্তর ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একদিক সংসক্তি-ক]

এ প্রসঙ্গে নয়াদিল্লী থেকে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বসন্ত চ্যাটার্জী (বঙ্কিম চ্যাটার্জীর একজন অধঃস্তন সংস্করণ) প্রণীত Inside Bangladesh Today পুস্তকের খানিকটা যেখানে বাঙালী কথাটার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

মূলত 'বাঙ্গালী' একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ধারণা। এর প্রতিষ্ঠা হয় দুশ' বছর আগে, যখন বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছিল। প্রচুর অনার্জিত আয় ও সীমাহীন অবসরের বদৌলতে এবং তৎকালীন বৃটিশ শাসকদের মারফতে এরা ইউরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষার সংস্পর্শে আসে'।

এই নতুন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত হিন্দুদের ওপরও পড়ে। ফলে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত উচ্চবর্ণের একটি শিক্ষিত আধুনিক সমাজ গড়ে ওঠে, যা ছিল ভারতের সর্বপ্রথম আধুনিক সমাজ এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা এই সমাজকে আদর্শ হিসাবে অনুকরণ করে এবং এরাই 'বাঙ্গালী' নামের একমাত্র অধিকারী হলেন। অর্থাৎ বর্ণহিন্দুরা বাঙ্গালী আর মুসলমানরা এর বাইরে।

এখানে স্মরণীয় যে, পলাশীর যুদ্ধের পর এই কলিকাতাকেই রাজধানী এবং রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র করে এদেশে বৃটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠা ও পরিপুষ্টি লাভ করেছিল এবং প্রসার লাভের

www.pathagar.com

সুযোগ পেয়েছিল। রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা ও সমর্থন যে অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষ. পরিবারবিশেষ ও বিশেষত সমাজবিশেষের সৃষ্টি এবং তার পরিপুষ্টির সহায়ক হতে পারে, এরূপ নজীরের অভাব নেই।

বসন্ত চ্যাটার্জী আরও বলেছেন, "কেবলমাত্র এই সমাজভুক্ত ব্যক্তিরাই তখনও এবং বর্তমানেও 'বাঙ্গালী' নমে পরিচিত এবং প্রচলিত অর্থে এদের বলা হয় 'ভদ্রলোক' (The gentry)"

'এই বাঙ্গলী' ভদ্রলোকের সমাজ ব্রাহ্মণ, বৈদ এবং কায়স্থ নামে সুপরিচিত। এই তিনশ্রেণীর উচ্চবর্ণের হিন্দু সমবায়ে" বাঙ্গালী গঠিত'

'তত্ত্বগতভাবে বাংলার কায়স্থরা শুদ্র হলেও বিদ্যা এবং রাজসেবার প্রতি বহু শতাব্দীর অনুরাগের কারণে এরা সব সময়েই সমৃদ্ধিবান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন ছিল। তাই তাদেরও ভদ্রলোকের দলে ধরা হয়।'

'কিন্তু সবচেয়ে আসল এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা, বাঙ্গলী ভদ্রলোকের শ্রেণীভুক্ত হতে হবে অবশ্যই এদের সবাইকে আদি হিন্দু হতে হবে। অন্য কথায়, কোন মুসলমান অথবা অন্য কোন শ্রেণীর কেউ কখনও বাঙ্গালী বলে গণ্য হতে পারে না তা সে যতই না কেন বাংলা বলতে পারুক বা তার সামাজিক অবস্থা ও বিদ্যাবত্তা যাই হোক না কেন। এটা আরও অধিক অর্থবহ যে এ পর্যন্ত এই সমাজের কেউই (অর্থাৎ নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানরা) নিজেদের বাঙ্গালী বলে দাবী করেনি। নিম্নবর্ণের প্রকৃতিপূজক হিন্দুরা যারা বাংলার হিন্দুসমাজের প্রায় শতকরা নব্বই জন তাদের কেউই নিজেদের 'বাঙ্গালী' বলে দাবী করেনি। অনন্তপক্ষে বাংলার ইতিহাসের কোন সময়েই কোন মুসলমান নিজেকে 'বাঙ্গালী' বলে দাবী করেনি।'

এই প্রবন্ধে বসন্ত চ্যাটার্জী তাদের ঢাকাস্থ হাইকমিশন অফিসের একজন বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান অফিসারের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, যা সেই অফিসার তার ঘনিষ্ঠ বাংলাদেশী বন্ধুদেরকে তিরস্কারাচ্ছলে বলছেন, 'আচ্ছা ভাই, বলতে পারেন কি, কবে থেকে বাংলাদেশের মুসলমানরা 'বাঙ্গালী' হয়েছে'? আমাদের সময়ে ছোট লোকদের বাদ দিলে মাত্র দুই শ্রেণীর লোক ছিল বাঙ্গালী এবং মুসলমান। কিন্তু এখন আমরা শুনছি যে, মুসলমানরাও বাঙ্গালী। এর মানে কি?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এসত্য সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত যে, এযাবতকাল 'বাঙ্গালী' অর্থে সব সময়ই বাঙলার হিন্দু বা হিন্দুদেরকেই বুঝিয়েছে। যেমন মারাঠী অর্থে হিন্দু মারাঠাদের বোঝায় এবং বালুচ অর্থে বেলুচিস্তানবাসী মুসলমানদেরই বোঝায়। যদি মহারাষ্ট্রে বসবাসকারী কোন মুসলমানকে বুঝতে হয় তাহলে তাকে 'মহারাষ্ট্রের মুসলমান' হিসাবেই বর্ণনা করা হয়। বেলুচিস্তানের হিন্দু বুঝাতে 'বেলুচ হিন্দু' বলেই তাকে বুঝানো হয়। মোটের ওপর এদেশে (বসন্ত চ্যাটার্জী কথিত) তিন শ্রেণীর লোক

www.pathagar.com

ছিল বাঙ্গালী বা ভদ্রলোক, ছোটলোক ও মুসলমান। এ প্রসঙ্গে প্রায় ষাট বছরেরও আগেকার এ লেখকের ছেলেবেলায় একটা অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখকের খেলার সাথী একটি হিন্দু ছেলে একদিন কথায় কথায় লেখককে বলেছিল, 'তোমাকে ভদ্রলোকের মত দেখা যায় মুসলমানের মত নয়'।

সেই সময়ে 'ভদ্রলোক' বা বাঙ্গালীরা শিয়ালদার পূর্ব থেকে শুরু করে চাটগাঁ-সিলেট পর্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র পূর্ববঙ্গ বা মোটামুটি বর্তমান বাংলাদেশে বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী জনসম্প্রদায়কে 'বাঙ্গাল', এই সাধারণ নামে অভিহিত করত। ঐ সময়ে হীনতাসূচকভাবে হলেও 'ঢাকাই বাঙ্গাল', 'চাটগাঁও বাঙ্গাল', 'মোমেনশাহীর বাঙ্গাল,' 'বরিশালের বাঙ্গালা' এসব বিশেষণ বিশেষ প্রচলিত ছিল। কিন্তু 'বাঙ্গালী' কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য ব্যবহৃত হত। বাঙ্গালীরা তুচ্ছার্থেই মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের 'বাঙ্গাল' বলত।

এমনকি এখনো বাংলাদেশের কোথাও কোথাও পল্লী এলাকায় 'বাঙ্গাল' গালি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তথাপি এটাই ছিল একমাত্র বিশেষণ যা ছিল অত্যন্ত অসাম্প্রদায়িক এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের জন্য (শিয়ালদার পূর্ব হলেই অত্যন্ত উদারভাবে) সকলের প্রতিই প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু 'বাঙ্গালী'রা ছিল এর বহির্ভূত।

অবশ্য জনৈক বৈয়াকরণিকের অভিমতের, 'বাঙ্গলী' স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ, 'বাঙ্গাল' যার পুংলিঙ্গ। তবে এ ব্যাখ্যা ব্যাকরণসম্মত হলেও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। কারণ যেখানে 'বাঙ্গালী' বাংলাদেশের বর্ণহিন্দুদের মধ্যেই সীমিত, সেখানে 'বাঙ্গাল' হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের (অবশ্য শিয়ালদার পূর্বের অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের) জনগণের প্রতিই প্রযোজ্য।

যাই হোক, এতে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, বাংলাদেশের জনসাধারণের পক্ষে 'বাঙ্গালী' পরিচিতি গ্রহণের কোন সুযোগ বা যৌক্তিকতা আদৌ নেই। বড়জোর 'বাঙ্গাল' পরিচিতি গ্রহণ সম্ভব (যদিও হীনতাসূচক এবং গালিবাচক)। অন্যথায় তাদের পরিচিতি হবে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান-যা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত চালু রয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা প্রকাশ করতে হলে অর্থাৎ এ দেশে বসবাসকারী মুসলমান, বাঙ্গালী, নিম্নবর্ণের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সকলকে একটি মাত্র নামের দ্বারা পরিচিত করতে হলে তা করতে হবে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় পরিচিতি জ্ঞাপক 'বাংলাদেশী' শব্দের দ্বারা। আর এদেশের জনগণের রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ-যা স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাগুরু জনগণের চিন্তা-বিশ্বাস, আচার– আচারণ, মূল্যবোধ ও কৃষ্টির দ্বারা পরিপুষ্ট।

www.pathagar.com

সার্বভৌম বাংলাদেশ বনাম 'বাঙ্গলী' জাতীয়তাবাদ

বাংলাদেশের জনগণের জাতীয়তা কি হবে, এ নিয়ে এখনো কিছু লোক বিতর্কের সৃষ্টি করছেন। তারা নিজেদে "বাংলাদেশী'র পরিবর্তে "বাগ্গঙ্গালী" বলে পরিচয় দিতে চান এবং এটা তারা চাপিয়ে দিতে চান। অথচ "বাঙ্গালী" দ্বারা যদি বাংলা ভাষাভাষী বুঝায় (যদিও তা সত্য নয়) তাহলে পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদেরও অন্তর্ভূক্ত করতে হয় এবং তাদের সাথে এক জাতীয়তা ঘোষণা করতে হয়। অবশ্য এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। মূলত "বাঙ্গালী" বলতে সকল "বাংলা ভাষাভাষী" বুঝায় না, বুঝায় কেবলমাত্র "বাংলা ভাষাভাষী বর্ণহিন্দু"। এমনকি অ-কুলীন হিন্দুরাও এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, বঙ্কিম চন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ বহু খ্যাতনামা লেখকদের লেখায় এর প্রমাণ রয়েছে তবে "বাঙ্গালী" সম্পর্কে সর্বাধিক খোলাসা করে যিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট ভারতীয় লেখক মিঃ বসন্ত চ্যাটার্জী। তিনি ১৯৭৩ সালে নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত তার Inside Bangladesh Today গ্রন্থে কেবলমাত্র যে, "বাঙ্গালী" সম্প্রদায়ের পরিচিতিই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন তা নয়, বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং বাংলাদেশের জনগণ (অনার্য হিন্দুসহ) বিশেষ করে মুসলমান সম্পর্কে তাদের যে মানসিকতার পরিচয় প্রকাশ করেছেন, সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুসলমান তো দূরের কথা, অনার্য হিন্দুদের পক্ষেও "বাঙ্গালী" পরিচিতি নিতান্তই লজ্জাজনক বিবেচিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিঃ বসন্ত চ্যাটার্জীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী খোদ বর্ণহিন্দুদেরই চিন্তাধারা মতে এ দেশে তিন শ্রেণীর লোক বাস করেঃ বাঙ্গালী বা "ভদ্রেলোক" (ব্রাহ্মণ-বৈদ্য ও কায়স্থ-এই তিন শ্রেণীর হিন্দু নিয়ে গঠিত), "মুসলমান এবং ছোট লোক " (অর্থাৎ অনার্য হিন্দুসহ অন্যান্য অমুসলমানরা)। তার লেখা থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে বর্ণহিন্দু বা বাঙ্গালীরা অবর্ণহিন্দু বা অনার্য হিন্দুদেরকে বিশুদ্ধ হিন্দু বলে স্বীকার করে না। বাইরে রাজনৈতিক কারণে এদের সমর্থন লাভ ও সংখ্যাশক্তি অর্জনের স্বার্থে এদের দলে টানলেও মনেপ্রাণে তারা এদেরকে "ছোটলোক" বলেই জানে হিন্দু বা বাঙ্গালী কোনটাই নয়। [সংসক্তিক ইতিহাসের রূপান্তর ও ভারতীয় ইতিহাসের একদিক।]

এখন দেখা যাক, এই বাঙ্গালী বা "ভদ্রলোক" বা বর্ণহিন্দুদের এই বাংলাদেশে, স্বাধীন-স্বতন্ত্র বাংলাদেশ, এই দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জণগণের সাথে কি সম্পর্ক।

www.pathagar.com

'বাঙ্গালী' অর্থাৎ এ দেশের বর্ণ-হিন্দুদের সম্বন্ধে মিঃ বসন্ত চ্যাটার্জী তার Inside Bangladesh Today গ্রন্থে বলছেনঃ এই "বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে সম্প্রদায়গতভাবে বাংলাদেশের হিন্দুদের (অর্থাৎ বর্ণ হিন্দুদের) কোন মানসিক বা আন্তরিক যোগাযোগ নেই। কোন কোন হিন্দু অবশ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা অন্দোলন এবং শেষ পর্যায়ের সংগ্রামে শারীরিক দিক দিয়ে খুবই সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকতে পারেন। কিন্তু এটাও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কারণে নয়, বরং একটা বৃহত্তর জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই, যা তাদের মতে বাংলাদেশেকেও অন্তর্ভুক্ত করে বটে, কিন্তু সে জাতীয়তাবাদে বাংলাদেশ না হলেও চলে।"

অর্থাৎ তারা যদিও পূর্ববাংলাকে (সাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে -বর্তমান বাংলাদেশকে) পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির সংগ্রামে শরীক হয়েছিল, তবুও তারা সমগ্র ভারতভূমি জুড়ে তাদের যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণা তারই সম্পূরক সহায়ক হিসেবেই তা করেছিল, বাংলাদেশ ভিত্তিক একটা আলাদা জাতীয়তাবাদের সমর্থনে নয়। অর্থাৎ তাদের অনুপ্রেরণা ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রসূত। যেহেতু তাদের মতে এর অনিবার্য পরিণতি ছিল হিন্দু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর অঙ্গনে বাংলাদেশের নিজস্ব জাতীয় সত্তার আত্মবিলোপ এবং বৃহৎ ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামো এবং ভৌগোলিক সত্তার মধ্যে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক সত্তা বিলীন করে দেওয়া -এই অতি আকাঙ্খিত ও অতি প্রত্যাশিত বিশ্বাসের কারণে।

এই কথাটাই আরো পরিষ্কার করে বলেছেন মিঃ চ্যাটার্জীঃ "সম্প্রদায়গতভাবে বাংলাদেশের হিন্দুরা (অর্থাৎ বর্ণহিন্দুরা) কখনও এর বেশি ছিল না। এদের খুব ভাল ধারণা নিয়ে বিবেচনা করলে বলা চলে একদল সহানুভূতিরপরায়ণ গরজবিহীন দর্শক, আর খারাপভাবে ধরলে (আসলে তাই-ই) একদল ঈর্ষাপরায়ণ লোকের ভিড়-যাদের নাড়ীর টান-আগেও যেমন, আজও তেমনি -আগের সেই অবিভক্ত বঙ্গদেশের প্রতি তথা অবিভক্ত ভারতের প্রতি (যা বিপুলভাবেই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা) এবং এই সত্যটা এত বেশি স্বতঃপ্রকাশিত যে, বাংলাদেশের মুসলমানরা বা হিন্দুরা নিজেরাও কখনো এ ব্যাপারটি নিয়ে ঢাক ঢাক গুড় গুড় করার চেষ্টা করেনি।"

এমনি ভারত সরকারের বিশ্বস্ত ও বশংবদ বাংলাদেশের প্রাক্তন বাকশালী প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব সম্বন্ধে মিঃ চ্যাটার্জী খুব ভাল ধারণা করতে পারেননি। তিনি বলছেন, "মোখতাসর, শেখ মুজিব বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। (অর্থাৎ বাংলাদেশে বাস করলেও তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদেই বিশ্বাসী)। বরঞ্চ সাধারণভাবে এরা আমাদের "বাঙ্গালী" সংজ্ঞার ভিতরে আসে-যা বিভাগপূর্ব সমগ্র বঙ্গ এবং বৃটিশ ইন্ডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। এমনকি

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের "বাঙ্গালী" শব্দ ব্যবহারে পর্যন্ত বাঙ্গালীরা অর্থা বর্ণহিন্দুরা মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিল (সম্ভবত তাদের স্বাতন্ত্র্য বিনাশের চক্রান্তের সন্দেহে)। এই সন্দেহ মিঃ চ্যাটার্জীর লেখায়, –"শেখ মুজিবের "বাঙ্গালী" এবং আমাদের বাঙ্গালী এ দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। তারা বাঙ্গালী একটি রাজনৈতিক সত্তা (Political entity) এবং ধর্মে মুসলিম. পক্ষান্তরে আমাদের 'বাঙ্গালী' একটি সংস্কৃতিগত সত্তা যা ধর্মে হিন্দু।"

বসন্ত চ্যাটার্জীকে ধন্যবাদ যে, তিনি 'বাঙ্গালী' কথাটির এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী 'বাঙ্গালী' হিন্দুদের প্রকৃত পরিচয় অত্যন্ত খোলাসা করেই বিশ্লেষণ করেছেন-কোনও হেঁয়ালি না করে এবং এই "বাঙ্গালী" অর্থাৎ বর্ণহিন্দুদের দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণার উৎসভূমি সম্বন্ধ্যে ও সকলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনকারী যেসব তথ্য এবং অভিমত প্রকাশ করেছেন-তাও সবশেষে অভিনন্দনযোগ্য।

এরপরও যারা নিজেদের বাংলাদেশী পরিচয়ে লজ্জাবোধ করে "বাঙ্গালী" পরিচয় গ্রহণ করে নিজেদের গৌরব বর্ধন করতে চান (দুঃখের বিষয় এখনও বহু বিদগ্ধ মহাশয় এ দলে আছেন, যাদের মধ্যে ইউনির্ভাসিটির শিক্ষকমন্ডলীর কোন কোন স্বনামধন্য সদস্যও অন্তর্ভুক্ত) তাদের খেদমতে মিঃ চ্যাটার্জীর আরও দু'একটি বোধোদয়সূচক আপ্তবাক্য নিবেদন করা যেতে পারেঃ "বর্তমানে বাংলাদেশে বাঙ্গালী মুসলিম সংস্কৃতির কথা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। খ্যাতনামা সেকুলারদের কলম থেকে এ সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ স্থানীয় কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে যে,"বাঙ্গালী মুসলিম কালচার' বলে কিছু নাই।

অবশ্য "বাঙ্গালী কালচার" একটা আছে যা খুবই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, সুসংগঠিত এবং খুবই উন্নত কিন্তু সে কালচার সেন্ট পাসেন্ট হিন্দু। এমনকি একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম-এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন কেবলমাত্র ততটুকু যে পরিমাণে তিনি কালী ও কৃষ্ণের স্তবস্তুতি কীর্তন করতে তৈরী। এই কালচারটুকুও (অর্থাৎ নজরুলের দেবদেবীর প্রশস্তিগাথা) বাংলাদেশের হিন্দুদের একটি খুবই দামী সংগ্রহ। অবশ্য মুসলমানদের পক্ষে এবং প্রকৃত বাংলাদেশী জাতি তাদেরকে নিয়েই গঠিত যে কালচার তারা এ পর্যন্ত অত্যন্ত প্রাথমিক স্তর অবধি তৈরী করতে পেরেছে তা হচ্ছে 'এগ্রিকালচার' (চাষাবাদ)" । এদের কোন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন নাগরিক কি এরপরেও নিজের "বাংলাদেশী" পরিচয় পরিত্যাগ 'করে কাকের ঘরে কোকিলের ছা'র মত "বাঙ্গালী সংস্কৃতি" গ্রহণের কথা কল্পনা করতে পারে? এটা তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হিসাবে বাঁচতে চায় না-যারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ইসলামী তাহজীব তমুদ্দুনে বিশ্বাসী নয়।

আজকাল কাগজের পাতা খুললেই কোন না কোন মাননীয় মহাশয়ের কথন- লেখন, ভাষণে, বয়ানে "বাঙ্গালীত্বর" ঝোঁক পরিদৃশ্যমান হয়। কর্তৃপক্ষ যখন এহেন জীবনমরণ

www.pathagar.com

সমস্যার প্রতিকারের ব্যাপারে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে বসে আছেন এবং একই রাষ্ট্রে "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" এবং সেই সাথে "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ" এই দুই বাদের বাদ- প্রতিবাদ নিতান্ত নিস্পৃহভাবে "বালনাং অমৃত ভাষিতং" বলে নির্বিকারভাবে অবলোকন করছেন তখন আমাদের একটি ক্ষুদ্র আরজঃ যদি "বাংলাদেশী" শব্দটা এদের কানে তেমন জোরালোভাবে শব্দয়মান না হয় বা উচ্চারণের রসায়ন পক্ষে পীড়াজনক বিবেচিত হয়, তাহলে পূর্ববঙ্গের সেই আদি এবং অকৃত্রিম বিশেষণের পরিচিতি 'বাঙ্গালা' শব্দটা, দেশ, জাতি, নাগরিকত্ব এবং সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্তত ব্যাকরণের দৃষ্টিতেও যা (অর্থাৎ পুংলিঙ্গ বাচক 'বাঙ্গাল' যে শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'বাঙ্গালী' পৌরুষের বলিষ্ঠতারই প্রতীক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বরং 'বাঙ্গাল' 'বাঙ্গালী' অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়। (যদিও বা কোথাও কোথাও কখনো গালি হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে আপত্তি হতে পারে) কিন্তু "বাঙ্গালী" কিছুতেই ব্যবহার করা চলে না। আর তাছাড়া "বাঙ্গালী" কথাটা উপরোক্ত ব্যখ্যাসমূহের পরে কি একটা বিশেষ "গালি" বলেই প্রতিভাত হয় না? বিশেষত বাঙ্গালীদের (অর্থাৎ বর্ণ হিন্দুদের) দেশ বহির্ভূত দেশপ্রেম (যা বাংলাদেশের জন্য দেশদ্রোহিতারই নামান্তর) সম্বন্ধে এইসব তথ্যাবলীর সন্ধান লাভের পরে?

বাংলাদেশের এইসব "বাঙ্গালী" অর্থাৎ বর্ণ হিন্দুদের সম্বন্ধে বসন্ত চ্যাটার্জী মহাশয় আরও কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য পরিবেশন করেছেন–

'কিন্তু তারা আমাকে যা বিস্তারিতভাবে বলেছিল তাতে হিন্দুদের (অর্থাৎ 'বাঙ্গালী' ভদ্রলোক বা বর্ণ হিন্দুদের) এখানে উৎসাহব্যঞ্জক আশাপ্রদ কোন ভবিষ্যৎ ছিল না।"

(Inside Bangladesh Today -পৃঃ ১২০।

"ইন্ডিয়ায় যেমন মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পার্টির কয়েকজন মেম্বরকে মন্ত্রীত্বের পর্যায়ে উন্নীত কর হয়, সেইভাবে শেখ সাহেবও দু'জন হিন্দু নিয়েছেন তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে। অবশ্য এই দেশে (অর্থাৎ বাংলাদেশে) পাকিস্তান আমলেও হিন্দু মন্ত্রীরা কাজ করেছেন।" ঐ পৃষ্ঠা ১২১।

"যতদিন ইন্ডিয়ান আর্মি ছিল, ততদিন হিন্দুদের প্রতি সাধারণভাবে ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই অধিকতর ভাল ছিল। ..... কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মি চলে যাওয়ার পর হতে এদের সাধারণ ব্যবহার হয়েছে অনেকটা কঠিন এবং আন্তরিকতাবিহীন।" [পৃষ্ঠাঃ ১৩২]

"হিন্দুরা (অর্থাৎ বাঙ্গালীরা) বলে যে, বাংলা গভর্নমেন্টের এই দু'রকম নীতি শুধু হাস্যকর নয়, বরং জটিল সমস্যা সৃষ্টিকারীও বটে। এর অর্থ কেবলমাত্র এই হতে পারে যে যখন গভর্নমেন্ট সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করতে চায় তখন তারা পাকিস্তানের উত্তরাধিকারীর ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হয়।" [ঐ পৃষ্ঠাঃ ১৩৯] ["তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

www.pathagar.com

হিন্দুরা (অর্থাৎ বর্ণ হিন্দুরা অর্থাৎ 'বাঙ্গালীরা') খুব বেশি আশাবাদী নয়। তাদের এক দলের মতে পাকিস্তান গভর্নমেন্টের মতো মুজিব সরকারের নীতিও পর্যায়ক্রমে এদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। এই যুক্তি দেখানো হয় যে, এই লোকগুলো (অর্থাৎ মুজিববাদীরা) অন্ততপক্ষে তাদের দলগত প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য হিন্দুদেরকে পাকিস্তান আমলে প্রয়োজন মনে করত। কিন্তু এখন দেশমুক্ত হওয়ার পর সে প্রয়োজনটুকুও শেষ হয়ে গেছে। এখন যদি হিন্দুরা অর্থাৎ বাঙ্গালীরা সেখানে থেকে থেকে তা সে ভারতের বন্ধুত্বের খাতিরেই। এই প্রয়োজনটুকু যেদিন শেষ হবে, সেদিন হিন্দুরা নিজেদেরকে দেখবে ভারত যাওয়ার রাস্তায়। এটা কেবলমাত্র শেখ মুজিব কিছুটা রোধ করতে পারেন। কিন্তু তিনি পাকিস্তানী দালাল 'কট্টর' 'সাম্প্রদায়িকতাবাদী' এবং গুন্ডাবদমায়েস দ্বারা পরিবেষ্টিত। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ সদস্যমন্ডলীই ঠগ, ডাকাত এবং খুনীদের সমবায়ে গঠিত; আর বেচারা হিন্দুরা (অর্থাৎ বর্ণ হিন্দুরা বা বাঙ্গালীরা) সম্পূর্ণভাবেই এদের দয়ার উপর নির্ভরশীল।" [পৃষ্ঠা ঐ ১৪০-১৪১]

বিজাতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শবাহী, বৈদেশিক শক্তির প্রতি আনুগত্যশীল এইসব খাঁটি দেশপ্রেমিক (?) 'বাঙ্গালী'দের সম্যক পরিচয় যদি এতেই প্রকট না হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সম্বন্ধে যে কোন সন্দেহ দূরীকরণার্থে মিঃ চ্যাটার্জী আরও কিছু ওয়াদা তথ্য পরিবেশন করেছেনঃ "বাংলাদেশের অভ্যুদয় হতেই আমাদের দেশের (অর্থাৎ ভারতের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বও নির্লজ্জভাবে দাবী করেছে যে, এই ঘটনা দ্বিজাতি তত্ত্বের সমাধি রচনা করেছে। (এখানে এক জাতি তত্ত্বের সমর্থনে হিন্দু নেতৃবর্গের পূর্বাপর প্রচার প্রচারণা কর্তব্য)। কিন্তু এই ভক্তদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন যে, তাহলে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিনাশের পর বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? যদি এই তত্ত্ব তাদের দাবী মোতাবেক, বিচূর্ণই হয়ে থাকে, তাহলে তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি ভারতের সাথে বাংলাদেশের পূর্ণযুক্ত হওয়া যা বাংলাদেশের হিন্দুদের (অর্থাৎ বাঙ্গালীদের দ্ব্যর্থহীন মূলনীতি। এইসব উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ-যারা সবসময়েই দ্বিজাতি তত্ত্বের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করেছেন, তারা কি শেখ মুজিবের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব দেবেন যে, যে তত্ত্বের ওপর ১৯৪৭ সালে তার দেশ আলাদা হয়েছিল, সে তত্ত্ব যখন নেই, তখন তার দেশের পক্ষে উচিত বিভাগ পূর্ব কলিকাতার অধীনস্থ অবস্থায় ফিরে যাওয়া? " [ঐ পৃষ্ঠা ঃ ১৫৫]

এ দেশের 'বাঙ্গালী' সম্প্রদায়ের মানসিকতা সম্বন্ধে মিঃ চ্যাটার্জী আরও কিছু নতুন খবর দিয়েছেন। মুজিব আমলে আওয়ামী লীগ সদস্য ও মন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের কাছে তিনি জানতে পেরেছেন যে, "সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের (ভাশুরভাদ্র বধূ সম্পর্কের কারণে মিঃ চ্যাটার্জী যদিও সে সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা হতে বিরত রয়েছেন) এই বিদগ্ধ মহলে

www.pathagar.com

আমরা (অর্থাৎ আর্যহিন্দুরা) এবং ভারত কি পরিমাণে সম্মান-ইজ্জত লাভের অধিকারী তা বিচার করা যেতে পারে এই ঘটনা থেকে যে, বহু উচ্চমানের উকিল, ব্যারিস্টার, প্রফেসর এবং অন্যান্য স্কলারগণ ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় সরলভাবেই আমাদের নিকট গোপনে প্রকাশ করেছেন যে, তারা অনেক বেশি নিরাপদ ও সন্তোষবোধ করতেন যদি ভারতীয় গভর্নমেন্ট তাদের সংবিধানে মাত্র ৩৭১ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করে সরাসরি এই প্রদেশটিকে ভারতের একটি বিশেষ রাষ্ট্রে পরিগণিত করে নেন।" [ঐ পৃঃ ১৪২]

চমৎকার!

এর পরেও কি এই দেশের জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দলগুলির –যারা সংখ্যাগুরু জনগণের প্রতিনিধি চৈতন্যোতয় হবে না? আফসোস! এখনও কী তারা ব্যক্তিগত, দলগত প্রাধান্য-প্রতিপত্তি লাভের জন্য অনৈক্যের গোলক ধাঁধার মধ্যেই ঘুরে দেশের এবং নিজেদেরও সর্বনাশ ডেকে আনবেন?

হায়রে অভাগা বাংলাদেশ!

www.pathagar.com

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ঃ স্বাধীনতা সংহতি ঃ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ বাঙ্গালী সংস্কৃতি তথা রবীন্দ্র সংস্কৃতি তথা হিন্দু সংস্কৃতি

এদেশের 'বাঙ্গালীদের' রাজনৈতিক আদর্শ ও আনুগত্য, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দেশপ্রেম সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেসব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তা যে কোন সুষুপ্তি আচ্ছন্ন ব্যক্তি বা জাতিকে সজাগ করার জন্য যথেষ্ট। এদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কতিপয় বিদগ্ধ ব্যক্তি যে এখনও 'বাঙ্গালী' তত্ত্বের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না, তা সম্ভবত উপরোক্ত কারণেই। এদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা আদর্শ যে কি এবং কোথায় তার কেন্দ্রবিন্দু, এরপর তা প্রকাশের বা প্রমাণের জন্য আর অধিক যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণে আর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জন্ম প্রাকবিভাগ যুগে এদেশে বৃটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কারণে। বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে একটির জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে (যার পূর্ণতা ১৬/১২/ ৭১-এ)। অপরটির জন্ম পলাশীর যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের পরিণতি হিসেবে মুসলমানদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে। একটির আদর্শ স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ, অপরটির আদর্শ ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত কলকাতাকেন্দ্রিক সিকিম জাতীয় বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীনতা স্বকীয়তা বিবর্জিত পরাশ্রয়ী একটি রাজ্য। একটির লক্ষ্য ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণগঠিত-শাসিত এবং জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে নিয়োজিত একটি রাষ্ট্র। অপরটির লক্ষ্য কলকাতাকেন্দ্রিক শাসনতন্ত্রমুখী, কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্পবাণিজ্য নীতিভিত্তিক এবং 'বাঙ্গালী' অর্থাৎ বর্ণহিন্দু 'ভদ্রলোক'-এর সম্প্রদায়গত শাসন-শোষণভিত্তিক আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরাজীবিত অবস্থান। এক তত্ত্ব অনুসারে ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে এই দেশের জনগণই দেশের সকল সম্পদ ঐশ্বর্য ভোগের অধিকারী এবং অপর তত্ত্বানুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের বিভাগপূর্ব 'কাঠ চোরাইকারী ও পানিবহনকারী' (Hewers of wood & drawers of water) এই অবস্থায় নীত হওয়া এবং কলকাতার সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারে নিজেদের সকল সম্পদ নিয়োজিত করার 'মহৎ ব্রত' উদযাপন। কেন যে বর্ণ হিন্দুরা 'স্বাধীনতা সংগ্রামে' অংশ নিয়েছিল (বাংলাদেশ প্রেমের কারণে না কি অন্য প্রেমের কারণে) উপরোক্ত আলোচনায় তা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

www.pathagar.com

এতেও যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত 'বাঙ্গালীত্বের' ধ্বজবাহী মহলটির মোহমুক্তি না ঘটে, ধরে নেয়া যেতে পারে যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে বিশ্বাসী নয়। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেনি। কারণ তাদের উদ্দেশ্য, স্বাধীনতা নয়, ভারতের গোলামি করা। ভারতের সাথে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব 'লীন' করা।

'বাঙ্গালী' জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টারত বন্ধুগণ যদি এতদসত্ত্বেও 'বাঙ্গালী' জাতীয়তাবাদের মোহে 'বাংলাদেশী' পরিচিতি গ্রহণ করতে অনীহা অনুভব করেন, তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের এহেন কাজের ফলশ্রুতি মর্মান্তিক পরিণতির দিক দিয়ে মীর জাফরের পরিণতিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। বর্ণহিন্দু মহলের শোষণ-পীড়নের উগ্রতার কারণেই এটা ঘটবে যা থেকে 'বাঙ্গালীত্বের' দোহাই দিয়েও তারা নিজেরা কোনদিন বাঁচতে পারবেন না। বাঁচতে পারবেন না নির্যাতনের সেই কালরাত্রির গ্রাস থেকে, যে কালরাত্রির মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে ভারতের কোটি কোটি মুসলমান ও হরিজন প্রভৃতি অচ্ছুৎ সম্প্রদায় এবং যার অগ্রিম আভাস আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বেই দিয়েছিলেন জ্ঞানবৃদ্ধ দেশপ্রেমিক মাওলানা আকরাম খাঁ তৎকালীন ভারতের হিন্দু কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহের বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার-পীড়নের কাহিনীর বর্ণনায়ঃ "অত্যাচার" তাকে বলে যেখানে মুসলমান ঐতিহ্য, মুসলমান সংহতি, মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য, মুসলমানদের ধর্মভাব দলিত ও উপেক্ষিত হচ্ছে। এই অত্যাচারের অভিযোগে প্রত্যেক কংগ্রেসী মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে মিঃ গান্ধী পর্যন্ত অভিযুক্ত হওয়ার পাত্র। মুসলমানের অন্তরে পরাধীনতার অভিশাপ জোর করে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। অন্তরে যদি মুসলমান পরাধীন হয়ে থাকে, রাজনৈতিক অধিকার লাভ করেও সে কখনও স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না। ভারতের আদিম ইতিহাসের পাতায় একবার দৃষ্টিপাত করুন; দেখবেন এখানকার আদিম অধিবাসী অনার্যদের উপর আর্যরা কিরূপ অত্যাচার করেছে; তাদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের ঐতিহ্য কি করে তারা পিষে মেরেছে। তার ফলস্বরূপ আজ অনার্যরা অনুভূতি হারিয়েছে, নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলেছে। অনার্য জাতির পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বীর। আর্যরা তাদের নাম দিল অসুর। এই "অসুর বধের" উৎসব আজও হয়। আজ অত্যন্ত লজ্জা ও বেদনার কথা, অনার্য হিন্দুদের বংশধরেরা সেই উৎসবে যোগ দেয়। একেই বলে জাতীয় অধঃপতন। ভারতের মুসলমানকেও এই অধঃপতনের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। ওয়ার্দা স্কীমই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।" (দৈনিক আজাদঃ ৯ এপ্রিল ১৯৩৯)।

[সংসক্তি ক]

ইতিহাসের রূপান্তর
ও
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একদিক

www.pathagar.com

আজ আকরাম খাঁ সাহেবের সতর্কবাণী অনুযায়ী আমাদের 'বাঙ্গালীত্বের' পূজারী, 'বাঙ্গালী' জাতীয়তাবাদের ধ্বজাবাহীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে, এরাও কি ভারতের আত্মবিস্মৃত আদিম অনার্য পদাঙ্ক অনুসরণে মত্ত?

অবশ্য এই বিচিত্র সম্ভাবনা হেসে উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। কারণ এতোদ্দেশে আদিমকালে অনার্য লোকেরাই ছিল একমাত্র অধিবাসী। আর্যদের আগমন, আগ্রাসন এবং জবরদখলের পরেও এরা ছিল সংখ্যাগুরু এবং এরাই পরে বিপুলসংখ্যায় প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম ও পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। নিতান্ত বৈদগ্ধশালী জ্ঞানী, গুণী, উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, কবিরাজ, চাকুরে, ব্যবসায়ী হলেও, শত শত বৎসর পূর্বের উর্ধ্বতন পুরুষের ন্যায় বর্তমান কালের অধঃস্তন পুরুষ হিসাবে বর্ণহিন্দুদের প্রচারণার ফাঁদে পা দিয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো এদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়- যতই তা অভিজ্ঞতার অভাবে, অজ্ঞতাবশত পূর্বপুরুষেরা যে ভুল করেছে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভের পরও জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোকিত এই বিংশ শতাব্দীতেও বৈদগ্ধশালী মুসলিম সমাজ যদি সেই একই ভুল করে, তাহলে তার চেয়ে মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক ঘটনা আর কি হতে পারে? এবং সেই সঙ্গে তা খোদ 'জ্ঞান' এবং 'বৈদগ্ধ' শব্দ দুটির জন্যও কি কলঙ্কজনক নয়?

যুদ্ধকালে হত্যা বা নাজীনীতি অনুযায়ী যুদ্ধ পরবর্তী হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা না করে একটি জাতিকে ধ্বংস করার প্রকৃষ্ট পন্থা পরাজিত জাতির নিজস্ব সত্তা, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ বিনষ্ট করা। তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়ে একটি দাস জাতিতে পরিণত করার এটাই উত্তম পন্থা, একটি জাতির স্বাধীন জাতীয় সত্তা গড়ে ওঠে তার ধর্ম, তার জীবন বিশ্বাস, তার ঈমান, আকিদা, তার তাহজীব-তমুদ্দুন-সংস্কৃতি প্রভৃতি অবলম্বন করে যা এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ সংঘাতময় দুনিয়ায় তাকে তার নিজস্ব জাতীয় চেতনা, জীবন-দর্শন ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কাজেই নিছক হত্যাকান্ড বা দৈহিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে কোন জাতিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে কূটনীতি অবলম্বনে তাকে ধ্বংস করার এই সনাতন পন্থাই উত্তম। তার ধর্মবিশ্বাস, ঈমান, আকীদা, তাহজীব-তমুদ্দুন ধ্বংস করা বা তার বিরুদ্ধবাদী সংস্কৃতি দ্বারা তাকে গ্রাস করা আধুনিক আগ্রাসনের নবতর কৌশল। বলাবাহুল্য, মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও ঈমান, আকীদার সঙ্গে তার সংস্কৃতির সম্বন্ধ অতি নিবিড়। সংস্কৃতি বিনষ্ট হলে বা বিকৃত হলে তার ধর্মবিশ্বাসও অনুরূপভাবে বিপন্ন, বিকৃত, বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। তাই সহজ পন্থায় একটা জাতির স্বকীয়তা, স্বাধীনতাসত্তা ধ্বংস করার প্রাথমিক পর্যায় তার নিজস্ব সংস্কৃতি নষ্ট করা বা অন্য বিজাতীয় সংস্কৃতি দ্বারা ঐ জাতির সংস্কৃতি গ্রাস করা। পরিণামে নিজস্ব সংস্কৃতির অভাবে জাতিটি তার স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে ফেলে এবং অচিরে লোপ পেয়ে যায় তার

www.pathagar.com

স্বাধীন সত্তা ও জাতীয়তার চেতনা যা তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার সর্বপ্রধান অনুপ্রেরণা। কারণ মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।

নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনসত্তা সম্বন্ধে এই যে সদাজাগ্রত সচেতনতা এটাই জাতির আত্মিক শক্তি, এটাই ভৌগলিক ও স্বাতন্ত্র্য বা রাজনৈতিক স্বাধীনসত্তা নির্বিশেষে একটা জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে। এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন ইহুদী সম্প্রদায়।

এটা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, শতকরা পঁচাশিজন মুসলিম সংখ্যাগুরুর দেশ এই বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি যে নিশ্চিতভাবেই হবে-ইসলামিক ধ্যান-ধারণা ভিত্তিক; 'বাঙ্গালী' সংস্কৃতি তথা রবীন্দ্র সংস্কৃতি তথা হিন্দু ধর্ম, বেদ- উপনিষদ ভিত্তিক সংস্কৃতি নয়-এ একটি অবিসম্বাদিত ঐতিহাসিক সত্য। হিন্দু এবং মুসলিমদের সংস্কৃতি এবং জাতীয়তা যে সম্পূর্ণ আলাদা, এই স্বতন্ত্র সংস্কৃতি তাহজীব-তমুদ্দুনই যে জাতীয় সত্তার প্রাণস্বরূপ এবং ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নির্বিশেষে যে এটাই একটা জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে, এ সত্য বহু হিন্দু মনীষীও স্বীকার না করে পারেননি। ১৯১৩ সালে প্রখ্যাত হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল বলেন ঃ "আমাদের মধ্যে (অর্থাৎ হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে) যে জাতিগত বিভিন্নতা বিদ্যমান, তা কেবলমাত্র দেশের অংশবিশেষ চিহ্নিত হওয়ার উপর বা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্ব-কলহের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তা প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক ও বিভিন্নতার উপর। মুসলমানদের অধীনে কি হিন্দু কি মুসলমান আমাদের সকলেরই একটা সাধারণ গভর্নমেন্ট ছিল। কিন্তু তা হিন্দু সংস্কৃতির নিজস্ব সত্ত্বা ধ্বংস করেনি। আমরা আমাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছি এবং আমাদের নিজস্ব কিছু কিছু দিয়েছি। কিন্তু রেওয়াজ এবং আদর্শের এই দেওয়া নেওয়া আমাদের নিজস্ব ধারণা এবং বিশিষ্ট সংস্কৃতি ধ্বংস করেনি এবং সেই বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণা এবং সংস্কৃতিই হচ্ছে জাতীয়তার যা কিছু বুঝি তারই আত্মা এবং সার পদার্থ। এটা কোনক্রমেই মাত্র একটা রাজনৈতিক ধারণা বা আদর্শের ব্যাপার নয়। এটা এমন একটা জিনিস যা আমাদের সমষ্টিক জীবন ও কর্মধারার সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত। এটা আমাদের পারিবারিক, আমাদের সমষ্টিগত, আমাদের সামাজিক, আমাদের সমাজ-প্রচলিত অর্থনৈতিক রেওয়াজ-রসমের মধ্যে সংগঠিত। (বিপিন চন্দ্র পাল-মে ১৯১৩)

জাতিগত অস্তিত্ব বেঁচে থাকে নিজস্ব এইসব ঈমান আকীদা, জীবন দর্শন, তাহজীব-তমুদ্দুন-সাংস্কৃতিক কারণে। যে জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলে সে জাতি তার নিজস্ব স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধও হারিয়ে ফেলে। নিজস্ব সংস্কৃতি ও জাতীয় চেতনাবোধবিহীন আত্মবিস্মৃতি জাতি পরিণামে তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক জাতীয়সত্তা, তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। এই রকম আত্মবিস্মৃত জাতির বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নিদর্শন আর্যজাতি কর্তৃক পরাজিত এই উপমহাদেশের প্রাগ-আর্য

www.pathagar.com

জাতিসমূহ। এই প্রাগ-আর্য জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ আর্যদের আক্রমণজনিত ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিল।

যারা কোনক্রমে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিল তারা পাহাড়, পর্বতে, গভীর অরণ্যে, দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে। বর্তমানে পাহাড়ে-জঙ্গলে বসবাসকারী সাঁওতাল, কোল, ভীল, চাকমা, মুরং, গারো, নাগা প্রভৃতি আদিবাসী ও উপজাতীয়গণ আর্য আগ্রসনে পরাজিত জাতিসমূহেরই বর্তমান বংশধর। আর এদেরই কিছুসংখ্যক, যারা প্রাণের দায়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের আর্য প্রভুগণ শূদ্র বা ক্ষুদ্র, বানর ইত্যাকার ঘৃণাসূচক মানবেতর নামে অভিহিত করে সমাজের সর্ব নিম্নস্তরে দাস হিসাবে স্থান দান করে। এদের জাতীয় বীরগণ, যারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে জীবনাহুতি দিয়েছিল তাদেরে আর্য জাতি রচিত ধর্মগ্রন্থ পুরানসমূহে চিত্রিত করা হয়, 'অসুর' 'রাক্ষস' 'দৈত্য' ইত্যাদি মানবেতর বিশেষণে এবং বিচিত্র ঐতিহ্যশালী এই পরাজিত জাতি যাতে তার নিজস্ব জাতীয় সত্তা-সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলে সেই উদ্দেশ্যে রচিত হয় বিধিবিধান সমূহ যেখানে এদের দেখানো হয়েছে ব্রহ্মার অধমাঙ্গ হতে সৃষ্ট হিসাবে অর্থাৎ এরা মনুষ্য সমাজে সবচাইতে নিকৃষ্ট এবং ঘৃণিত। এদের স্পর্শ করাও উভয়েরই প্রতিপাল্য ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী মহাপাপ। এদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংস করে অতি সুকৌশলে এদের মগজে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে বিজাতীয় অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতি। পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে, ধর্মীয় সামাজিক বিধানসমূহে সবকিছুর মাধ্যমেই এদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে হীনমন্যতা। অর্থাৎ তারা যে প্রকৃতপক্ষে খুবই ঘৃণ্য,নীচ এবং অপবিত্র, অসাধ্য, যাদের কলুষিত স্পর্শ হতে বর্ণ হিন্দুদেরকে রক্ষা করা এইসব বর্ণ হিন্দু এবং এইসব অস্পৃশ্য বর্ণসমূহ উভয় পক্ষের জন্যই ধর্ম শাস্ত্রীয় বিধান। [সংসক্তি-ক ইতিহাসের রূপান্তর ইত্যাদি] এই বর্ণশ্রম প্রথা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি হিন্দু ধর্মীয় বিধানাবলীর অপরিসীম অবজ্ঞা, মিঃ গান্ধী প্রমুখ হিন্দু নেতৃবর্গের বিভিন্ন প্রকার সমালোচনা এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও এখনও হিন্দুসমাজে বেশ জীবন্তভাবেই সক্রিয়। নিম্নে দু'একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশিত হলঃ

"গুণাবলী ও কর্মের বিভিন্ন বিন্যাসের মধ্যদিয়ে চারটি বর্ণ আমার থেকেই (অর্থাৎ ব্রহ্ম হতে) উৎপন্ন।" (ভাগবত গীতা)

"হিন্দু ধর্ম, তার পদ্ধতিঃ- পদ্ধতিটি বর্ণ শ্রমকে কেন্দ্র করে বোনা কারণ তা ধর্মের দ্বারা বিধানকৃত।" (স্বামী বিবেকানন্দ-আমার প্রভু)

এর বিরুদ্ধে সমালোচনাও হয়েছে অনেক যদিও তা হিন্দু সমাজ জীবনে বিশেষ কোন দাগ কাটতে পারেনি।

www.pathagar.com

"বর্ণ শ্রম প্রথা হয়েছে একটি বৃহত্তম অভিশাপ। আমাদের সমাজের হরিজনদের পৃথকীকরণ পৃথিবীর অন্যত্র জাতিগত বা বর্ণগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য বর্ণনা অন্যান্য বাধার চেয়ে কঠোরতর।"

(কনফ্রেণটেশন উইথ পাকিস্তান-লেফটেন্যান্ট জেনারেল বি, এম, কাউল -১৯৭১)

উপমহাদেশের আর্য-পূর্ব যুদ্ধের সুসভ্য দ্রাবিড় গ্রুপের জাতিসমূহ এবং উপজাতীয়দের সঙ্গে বিজয়ী আর্যরা তথা বর্ণ হিন্দুরা কি ধরনের ব্যবহার করে থাকে, সে সম্পর্কে হরিজন সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদিত নেতা ডাঃ বি আর আম্বেদকার-এর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তাঁর ভাষায়ঃ "নির্যাতিত জাতিসমূহের প্রতি দুনিয়ার অন্যান্য অংশের অজ্ঞাত সামাজিক উৎপীড়নঃ জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে নির্যাতিতদের কর্মসংস্থান বন্ধ করে দিয়েছে, সাধারণ্যে ব্যবহৃত পথ ব্যবহারে নিষেধ আরোপ-গ্রাম্য বানিয়া কর্তৃক জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রয় বন্ধ"।

-'হিন্দুর কাছে এইসব নির্যাতিতরা হচ্ছে মানবেতর জীব'।

-'আমাদের সকল প্রচেষ্টার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই হিন্দু ধর্ম'।

-'হিন্দু ধর্ম নির্যাতিতদের মধ্য থেকে জীবন নিংড়ে বের করে আনে'। 'আবার সোহাগ করে তাদের আবদ্ধ করে আনুগত্যে'।

-'পুলিশ বিভাগে কোন নির্যাতিত জাতির লোক নিযুক্ত হতে পারে না। কারণ সে হচ্ছে অস্পৃশ্য। সেনাবাহিনীতেও একই অবস্থা'। ১৯৩০ সালে একদল বর্ণ বহির্ভূত চামারের ধৃষ্টতা হয়েছিল রাজপুতদের মতো তাদের এক বরকে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার করানোর। বর্ণ হিন্দুরা আদেশ জারি করলঃ

(১) হাঁটুর নীচে কাপড় পরা যাবে না।

(২) নারী-পুরুষের স্বর্ণালংকার পরা যাবে না।

(৩) ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারবে না।

(৪) পুরুষেরা ও মেয়েরা (বর্ণ হিন্দুদের) গোলাম হিসাবে কাজ করবে।

(৫) বিবাহ মিছিলে ঘোড়া ব্যবহার করতে পারবে না ইত্যাদি।

-"শূদ্র তাদের শব বহন করতে পারে শুধু শহরের দক্ষিণ দরজা দিয়ে'।

-'এই সামাজিক বর্জনের চাইতে নির্যাতিত জাতিসমূকে অবদমনের জন্য আরও অধিক কার্যকরী অস্ত্র আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই'।

(বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক ১৯৩০-৩১ সালে প্রদত্ত ডাঃ বি আর আম্বেদকার- এর ভাষণ হতে উদ্ধৃত)

-'আহমেদাবাদের কোন এক অঞ্চলে বুকে হাঁটার হুকুম জারি হয়েছিল। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে পাঞ্জাবে যে ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনে নেমেছিলেন

www.pathagar.com

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই স্বস্থানে আবার সেই ঘটনাটি ঘটেছে'। (অন্নদা শঙ্কর রায়ঃ এই প্লেগঃ যুগান্তর, বৃহস্পতিবারঃ ২০ কার্তিক, ১৩৬৭) ঃ আহমেদাবাদ ১৭ জুন, একটি গ্রাম। নাম রণমালা। পুরা গ্রামের একটি কূপউত্তোলিত এক কলসী পানির জন্য প্রতিহিংসাপরায়ণ জনতা দুইজন হরিজনকে হত্যা করিল, অন্তত দশজনকে আহত। (দৈনিক ইত্তেফাক ২৯ জুন, ১৯৭৪) -'সম্প্রতি নীলোর জেলার পালারাঙা দীপালীতেও প্রথমে পিটাইয়া মারা হয়। পরে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হয়। অভিযোগ ইহারা লেবু চুরি করিতে জনৈক বর্ণহিন্দুর বাগানে ঢুকিয়াছিল। ইতিপূর্বে খাওয়ার পানিতে ছোঁয়া লাগাইবার অপরাধে জনৈক হরিজন বালিকাকে পোড়াইয়া মারার ঘটনাও ঘটিয়াছিল এই ভারতে'। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ চৈত্র ১৯৮৫)

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই আত্মবিস্মৃত জাতি নিজেরাও এই চরম অন্যায় বিধানাবলী বিনা প্রতিবাদে অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নিজেদের ধর্মীয় বিধান হিসাবে প্রতিপালন করে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও ইতিহাসের এ একটা বিরাট ট্রাজেডি যে, হানাদার অর্ধসভ্য আর্যজাতি কর্তৃক পরাজিত, উৎপীড়িত নির্গহীত এবং নিহত তাদের নিজেদেরই জাতীয় বীর পুরুষগণকে এরাই শিখিয়েছে ঘৃণা করতে। বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে বিভ্রান্ত নিজেদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, এইসব অচ্ছুৎ সম্প্রদায় এত বেশি আত্মবিস্মৃত যে, যে বর্ণ হিন্দু কর্তৃক তাদের প্রতিকৃত এই বঞ্চনা, এই লাঞ্ছনা, এই শোষণ-পীড়ন-নির্যাতন সত্ত্বেও অতি সুকৌশলী প্রচারণার মাহাত্ম্যে সেই বর্ণহিন্দুদের পদাঘাত লাভ করেও এরা সেই পায়েই মাথা ঠেকিয়ে জানায় 'প্রণাম'। হায়রে আত্মবিস্মৃত জাতি! সাংস্কৃতিক আগ্রাসনজনিত মস্তিষ্ক ধোলাই-এর কারণে এই সুপ্রাচীন জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব জাতীয় চেতনাবোধের অবক্ষয়জনিত অধঃপতনের কি মর্মান্তিক পরিণতি! [দ্রঃ সংসক্তি ক]

চরম পরিতাপের বিষয় যে, এতদেশীয় মুসলমান নামধারী হিন্দু সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার এক বিশেষ গোষ্ঠী-এদের মধ্যে কয়েকজন বৈদগ্ধশালী মহাজন ব্যক্তিও রয়েছেন –আত্মবিস্মৃত এই অনার্য জাতির নির্মম ঐতিহাসিক পরিণতি চোখের সামনে দেখেও শতকরা পঁচাশিজনের নিজস্ব সংস্কৃতি বাদ দিয়ে 'বাঙ্গালী' সংস্কৃতি তথা রবীন্দ্র সংস্কৃতির ধুয়া তুলে এই দেশে বেদ উপনিষদভিত্তিক হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় মত্ত। 'বাঙ্গালী' সংস্কৃতি তথা রবীন্দ্র সংস্কৃতি যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সংস্কৃতি, তা আমাদের কষ্ট-কল্পনাপ্রসূত কোন অলীক বক্তব্য নয়। 'হিন্দু' ভারতের অবিসম্বাদিত নেতা মিঃ গান্ধীর ভাষ্য এ সম্বন্ধেঃ "রবীন্দ্রনাথ বিধৃত বাংলার সাধারণ সংস্কৃতির রূপ যেহেতু উপনিষদের দর্শনে নিহিত এবং উপনিষদীয় দর্শন শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের সাধারণ উত্তরাধিকার" (মিঃ গান্ধীর সেক্রেটারী পিয়ারীলাল কৃত মহাত্মা গান্ধী 'দি লাস্ট ফেজ' দ্বিতীয় খন্ড)।

www.pathagar.com

বাংগালীত্বের দাবিদার এই গোষ্ঠীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া আজ বিশেষ প্রয়োজন যে, এ দেশের শতকারা পঁচাশিজনের ধর্মবিশ্বাস, জাতীয় ইতিহাস, তাহজীব, তমুদ্দুন সংস্কৃতিবিরোধী, মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন এই তথাকথিত 'বাঙ্গালী' সংস্কৃতির নামে এই বিজাতীয় সংস্কৃতির আমদানী পরিণামে ঘোর অকল্যাণ ডেকে আনবে- অবাঞ্ছিত দুর্যোগ সৃষ্টি করবে যার কবল থেকে তাদের বৈদগ্ধশালিতা সত্ত্বেও তারা কোনক্রমেই রেহাই পাবেন না। বিপুলভাবে মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশী জাতির সংস্কৃতি মূলত মুসলিম সংস্কৃতি যা গড়ে উঠেছে প্রায় আটশত বছরের মুসলিম আমলে ইসলামের চৌদ্দশ' বছরের অভিযানের ফলশ্রুতি হিসাবে। যার ভিত্তি রয়েছে কোরআন হাদিসে, আদর্শ মানব রসূলের (দঃ) ঘটনাবহুল জীব চরিত্রে, খোলাফায় রাশেদীনের আদর্শ রাষ্ট্রে, পীরদরবেশ, আওলিয়া, গাওসকুতুব মোজাদ্দেদের আত্মত্যাগী সাধনার মধ্যে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ধর্ম প্রচারকারী, মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী ও জেহাদী মুজাহিদদের কর্মকান্ডের মধ্যে। ইসলামী তমুদ্দুন, ইসলামের ধর্ম বিশ্বাসবিরোধী যে কোন সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান বা কার্যকলাপ সেই বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ন রেখে কোনক্রমেই চলতে পারে না। কারণ, কোন জাতির সংস্কৃতি, তার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সহজবোধ্য কারণেই হিন্দু সংস্কৃতি, তথা রবীন্দ্র সংস্কৃতি তথা 'বাঙ্গালী' সংস্কৃতির মূলে রয়েছে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ধর্মবিশ্বাস-যার ভিত্তি বেদ-উপনিষদের উপরই বিন্যস্ত। আর এই সহজবোধ্য কারণেই যে কোন দেশের মুসলিমদের সংস্কৃতি কোরআন, হাদিসভিত্তিক না হয়ে পারে না। যদি তারা মুসলিম হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে চায়, নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয়সত্তা বজায় রাখতে চায়, তাহলে এটি অপরিহার্য। এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে একারণেই ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া বিশেষভাবে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্যবোধ ছাড়াও সংস্কৃতিগত পরিচয়ের মধ্যেও এক মূলগত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতিতে, জন্মমৃত্যু, বিবাহের অনুষ্ঠানে, পরিধেয়ের ব্যাপারে, সামাজিক মেলামেশায়, আলাপ-বিলাপে, আচার-ব্যবহারে অন্য দেশের মুসলিমদের সঙ্গে যে একটা নিবিড় যোগসূত্র আছে, তা অতি সহজেই লক্ষণীয়। ঈদুল ফিতর ও বকরা ঈদের নামাজের জামাতে, সামাজিক কর্মকান্ডে একসাথে খানাপিনার কারণে, বিশেষত হজ্ব পালনের মধ্যে যোগসূত্র ও নিবিড় বন্ধন অতি সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত, যা হাজার বছর ধরে হিন্দুদের সঙ্গে একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করেও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে বাংলাদেশের শতকরা পঁচাশিজন মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীই বিবেচ্য। অবশ্য অজ্ঞতাবশত কিছু কিছু অমুসলিম রেওয়াজ যে গ্রামীণ জীবনেও কিছুটা অনুপ্রবেশ করেনি তা নয়। তবে এটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার, যা বর্তমানে শিক্ষা ও জ্ঞানের

www.pathagar.com

প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হচ্ছে। তবে ইসলামের মূল বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সঙ্গে গ্রামীণ মুসলিম সমাজের আচার-আচরণের বিশেষ কোন গুরুতপূর্ণ বিরোধ পরিলক্ষিত হবে না। কিন্তু বিবেচ্য নয় শতকরা দশমিক শূন্য শূন্য এক ভাগ বৈদগ্ধশালী, জ্ঞানপাপী, শহুরে নব্য 'মুতাজিলা' সম্প্রদায়, যাদের কূটতর্ক-যুক্তি অনুযায়ী চিরন্তনী ইসলাম হয়ে পড়েছে "অ্যান্টিডেটেড" বা বর্তমানকালের অনুপযোগী ও 'সেকেলে' যাদের জ্ঞানের আলোকে সবচাইতে কালোপযোগী প্রতিভাত হয় রামমোহন রায় ও রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-সংস্কৃতি; যারা ইসলামী ঈমান-আকিদা, তাহজীব-তমুদ্দুন বিসর্জন দিয়ে, মিলাদ মাহফিল, ওয়াজ-নসিহতের মজলিস এড়িয়ে আজ কবর জিয়ারতের বদলে মত্ত হয়েছেন বেঅজু, নগ্নপদে, স্বল্প বস্ত্রাচ্ছাদিত বেশে (নারী সম্প্রদায়) দেবী লক্ষ্মী পূজার অঙ্গীভূত যে আল্পনা সেই আল্পনা অঙ্কিত শহীদ স্মৃতি 'তর্পণে', জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে মঙ্গল ঘট ও প্রদীপের বিজাতীয় রেওয়াজ-রসম অনুসরণে শহীদ মিনারে দ্রোপদীর বস্ত্রহরণের মহাড়াপালনে এবং নবীনবরণ, প্রবীণবরণ, হেমন্তবরণ, গ্রীষ্মবরণ, বসন্তবরণ, বর্ষাবরণ, হর্ষবরণ প্রভৃতি হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণের মতো পৌত্তলিকতা ও শেরেকী বিদা'তের পাদপীঠস্বরূপ সাংস্কৃতিক উৎসবের অনুষ্ঠানে। এরা কি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষাসমৃদ্ধ মতাজিলা দর্শন প্রদীপ্ত বাগদাদের নির্মম পরিণতির কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছেন?

কিন্তু, অতীতের (অর্থাৎ ইতিহাসের) শিক্ষা যাদের স্মরণ থাকে না, তারা সেই (দুর্যোগময়) পরিস্থিতিতেই অবস্থান করার শাস্তি ভোগ করে।

Those who will not remember the past will be condemned to relive it"
-Santayana.

এই প্রসঙ্গে এও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, রবীন্দ্র সংস্কৃতি তথা 'বাঙ্গালী' সংস্কৃতির মূল রয়েছে হিন্দুধর্মে, হিন্দুদের উপনিষদ দর্শনে যদিও ঐ সংস্কৃতি অনেকটা পরিপুষ্টি লাভ করেছে নৈতিকতাবিহীন পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার আওতায় প্রায় দু'শ বছরের বৃটিশ শাসন আমলের সৃষ্টি 'বাঙ্গালী' সমাজের উদয়ে।

এই 'বাঙ্গালী' সংস্কৃতির যে বীভৎস আলেখ্য উদঘাটিত আজ সহশিক্ষাসম্বলিত স্কুল-কলেজে, সভা-সমিতি মিছিলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় এবং বিচিত্র আল্পনা অঙ্কিত, মঙ্গলঘট শোভিত, পুষ্পপত্র মঙ্গল প্রদীপ আলোকমালা দীপ্ত, নারী সঙ্গীত নৃত্য ঝংকৃত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদযাপনে তা-যে কোন জাতিকে চরম অবক্ষয়ের রসাতলে নিক্ষেপ করার জন্য যথেষ্ট। এর ফলে সামাজিক, নৈতিক এবং গৌণভাবে হলেও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে বিষাক্ত পরিবেশ ও দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কিছুটা চৈতন্যবোধ অন্ততপক্ষে সেসব প্রবীণদের থাকা উচিত, যারা প্রাগবিভাগ কলিকাতার কলুষ কালিমাময় নৈতিকতাবিহীন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিঞ্চিত অভিজ্ঞতা রাখেন-অন্তত তাদের কোন বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়, সেই

www.pathagar.com

সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপও তার বিষাক্ত অবদান সম্বন্ধে–যে সংস্কৃতির কল্যাণে সেই ঐতিহ্যমন্ডিত রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সম্মানিত মহিলাদের স্থান হয় বোম্বের চিত্রজগতে, যে সংস্কৃতির প্রভাবে সিনেমা-থিয়েটারের বদৌলতে বারবণিতাও অধিষ্ঠিত হয় দেবীর আসনে, যে সংস্কৃতির এক বিশেষ অবদানে ম্যাসেজ হাউজে আপন কাকা ও ভ্রাতৃষ্পুত্রীর হয় সাক্ষৎ, যে সংস্কৃতির মহিমায় আপন গর্ভধারিণী ও সহোদরা ব্যতীত মাসীপিসি নির্বিশেষে সকল নারীই গণ্য হয় শুধু কামরতির পাত্রী হিসাবে এবং যে সংস্কৃতির ফলশ্রুতিতে শিক্ষা-দীক্ষায় আলোকদীপ্ত, সুপ্রচুর অর্জিত এবং অনার্জিত অর্থসম্পদে স্ফীত পারমাণবিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত বর্তমান দুনিয়ার চতুর্থ মহাশক্তির দাবীদার ভারত। নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়ের দুর্বার আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে ত্রাহি রব ছাড়ছে। এ দেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে, বিপথগামী কতিপয় বৈদগ্ধশালী ব্যক্তির এই যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রচেষ্টার কথা, এ কোন উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা বা অমূলক আশংকা মাত্র নয়। এর অকাট্য নিদর্শন অত্যন্ত পরিস্ফুট আমাদের সমাজের কতিপয় শিক্ষাভিমানী তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে।

উল্লেখ্য, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকারে যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলছে-এদেশের 'বাঙ্গালী' তথা রাবীন্দ্রিক অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতির প্রবক্তাদের প্রচারণা তারই বাংলাদেশী সংস্করণ। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ভারতীয় হিন্দু সাহিত্যিক ও সমালোচক মিঃ অন্নদাশংকার রায়ের একটি ভাষ্য তুলে দেয়া যেতে পারে-যাতে করে এ সম্বন্ধে কারও মনে যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে তো তার নিরসন হতে পারে। ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের উল্লেখ তিনি করেছেন এ দেশেও সেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে দেবার জন্যই যে এরা এতটা হৈ চৈ করেছে তা বলাই বাহুল্যঃ

'মুসলমানকে হিন্দু করা সম্ভব নয়, কিন্তু হিন্দীভাষী করা সম্ভব'। আমাদের এই সেক্যুলার রাষ্ট্রে এমন একটি দল আছে, যে মুসলমানকে পারলে বিতাড়ন করবে, না পারলে হিন্দু বানাবে। তাও যদি না পারে, তবে সংস্কৃতির দিক থেকে হিন্দুতে পরিণত করবে। (যুগান্তর ২০শে কার্তিক ১৩৬৭)

www.pathagar.com

উপমহাদেশে আর্য সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন

এই দেশের 'বাঙ্গালী'রা অর্থাৎ আর্যবংশোদ্ভুত বর্ণহিন্দুরা যে রাষ্ট্র বহির্ভূত জাতীয়তাবাদের আদর্শের অনুসারী, বর্তমানে এবং অতীতে তা বিভিন্ন সময়ে তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এই রাষ্ট্রবহির্ভূত আনুগত্য যদি আমাদের নিজস্ব জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে তা অভিনন্দনযোগ্য বটে। কিন্তু কার্যত তাদের এই আনুগত্য ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য মোটেই অনুকূল নয়। এদের অনুসৃত হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদতো বটেই বাংলাদেশর স্বাধীনতা -সার্বভৌমত্ব এমনকি এর অস্তিত্বের প্রতিও গুরুতর হুমকিস্বরূপ।

১৯৩৫ সালে ভারত হতে বার্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত ক্যালেন্ডার, পঞ্জিকা ইত্যাদিতে 'ভারতমাতা দেবীর মূর্তি' এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত করা হত, যাতে করে, 'দেবীর' মস্তক থাকতো কাশ্মীর এবং পামীর মালভূমির উপর। পদযুগল কুমারিকা অন্তরীপ ছাড়িয়ে শ্রীলঙ্কার উপর ন্যস্ত হত। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হত বেলুচিস্তান, ফ্রন্টিয়ার, কাবুল পর্যন্ত এবং বাম হস্ত প্রসারিত হয়ে যেতো বার্মার পূর্বসীমা পর্যন্ত। যদি সেই সময়ে বার্মার ন্যায় থাইল্যান্ড (শ্যাম), কম্বোডিয়া. লাওস ও ভিয়েতনাম বৃটিশ অধিকারভুক্ত থাকতো, তাহলে সন্দেহ নেই যে, 'দেবীর' বাম হস্তের অঙ্গুলিসমূহ অন্ততপক্ষে করধৃত শংখ, পদ্ম, গদাচক্র প্রভৃতি আয়ুধমালা, ইরাবতী, সালাউইন ও মেকং নদী অতিক্রম করে দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত স্পর্শ করতো।

এই প্রসঙ্গে বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে আন্তর্জাতিক জিওনিষ্ট পন্ডিতগণ কর্তৃক রচিত ইতিহাস খ্যাত 'প্রটোকোল' এ (Protocol) সর্পরেখা পরিবৃত মদিনা ও মিসরসহ ভবিষ্যৎ জিওনিষ্ট রাষ্ট্রের যে রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে, তা বিশেষভাবে তুলনীয়। আন্তর্জাতিক জিওনিষ্টবাদের মত এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঢোল পেটাবার জন্য এরা এদের 'বৃহৎ ভারত' বা জম্বুদ্বীপের পরিকল্পনায় সমগ্র ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, পর্যন্ত তথাকথিত হিন্দু সাম্রাজ্য এবং হিন্দু ঔপনিবেশিক শাসনের মহিমা কীর্তন করে চলেছেনঃ

"The colonial and cultuural expansion of India is one of the most brikkiant but forgotten episode of Indian History of which any Indian may justly feel proud"
[R.C. Majumdar, H. C Battacharya and Kalikinkar Dutt advanced history of India-p.223]

www.pathagar.com

অর্থাৎ "ভারতের (হিন্দু) ঔপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তার (মালয়, সুমাত্রা, জাভা, থাইল্যান্ড, ইন্দোচায়না প্রভৃতি দেশে) ভারতীয় ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল, কিন্তু বিস্মৃত অধ্যায় , যে ব্যাপারে যে কোন ভারতীয় (হিন্দু) ন্যায়-সঙ্গতভাবেই গর্ব অনুভব করতে পারে।"

উল্লেখ্য, এই তিনজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকই বর্ণহিন্দু বা বাঙ্গালী তবুও এটা অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হয়- বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের, ঔপনিবেশিকবাদের ধিক্কারে, নিন্দায় অধুনা যারা পঞ্চমুখ, যারা মুসলমানদের ভারত বিজয়কে আগ্রাসন, অত্যাচার, শোষণ-পীড়ন বলেই চিত্রিত করে থাকেন, তারা কেমন করে হিন্দুদের ঔপনিবেশবাদের, সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে এমন জোরালো অভিনন্দন বাণী বর্ষণ করতে পারলেন? এ জন্য লজ্জা, ঘৃণাবোধ দূরে থাক, সকল হিন্দুরই গর্ববোধ করা উচিত বলে ওনারা ওকালতি করলেন। আরও আশ্চর্য যে, এদেশে মুসলমান এবং ইংরেজ রাজ্য স্থাপনে, মুসলিম এবং বৃটিশ সাংস্কৃতিক অবদানে, এরাই সমধিক উপকৃত। এটা ইতিহাসটা লেখার শিক্ষা-দীক্ষা, অনুপ্রেরণা এবং মালমশলা এরা লাভ করেছেন এই মুসলমান এবং ইংরেজী শাসনের কল্যাণেই। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য যে, বিজেতা জাতি হিসাবে মুসলমানগণ ছিলেন সবচাইতে মহৎ, উদারধর্মী। নচেৎ সাত/আট বছর মুসলিম শাসনের পরেও হিন্দুরা উপমহাদেশে সংখ্যাগুরু থাকতে পারতো না। বিজেতা জাতি হিসাবে মুসলমানরা অত্যন্ত উদার, ন্যায়পরায়ণ ও সহনশীল, এ সত্য হিন্দুদের বক্তব্যেও সুস্পষ্টভাবেই স্বীকৃত। রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ প্রভাবশালী হিন্দু নেতৃবর্গ কর্তৃক প্রায় দেড়শ' বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে ১৮২৩ সালে কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের নিকট প্রদত্ত মেমোরিয়ালে এই সত্য অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবেই বিধৃত ও স্বীকৃত হয়েছে। যেমন.....

'মহামান্য হুজুর অবহিত আছেন যে, এতদ্দেশীয় জনগণ তাদের প্রাক্তন মুসলমান শাসকবর্গের অধীনে ধর্মগত বা পেশাগত কোন বৈষম্যের শিকার না হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে সমভাবে, যাবতীয় রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত.... রাজ্যের সর্বোচ্চ চাকুরীতে নিযুক্ত হয়ে এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্বে ও প্রাদেশিক শাসনকার্যে নিয়োজিত হয়ে এবং সুলতানদের যন্ত্রণা, পরামর্শদাতা হিসাবে বিবেচিত হত। তাহারা (হিন্দুরা) করমুক্ত লাখেরাজ জমি লাভ করিত এবং সরকার প্রদত্ত উচ্চ বেতন ছাড়াও তাহারা বিশ্বাসভাজন হিসাবে সম্মানিত পদসমূহের সঙ্গে সংসক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল লাভের সুবিধা ভোগ করিত এবং এই সঙ্গে দেশীয় জ্ঞানী-গুণীজন সচেতন ও মর্যাদাসহ বহু চাকুরী লাভে পুরস্কৃত হইত।'

[১৮২৩ সালে কলিকাতার হিন্দুনেতৃত্ব প্রধানগণ কর্তৃক, সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রদত্ত মেমোরিয়াল]

www.pathagar.com

অপর পক্ষে বিজেতা জাতি হিসাবে বর্তমান হিন্দুদের পূর্বসূরি আর্যরা.....যে চরম অত্যাচারী, ধ্বংসযজ্ঞের হোতা, জুলমবাজ এবং ষোল আনায় আঠার আনা অধিকার দাবীদার ছিলেন, ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই।

যে সকল ঐতিহাসিক মুহম্মদ বিন কাসিম, সুলতান মাহমুদ এবং সুলতান মুহম্মদ ঘোরীর ভারত বিষয়কে অন্যায়, জুলুম-অত্যাচার ও অহেতুক রক্তপাত বলে অভিহিত করেছেন..... [হাবিবঃ সুলতান মাহমুদ অব গজনী ঃ পৃঃ ৭০] তাদের মধ্যে হিন্দুদের আশীর্বাদ প্রয়াসী অত্যুৎসাহী দু'একজন মুসলমান ঐতিহাসিকও আছেন। প্রশ্ন, তাঁরা আর্যদের নির্মম আক্রমণে উত্তর ভারতের হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি সুসভ্য দ্রাবিড় রাজ্যগুলো ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে নিশ্চুপ কেন? এদের আক্রমণ এরূপ পাশাবিক ছিল যে এর কারণে প্রাগ-আর্য ভারতীয় জাতিসমূহ এবং ত্যাগের সভ্যতা তাহজীব..... তমুদ্দুন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। মুহম্মদ বিন কাশিম, সুলতান মাহমুদ ও সুলতান মুহম্মদ ঘোরী রাজনৈতিক কারণে এই দেশে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করলেও এই দেশের কোনো জাতি বা এর সভ্যতা ধর্ম-তাহজীব-তমুদ্দুন ধ্বংস করেননি। আর তাছাড়া এইসব যুদ্ধ অভিযান বিনা কারণেও পরিচালিত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই এর দায়িত্ব ছিল হিন্দুদের। যেমন সিন্ধু রাজ্যের সীমানায় লুণ্ঠিত উৎপীড়িত মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের বিচারে সিন্ধুরাজ দাহিরের অসম্মতি, যেমন, সুলতান মাহমুদ গজনীর ভারত অভিযানের অনেক আগে তার পিতা সবুক্তীনের আমলেই পাঞ্জাব কালিঞ্জর প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী গজনী আক্রমণ করতে গিয়েছিল। প্রতি আক্রমণ সবুক্ত গীন পাঞ্জাব পর্যন্ত তাদের দাওয়া করে নিয়ে এসেছিলেন, যেমন বর্তমান কালে ১৯৬৫ সালের পাঁচই সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে লাহোর দখল করতে এসে ধাওয়া খাও এবং তাদের খেম খারাণ পর্যন্ত পাকিস্তান বাহিনীর দখলে চলে যায়। এই সীমান্তযুদ্ধের পরিণতিতে এবং সন্ধির সর্তের অবমাননার কারণে পরবর্তীতে মাহমুদের ভারত অভিযানগুলি পরিচালিত হয়। অর্থাৎ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। মাহমুদ মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্যে। তখনকার দিনে ধনরত্ন সম্পদ মন্দিরে রাখা হতো। এছাড়া যুদ্ধকালীন সময়ে পন্ডিত, শিল্পী, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উপর হাত ওঠানোর ব্যাপারে মাহমুদের ছিল কঠোর নিষেধাজ্ঞা।

এলিয়টও ডেসেন সম্পদিত "History of India as told by its Historians" সেই সকল ক্ষেত্রে হিন্দুরাজা কর্তৃক শান্তি রক্ষার জন্য মুসলমানদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পরেই যুদ্ধের সূচনা হয়। কিন্তু আর্যদের আক্রমণের সময়ে তারা শান্তিরক্ষার জন্য এরূপ কোন প্রচেষ্টা নেয়নি। নিছক গায়ের জোর, অর্থাৎ বন্যরীতিই ছিল এদের নীতি বা দুর্নীতি। ফলে, এই দেশের প্রাগ-আর্য জাতিসমূহ ও তাদের রাষ্ট্র, সভ্যতা, কৃষি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা-এ সকলই এই হিংস্র ও অসভ্য জাতির আক্রমণে ধ্বংস হয়।

www.pathagar.com

সিন্ধুনদের সেচ ব্যবস্থা, যা ছিল এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এদের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে বিনষ্ট হয়। সমৃদ্ধ ও উন্নত দ্রাবিড় জাতি ও দ্রাবিড় সভ্যতা এই আর্য আক্রমণ, আর্য উপনিবেশবাদ ও আর্য সভ্যতার কল্যাণে এই উপমহাদেশ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ঘটনা সকলের নিকটই সুপরিজ্ঞাত। অথচ ভারতেই বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল।

এই আর্য আক্রমণের কল্যাণে উক্ত পরাজিত জাতির নাম-নিশানা, পরিচয় পর্যন্ত সর্বত্র লোপ পেয়ে কোনমতে মহেনজোদারো ও হরপ্পার "ফসিল" হিসাবে টিকে আছে। যারা কিছুটা সৌভাগ্যবশত পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা করতে পেরেছিল..... তারা হয় পাহাড়ে-পর্বতে গভীর অরণ্যে কোনমতো পালিয়ে বেঁচে ছিল আর নয়ত, আর্যদের দাসত্বে শৃংখলিত হয়ে 'শূদ্র' 'দাস' 'রাক্ষস' বানর' প্রভৃতি ঘৃণাসূচক নামে অভিহিত হয়ে মানবেতর মর্যাদার জীবনযাপন করে এবং কোনমতে দৈহিক আস্তিত্বটুকু বজায় রেখে হিন্দু সভ্যতার 'মহৎ' অবদানের 'প্রশস্তি' ঘোষণা করছে। এই হিংস্র অসভ্য জাতির আক্রমণের নিকট আত্মসমর্পণ করে ও তারারক্ষা পায়নি। পরাজিত জাতির সকল গৌরবময় ইতিহাস অত্যন্ত সুকৌশলে বিকৃত করা হয়। পরাজিতের জাতীয় বীরগণকে বীরের মর্যাদা তো দেয়া হয়নি। মানুষের মর্যদাও দেয়া হয়নি। তাদের জাতীয় বীরগণের চরিত্র এরূপভাবে মসীলিপ্ত করা হয় যে, স্বজাতীয় এই পূর্বসুরীগণকে তারা পশুবৎ বিবেচনা করে ঘৃণা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই বর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের সব চাইতে মারাত্মক অভিশাপ পরাজিত জাতির বিরুদ্ধে তাদের মারাত্মক বিদ্বেষ ও ঘৃণাসূচক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে বিজিত জাতির মস্তিষ্ক ধোলাই করার প্রক্রিয়া যাতে করে তারা নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে এমনভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায় যে এদের জাতীয় বীরপুরুষদের অমর্যদা, নিন্দা, গ্লানিসূচক বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে এরা বিজেতা জাতি অপেক্ষা ও অধিকতর উৎসব এবং আনন্দের সাথে যোগদানে প্রলুব্ধ হয়। তদুপরি, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি দ্বারা এদের মনমানসিকতা এরূপভাবে প্রভান্বিত এবং বিভ্রান্ত করা হয় যাতে তাদেরকে প্রদত্ত মানবেতর জীবনযাপনের ব্যবস্থাই এরা ধর্মীয় নিষ্ঠা ও ধর্মানুগত্য বলে খুশী মনে আঁকড়ে ধরে থাকে। [সংসক্তি ক-ইতিহাসের রূপান্তর ও ভারতীয় ইতিহাসের একদিক] এ সব ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়ার পরে, এই সভ্যতা, এই জাতীয়তাবাদ এই সংস্কৃতি এবং এর ধ্বজাবাহীদের (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) সম্বন্ধে কোন সাধারণ বিবেক -বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনে কোন প্রকার ভুল ধারণা এবং মোহ থাকা কি উচিত? সম্ভব?

www.pathagar.com

হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শিক দ্বন্দ্ব

একটি কথা বিশেষভাবে স্মর্তরা যে– ৭১২ সালে মুহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের সময় হতেই হিন্দু সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের সাথে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদী ও তার ধ্যান-ধারণা আদর্শের সংঘাত শুরু হয় যে সংঘাত আজ এই সংস্রাধিক বছর ধরে চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে যতদিন না এক শক্তি, এক আদর্শ, এক সংস্কৃতির দ্বারা অপসংস্কৃতিকে লীন করা না যায়। এই সংঘাত কোন সময়ে প্রত্যক্ষ কোন সময়ে পরোক্ষভাবে চলেছে, যদিও সময়বিশেষে সাময়িকভাবে স্তব্ধ থেকেছে।

শান্তি বারি বা মিলনের বাণী যতই বর্ষণ করা হোক না কেন, এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই দুই আদর্শের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য্য।

কোন কোন জ্ঞানপাপী, এ সত্য না দেখার ভান করলেও এই দুই ধর্মের, দুই সংস্কৃতির দুই জীবন ব্যবস্থার মূলগত বৈপরীত্য এবং বৈরীসম্বন্ধ দিবালোকের মত উজ্জ্বল সত্য। কোন কোন হিন্দু নেতৃবর্গের নিকট এটা বহু পূর্বেই, পাকিস্তান পরিকল্পনার অনেক আগেই সুস্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়েছে। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল আগে প্রকাশিত মিঃ ইন্দ্র প্রকাশ রচিত একটি প্রমাণ্য পুস্তকে হিন্দুবঙ্গের তৎকালীন অবিসম্বাদিত নেতা দেশবন্ধু মি. আর দাশের লিখিত বিখ্যাত হিন্দু মহাসভা নেতা, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়ের ১৯২৫-২৬ সালের একখানা চিঠিতে এই সত্য স্বীকার করা হয়েছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং দ্ব্যর্থহীনভাবেই। লালাজী বলেছেনঃ একটা বিষয়, যা আমাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করেছে এবং সে সম্বন্ধে আমি আপনাকে অভিনিবেশসহকার চিন্তা করতে বলি, তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম একতা। বিগত ছয় মাসের বেশীর ভাগ সময় আমি নিজেকে মুসলিমজাতির ইতিহাস ও মুসলিম আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে নিয়োজিত করেছি এবং আমার ধারণা এই ঐক্য সম্ভবও নয়, বাস্তবসম্মতও নয়। অসহযোগ আন্দোলনে মুসলিম নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতা স্বীকার করেও আমি মনে করি তাদের ধর্ম এরকম কোন কিছুকে কার্যকরীভাবেই বাধা প্রদান করে।

"আপনার মনে আছে, হাকিম আজমল খান ও ডাঃ কিসলুর সাথে আমার যা আলোচনা হয়েছিল , তা কলকাতায় আমি আপনার নিকট রিপোর্ট করি। হিন্দুস্থানে হাকিম আজমল খান অপেক্ষা চমৎকার লোক হতে পারে না। কিন্তু কোন মুসলিম নেতা কি কোরআনকে অতিক্রম করতে পারেন? আমি কেবলই আশা করি, আমি যা অনুধাবন করেছি তা মিথ্যা হোক।"

www.pathagar.com

লালাজীর বৈদগ্ধশালী মস্তিষ্ক যা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবেই সত্য। ষোড়শ শতাব্দীর মহাপরাক্রান্ত মোঘল বাদশাহ আকবরও কোরআন- সুন্নাহবিরোধী কার্যক্রমের কারণে প্রায় সিংহাসনচ্যুত হতে বসেছিলেন। আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ পর্দা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টার ফলে সিংহসনচ্যুত হয়েছিলেন এবং বর্তমানেও অনেকটা এইসব কারণেই এক নির্বাসিত ধর্মীয় নেতার (ইমাম খোমেনী) ধর্মীয় আবেদন সৃষ্ট বিক্ষেভের মুখে ইরানের শাহানামা জো পাহলভী মহা শক্তিধর আমেরিকার সহযোগ সত্ত্বেও দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সিংহাসনচ্যুতি ও ইরানের রাজতন্ত্রের মৃত্যু। (নির্বাসনেই তিনি ইন্তেকাল করেন)

লালাজী উক্ত পত্রে আরো লিখেছেনঃ "কিন্তু যদি আমি যা অনুধাবন করেছি তা সত্য হয় তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে যদিও আমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতে পারি, তবুও আমরা বৃটিশশাসন পদ্ধতি অনুযায়ী শাসন (অর্থাৎ নিছক সংখ্যাগুরু কর্তত্ব) প্রতিষ্ঠা করতে পারি না গণতান্ত্রিক পন্থায় হিন্দুস্থানে শাসন চালাতে পারি না।"

"কিন্তু প্রতিকার কি? আমি ভারতের সাত কোটি মুসলমানকে ভয় করি না। (কারণ, সংখ্যায় হিন্দুরা ৩/৪ গুণ বেশী) কিন্তু হিন্দুস্থানে সাত কোটির সাথে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, আরব, মেসেপিটিমিয়া ও তুরস্কের সশস্ত্র সমন্বয় অপ্রতিরোধ্য।"

মুসলমান সম্বন্ধে এটাই প্রকৃত হিন্দু মানসিকতা মুসলিম ঐক্য ভীতি। তিনি আরো লেখেন, "আমি সত্যই এবং আন্তরিকভাবেই হিন্দু-মুসলিম একতায় বিশ্বাস করি"(অবশ্য যতক্ষণ মুসলমানদেরে হিন্দু সংখ্যা গুরুত্ব দিয়ে দাবিয়ে রাখা যায়) আমি মুসলিম নেতাদেরকেও বিশ্বাস করতে সম্পূর্ণ রাজি। (অবশ্য যতক্ষণ তাদের বাধ্য বশংবদ করে রাখা যায়) কিন্তু কোরআন-হাদিসের অনুশাসানের ব্যাপারে কি হবে? এই মুসলিম নেতৃবৃন্দ তো আর বিরুদ্ধে যেতে পারেন না। আমরা কি তখন একেবারে নাস্তনুবাদ হয়ে যাব? আমি আশা করি, আপনার বৈদগ্ধশালী মানস এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন মস্তিষ্ক এই অসুবিধাজনক পরিস্থিতি হতে নিষ্ক্রমণের কোন একটা পথ বের করবে।

লালাজীকে ধন্যবাদ যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের অর্থ , এই দুই জাতির মধ্যাকর মূলগত বৈগম্য তিনি বেশ স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবেই অনুধাবন করতে ও স্বীকার করতে পেরেছেন।

www.pathagar.com

বাঙ্গালী বর্ণ-হিন্দুদের ইসলামী ঐক্য-ভীতি

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট সংঘটিত 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' (কলকাতার বিরাট হত্যাযজ্ঞ) এবং তার পরপরই সংঘটিত বাংলা ও বিহারসহ ভারতের অন্যান্য স্থানে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলশ্রুতিতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে ঘোরতর অবনতি ঘটে-যা পূর্বেও খুব বেশী বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং শত্রুতার বীজ অনেক আগেই উপ্ত ছিল। মিঃ গান্ধী প্রমুখ হিন্দু নেতৃবর্গ এই দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত বিদ্বিষ্ট পরিবেশের কারণেই এত সহজে 'যুক্তবঙ্গ' পরিকল্পনা বানচাল করতে পেরেছিলেন।

অপরপক্ষে, এই সময়ে-কতকটা এই দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত দুর্যোগের কারণে বাংলা এবং ভারতের সকল স্থানের মুসলমানদের মধ্যে প্রদেশ, ভাষা, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত বৈষম্য নির্বিশেষে নতুন করে আবার একটি প্রগাঢ় মৈত্রী-বন্ধন সৃষ্টি হয় যা ছিল ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণাসঞ্চারী শক্তি স্তম্ভ অর্থাৎ পাকিস্তানের জন্মের, তথা উপমহাদেশের মুসলমানদের একটি নিজস্ব আবাসভূমি সৃষ্টিরও প্রকৃত ভিত্তিভূমি। সেই সাথে এও একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, যুক্ত পাকিস্তানের ঐ ' পূর্ব পাকিস্তান'ই পরবর্তী ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ভিত্তিভূমি।

বস্তুতঃ পাকিস্তান নিজেও ছিল ১৭৫৭ সাল-পরবর্তীকালে এ দেশের মুসলামানদের স্বকীয়তা এবং স্বাধীনতা অর্জনের বিভিন্নমুখী সংগ্রাম প্রচেষ্টারই একটি বিশেষ স্তর, যার একটি ছিল ১৯০৫ সালে গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। ১৭৫৭ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংঘটিত এইসব ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, যা কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেন না। ১৯০৫ সালের 'বঙ্গসাম প্রদেশ', ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান, ১৯৭১ সালের পাকিস্তান বিভাগ ও বাংলাদেশের স্বতন্ত্ররাষ্ট্রনৈতিক সত্তার জন্ম, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ও ৭ নভেম্বর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের ভারতীয় রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি, এ সকলই ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটের একই সূত্রে গ্রথিত। এসব ঐতিহাসিক স্তরের একটিকে অস্বীকার করা মানে অন্য স্তরগুলোকেও অস্বীকার করা। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণ স্বার্থে ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘোরে না- ঘোরানো যায় না। তাই

www.pathagar.com

এ সত্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, ইতিহাস, হীনস্বার্থপ্রণোদিত মিথ্যা, অলীক প্রচার, প্রচারণা, প্রচেষ্টাকে সময়ের আস্তাকুঁড়েই নিক্ষেপ করে।

সর্বভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠিতর মধ্যে এই যে প্রদেশ, ভাষা ইত্যাদি নির্বেশেষে গভীর একতা ও মৈত্রীবন্ধন, - (তারই ফলে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ মাদ্রাজ, বিহার ও ইউপি'র মুসলমানরা একবাক্যে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেন-- যদিও তারা বেশ ভালভাবেই অবহিত ছিলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের নিজেদের মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই তাদের অনেককেই সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের অত্যাচার, নিপীড়ন সহ্য করেই থাকতে হবে ভারতে) যার পরিচয় বালাকোটের শহীদ সৈয়দ আহমদদের সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী সংগ্রামী আন্দোলনের অভাবিত কার্যকরিতা ও সাফল্য- তা তখনও যেমন ছিল পাকিস্তান সৃষ্টিতে বিশেষভাবে কার্যকরী ও সহায়ক- আজও তেমনি পাকিস্তানের উত্তরফল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভ্যেমত্বের পক্ষে সহায়ক- তার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। মুসলমানদের সার্বিক ঐক্যবন্ধন এমন একটি দুর্জয় শক্তি যা সুসংগঠিত, অস্ত্রসজ্জিত একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী এবং শত্রুপক্ষের জন্য ভীতিপ্রদ। দেশবিভাগকালে, ১৯৪৭ সালে সকল গোষ্ঠির মুসলমানের মধ্যে যে ইসলামী ঐক্যবন্ধন, মৈত্রী এবং উদ্দীপনা প্রকাশ পয়েছিল তাই, এই মুসলিম ঐক্য ভীতিই-পাঞ্জাবের হিন্দু মহাসভানেতা লালালাজপত রায়কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল এবং মিঃ গান্ধী, জওহরলাল, শ্যামা প্রসাদ প্রমুখ হিন্দু নেতৃবর্গকে যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার নামে এত আতঙ্কগ্রস্ত করে করেছিল।

আরও উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালে কলিকাতার দাঙ্গ-হাঙ্গামার সময়ে বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মিঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী) ১৪ শ' পেনসনভোগী প্রাক্তন সৈনিককে পাঞ্জাব হতে এনে কলিকাতা পুলিশে ভর্তি করেছিলেন। এদের কারণেই এই দাঙ্গায় সময়ে বহু মুসলমানের জীবন রক্ষা পায়। নইলে আও অধিক সংখ্যক মুসলমানের প্রাণহানি ঘটার আশংকা ছিল। পরবর্তীকালে দেশ বিভাগের পরে কলিকাতা পুলিশের এসব প্রাক্তন পাঞ্জাবী সৈনিক ইপিআর (বর্তমান বিডিআর-এর পূর্বসূরী)-এর সংগঠনে এবং স্থানীয় জোয়ানদের সামরিক ট্রেনিং দেয়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেন।

পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন সার্ভভৌম বাংলাদেশের জন্ম এক ঐতিহাসিক কার্যকারণের অনিবার্য ফলশ্রুতি এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এটা ঘটেছে। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ গড়লেও বাংলাদেশের মুসলমানরা কখনো ইসলাম

www.pathagar.com

এবং আন্তর্জাতিক মুসলিম ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব পরিত্যাগ করেননি। ১৯০৫ -এর 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'যুক্ত বঙ্গাসাম' প্রদেশ নস্যাৎকারী এবং ১৯৪৭-এর যুক্তবঙ্গের ঘোরতর বিরোধী 'বাঙ্গালী' হিন্দুরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টির সমর্থন করেছিল, বটে কিন্তু তার পিছনে বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি সমবেদনা ও ভ্রাতৃতবোধ মোটেই ছিল না। ইতিহাসও এর সমর্থন করে না। বরং ছিল মুসলিম জাতির পারস্পরিক বিরোধে আত্মতৃপ্তি এবং সুযেগের সদ্ব্যবহার। এ একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু হতেই হিন্দুরা সব সময়ই পাকিস্তান ভাঙ্গার পরিকল্পনা-প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল যদিও তার লক্ষ্য মুসলিম প্রাধান্যযুক্ত স্বাধীন-সার্বভৌম 'যুক্তবাংলা' প্রতিষ্ঠা নয় বরং তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে গ্রাস করে ভারতের সঙ্গে এক 'দেহে লীন' করে দেয়া। মুসলমানদের শক্তির উৎস যে তাদের একতা এবং মৈত্রীবন্ধন, তা সম্যক উপলব্ধি করে হিন্দুরা ছলে-বলে কৌশলে বিভিন্ন প্রকারের অছিলায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রচারণার মারফত মুসলমানদের মধ্যে বিরাজিত ভাষা ও প্রদেশের ভিন্নতাকে মূলধন করে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিক বিভিন্নতার অজুহাতে এই ঐক্যে ফাটল ধরাবার প্রচেষ্টা শুরু থেকেই চালিয়ে আসছে। যদিও শোষকের কোন ভাষা বা প্রদেশগত বিশেষ পরিচিতি নেই, তবু তারা এই ভাষাগত ও প্রদেশগত বৈষম্যকেই হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার করে আসছে। কারণ ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগে 'ভারতমাতার' দেহের উর্ধাংশের খনিকটা এবং বাম হস্তের কিছুটা খণ্ডিত হয়। এই খণ্ডিত অঙ্গ জোড়া লাগানোই হচ্ছে তাদের রাজনীতির লক্ষ্য। অবশ্য 'ভারতমাতার' বাম পদ খণ্ডিত হয় ১৯৪৮ সালে আলাদা শ্রীলংকা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে যদিও তামিল ভাষাভাষী শ্রীলংকার সংখ্যালঘুদের সহায়তার মাধ্যমে সেখানেও বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা নিয়মিতভাবেই ভারত চালিযে আসছে।

একই কারণে বাংলাদেশের জন্মের পর হতে বিশেষতঃ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট তারিখে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাহুগ্রাস মুক্তির পর হতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একই ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রচারণা অভিযান অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মারাত্মকভাবে নিয়তই পরিচালিত হচ্ছে তাদের এদেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে। এসবেরই মূল উদ্দেশ্য, মুসলমানদের মধ্যে যে কোন একটা অজুহাতে বিভেদ-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা, যাতে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এসবই পরিচালিত হচ্ছে হিন্দু সমাজের নিদারুণ মুসলিম ঐক্য ভীতি হতে।

বলাবাহুল্য, সব সময়েই অতি সুকৌশলী প্রচারণার দ্বারা বাংলাদেশী মুসলমানদেরে মুসলমানী সত্ত্বা- বিস্মৃত, মুসলিম জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন,

www.pathagar.com

পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন বহুধাবিভক্ত একটা সেক্যুলার জাতিতে পরিণত করার একটা বৈদগ্ধশালী য়ড়যন্ত্র চালোনো হচ্ছে। স্বধর্মের নিম্নবর্ণের লোকদের 'অচ্ছুত' বলে ঘৃণাকারী 'বাঙ্গালী' বর্ণহিন্দুরা কখনো কখনো কপট দরদে বিগলিত হয়ে এদেশের মুসলমানদের ভাই বলে সম্বোধন করতে এবং তাদের স্তুতি প্রশংসা করতেও পিছপা হয় না। এদেশের মুসলমানদের দরদে অনেক সময়ই তাদের দেখা যায় কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতে-যদিও এদেরই কলেবর স্ফীত করার জন্যই এদেশের মুসলমানদের একদিন হতে হয়েছিল দীনহীন জীর্ণ-শীর্ণ কাঠুরে ও ভিস্তিওয়ালা। (Hewers of wood and drawers of water)

হিন্দুরা তাদের চতুবর্ণ ভিত্তিক সামাজিক অভিশাপ-ভেদাভেদি, ছুৎমার্গ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের ধর্মের তথা ইসলামের মূল শিক্ষা মতে,-- ভাষা, দেশ, অঞ্চল, গোত্র, সাদা-কালো, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল মুসলমান একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত যদিও পরিচয়ের এবং বসবাসের সুবিধার্থে তারা দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সত্ত্বায় চিহ্নিত। তারা সকলে পারস্পরিক ঐক্য সংহতি সহ এই মহান আদর্শের পায়রবী করেই বাঁচতে চায়। কোন কুটিল প্ররোচনায় তারা বিভ্রান্ত হবে না।

আন্তর্জাতিক মুসলিম মিল্লাতের অংশীদার হিসাবে বাংলাদেশের মুসলমানরা নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করলে বর্ণহিন্দুদের যে কি দুঃসহ গাত্রদাহ সৃষ্টি হয়, তার প্রমাণ মেলে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোর ইসলামিক সম্মেলনে শেখ মুজিবের যোগদান উপলক্ষে কলিকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকার এক ভাষ্যেঃ 'জোব্বা পরা শেখদের মধ্যে শেখ মুজিবকে কেমন অদ্ভুত মানাবে।'

বাংলাদেশ সরকারের ইসলামী দেশসূমহের সাথে মৈত্রীবন্ধন সম্বন্ধে যুগান্তরের' অতিমূল্যবান মূল্যায়নঃ 'সাউদী আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রেম আর ইসলাম প্রীতি সাতহাত মাটির নীচে সেঁধিয়ে না ফেলা পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ভাল হতে পারে না।' অথচ, ভারতের সাথে সউদী আরবের কোন শত্রুতামূলক সম্পর্ক আছে বলে জানা নেই। বরঞ্চ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই বিদ্যমান।

বাংলাদেশের জন্মকালের নাড়ীকাটা বন্ধু কলিকাতার বহুখ্যাত 'যুগান্তর' পত্রিকার বাংলাদেশ প্রেম সম্বন্ধে সকলেই কমবেশী অবহিত আছেন। সেই 'যুগান্তরের' স্বনামধন্য কলামিষ্ট মিঃ সুকোমল কান্তি ঘোষ বাংলাদেশ প্রেমে গদগত হয়ে কূট এক প্রবন্ধে 'দুই বাংলা দুই বাঙ্গালী'তে বলছেন ঃ 'কলকাতার বাঙ্গালীরা কি ভাবতে পারেন যে, ঢাকা শহরে যত লোক সব বাংলা জানেন,

www.pathagar.com

যত কাজ সবই করছেন বাঙ্গালীরা (মন্তব্য ঃ একদিকে কলিকাতায় তথা পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালী এবং হিন্দী ভাষার প্রতাপের পরোক্ষ উল্লেখ অপর দিকে বাংলাদেশী অবাঙ্গালী মুসলিমদের এবং তাদের ব্যবহৃত উর্দুর বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন উষ্কানি।).... 'আমরা তো ভাবতেই পারি না, আমাদের অবাঙ্গালী বন্ধুদের বাদ দিয়ে আমরা এক ছটাক কেনা বেচা করতে পারি।'

(মন্তব্য ঃ মুসলিম অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উৎখাতে মুসলিম উম্মার অন্তরে বিভেদ সৃষ্টির চাপা খুশির প্রচ্ছন্ন প্রকাশ!)

.... 'বাংলাদেশের মুসলমান ভাইয়েরা তিরিশি বছর আগে আমাদেরই সঙ্গে ছিলেন তখন তাদের চিনতাম না।'

(মন্তব্য ঃ 'চিনতাম না' ঠিক নয়কুলী, মজুর, গাড়োয়ান-পানওয়ালা ইত্যাদি হিসেবেই তাদের বিবেচনা করতেন যাদের পূর্ব পুরুষগণ এক সময়ে সমাজের উচ্চস্তরেই অবস্থান করতেন। এই হিন্দুদেরই কূটকৌশলে ও বৈরী প্রচেষ্টার কারণে এই মুসলমানগণ তিরিশ বছর আগেকার কুলী মজুরের সেই দুঃসহ অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। এই দরদ দেখাবার পূর্বে যেসব মুসলমান এখনও কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করছেন, তাদের সঙ্গে এরা এখন কি রকম ব্যবহার করছে সেকথা এদের স্মরণ করিয়ে দিলে কি এদের কোন বিবেক দংশন অনুভূত হবে?)

'যদিও কলকাতায় অনেক বিখ্যাত মুসলমান পল্লী ছিল বা আছে' 'আমরা তখন দেখতাম যেক'টি মুসলমানদের, তার অধিকাংশই ছিলেন অবাঙ্গালী।'

(মন্তব্য ঃ কারণ বাঙ্গালী মুসলমানদের এরা মানুষ বলেই গণ্য করত না। তাই তারা এদের চোখে পড়ত না। পক্ষান্তরে অবাঙ্গালীরা ছিল সুসংগঠিত, উন্নত এবং অবস্থাশালী, কারণ তারা এদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়নি।)....' দেশকে ওরা বোধহয় ভালবাসে, আমাদের চেয়ে অনেক অনেকগুণ। ওদের সঙ্গে কথা কইলেই বেশ বোঝা যায়।'

(মন্তব্য ঃ আসলে ব্যজস্তুতি! উষ্কানিসূচক একটা সূক্ষ্ম প্রচারণা মাত্র।)

মঙ্গলবার ২৮ চৈত্র ১৩৮৪ দৈনিক আজাদের সৌজন্যে)

বাংলাদেশ সউদী আরবের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুললে তা কেবল এ কারণেই একটি বড় অপরাধ যে, সউদী আরব একটি ইসলামী দেশ এবং বাংলাদেশও একটি ইসলামী দেশ। ইসলামী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের মৈত্রীবন্ধনে অতিমাত্রায় উত্তেজিত বেসামাল হওয়ার কারণে এখানে

www.pathagar.com

দাদাবাবুদের ভণ্ডামীর খোলসটুকু পর্যন্ত খসে পড়ে গেছে। তবে দাদাবাবুদের শত প্রকার কূট প্রচারণায় যেকোন চক্ষুষ্মান বাংলাদেশী মুসলমান বিভ্রান্ত হবে সে আশা 'সাতহাত মাটির নীচে সেঁধিয়ে ফেলা ছাড়া' এসবা বিষকুম্ভ পয়মুখের এখন আর গত্যন্তর নেই।

ভৌগোলিক সীমারেখা, রাষ্ট্রীয় সত্তা ও ভাষা, বর্ণ, আঞ্চলিকতা নিরপেক্ষ উন্নত চেতনাভিত্তিক বিশ্বব্যাপী একটা মহৎ জাতীয়তাবাদের আদর্শ চৌদ্দশ' বছর আগেই ইসলাম নির্ধারিত করে দিয়েছে। ইসলাম বলেছে যে, সকল মুসলমান একই মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত। পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রতিম। সমস্ত দুনিয়া জুড়ে একই মুসলিম মিল্লাত একই ইসলামের ধর্মীয় বিধানাবদ্ধ। মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস, তথা ঈমান-আকীদা এবং ঐতিহ্যগত রেওয়াজ অনুযায়ী দেখা যায় সকল দেশের মুসলমানদের মধ্যে দেশ-কাল-ভাষা, সম্প্রদায়গত সব কিছু বিভিন্নতা এবং বৈষম্য সত্ত্বেও একটা সার্বজনীন-ভ্রাতৃত্ববোধ, একটা রাষ্ট্র নিরপেক্ষ জাতীয় চেতনা অর্থাৎ ইসলামিক জাতীয়তার ধারণা-ইসলামের শুরু হতেই বিদ্যমান। যেকোন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য এই বিশ্ব মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শ বা আন্তর্জাতিক ইসলামিক জাতীয়তাবাদ তার নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সত্তা, তার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের সহায়ক- পরিপন্থী নয়। পরন্তু এ তার নিজস্ব স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদ, স্বতন্ত্র ভৌগলিক এবং স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সত্তার পরিপূরক। তার নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ইসলামিক রাষ্ট্রনীতির এই যে মহান শিক্ষা, মুসলিম জাতীয়তাবাদের এই যে মহৎ আদর্শ, এই যে উন্নত ধ্যান-ধারণা, এ আজ আমরা বিস্মৃত হতে বসেছি, হেলায় হারাতে চলেছি। অথচ অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতাদুষ্ট হিন্দু এবং ইহুদী সম্প্রদায় আজ অনেকটা বৃহত্তর জাতীয়তাবাদের আদর্শ অবলম্বন করে বর্তমান ইজম সংঘাতময় পরিস্থিতি এবং সংকটপূর্ণ জটিল ও কুটিল রাজনীতির যুগেও একটা সম্মানজনক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, আজ যত বিভেদ, বাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব-কলহ, হিংসা-অশান্তি, লড়াই ও ফ্যাসাদ- সকল অবাঞ্ছিত ব্যাপারই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বিরাজমান। নিদারুণ কাল ব্যাধির অভিশাপের মত এসব তাদের জীবনীশক্তি ক্ষয় করে চলেছে।

আরব-অনারবের ইজ্জতের প্রশ্ন, তুরস্কের-ইরাকের-ইরাণের অঞ্চল বিশেষে কুর্দী-মুসলিমদের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ইরাক-ইরানের সীমান্ত বিরোধ, উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনের ক্ষমতা দখলের লড়াই, স্পেনের ফেলে যাওয়া মরু

www.pathagar.com

অঞ্চলের দখল নিয়ে মরেক্কো পোলিসারিও এবং আলজেরিয়ার মধ্যে নিয়ত আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ, ফিলিস্তিনী মুসলিমদের সমস্যা নিয়ে আরব জাহানে মতভেদ পাকিস্তানে হট্টগোল ও হাঙ্গামা, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সুন্নী বিরোধ, আফগানিস্তানে মোজাহিদ গেরিলাদের নিজেদের মধ্যে রক্তাক্ত সংগ্রাম, বাংলাদেশে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্ব-এ সকলই ইসলামের বিধান, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও মৈত্রীবন্ধনের পরিপন্থী-- অথচ আমরা সকলেই নিজেদেরে মুমিন মুসলমান বলেই ঢোল পিটিয়ে থাকি।

ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী এসব গলদ-ত্রুটি, দোষ-গ্লানি, ইসলামী মৈত্রীবিনাশী বিভেদের বিষাক্ত বীজ ইসলামী সমাজের দেহে কালব্যাধির মত প্রবেশ করছে। কুল মুসলিম জাহানকে শতধাছিন্ন করছে মারাত্মক অভিশাপের মত। এর অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করছে। তবুও আমরা যে ক'য়টি দেশ স্বাধীনতার সুযোগ পেয়েছি, আমরা সে সুযোগের অপব্যবহার করে আত্মকলহের আত্মপ্রসাদে মগ্ন। এও সবিশেষ পরিতাপ এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এদেশের কতিপয় পণ্ডিতম্মন্য জ্ঞানপাপী (যদিও তাদের সংখ্যা সৌভাগ্যক্রমে খুবই নগণ্য) দুনিয়াজোড়া এই ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব-মৈত্রী বন্ধনের বিরুদ্ধে কি এক দুর্বোধ্য প্রেরণা ও তাড়ানায় অত্যন্ত হীন প্রচারণায় মেতেছেন, যাতে এ একতা বন্ধনে কিছুটা ফাটল ধরানো যায়। এ গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত জনৈক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক লিখছেন ঃ 'তারা কথায় কথায় স্বাজাত্য গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। দুনিয়ার যে কোন যুগের, যে কোন মুসলিমের বা মুসলিম দেশ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে মমত্বের-আপনত্বের বন্ধন অনুভব করেন। বাহ্যত এটি সদগুণ ও ইসলামের দান বলে মনে হয় বটে; কিন্তু খুঁটিয়ে-খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় হীনমন্যের কাঙ্গাল চিত্রে এর উদ্ভব ও স্থিতি। তাই তারা দেশান্তরে, কালান্তরে, স্বজাতি ও স্বজাতির গৌরব খুঁজে বেড়ায়। আজকের দিনে খৃস্টানরা বা বৌদ্ধরা তাদের স্বাজাতির রাষ্ট্র সংখ্যায় গৌরব প্রকাশ করে না আপদ-বিপদে স্বধর্মীর কাছে করুণ আবেদন জানায় না। কেবল মুসলমানদের মধ্যেই এ প্রবণতা প্রবল। তাই স্বদেশী মুসলিমদের স্বদেশী নয়-বিদেশী স্বধর্মীয়দের গৌরব-স্তন্য বর্জিত তৃতীয় ছাগশিশুর উদার আনন্দ স্মরণ করিয়ে দেয়।' (ডাঃ আহমদ শরীফ, বঙ্গবার্তা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩)

বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদমর্যাদায় আসীন কোন ব্যক্তি ইসলামিক মৈত্রীর পক্ষে হানিকর এহেন প্রলাপ ভাষণে মত্ত হতে পারেন না যদি না কোন বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণার অন্ধত্ব তাকে পেয়ে বসে। বাহ্যতঃ

www.pathagar.com

মিঃ শরীফের উক্তি জ্ঞানগর্ভ মনে হলেও 'খুটিয়ে-খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়' বিশেষ উদ্দেশ্যে, বিশেষভাবে ধোলাইকৃত মস্তিষ্কে এর 'উদ্ভব এবং স্থিতি'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়েরই এক সময়ে উচ্চতর আসন অধিকারী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং অনেকটা সম মর্য্যদার অধিকারী অপর দু'জন ঐতিহাসিক ডঃ এইচ সি ভট্টাচার্য ও মিঃ কে কে দত্ত ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচায়ণা প্রভৃতি দেশে কোন এক স্মরণাতীতকালে সুপ্রাচীন যুগে, হিন্দু রাজত্বের সন্ধান অনুমান করে সেই গর্বে যে কোন ভারতীয়ের গৌরব অনুভব করার কথা যে বলেছেন, এতে কি 'স্তন্য বর্জিত তৃতীয় ছাগ শিশুর উদার আনন্দ স্মরণ করিয়ে দেয়' না 'হীনমন্যের কাঙ্গালচিত্রে এর উদ্ভব ও স্থিতি?' 'ভারতের (হিন্দু) ঔপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তার (মালয়, সুমাত্রা, জাভা, থাইলাণ্ড, ইন্দোচায়না প্রভৃতি দেশে) ভারতীয় ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল কিন্তু বিস্মৃত অধ্যায় যে ব্যাপারে যেকোন ভারতীয় (হিন্দু) গর্ব অনুভব করতে পারে।' (এডভান্সড হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া- আর সি মজুমদার, এইচ সি ভট্টাচার্য ও কে কে দত্ত -পৃ: ২২৩)

তাই যদি হয়, তাহলে জ্ঞানবৃদ্ধ শরীফ সাহেব উপরোক্ত অধ্যাপকত্রয়ীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য তার এই অভিনব উপলব্ধি তাদের জানিয়ে দিতে পারেন।

এক দেশের মুসলমান যে অপর দেশের মুসলামানের জন্য গভীর আন্তরিকতাবোধ করে এটাই ইসলামের বিশেষত্ব। দুনিয়া জুড়ে সব মুসলমান একই জাতির অন্তর্ভুক্ত, যদিও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এবং পরিচয় ও জীবন ধারণের সুবিধার্থে তারা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে রয়েছেন। একজন মুসলমানের কাছে তার প্রধান পরিচয় যে সে মুসলমান, ইহকালে তো বটেই পরকালেও। তারপরে আসছে তার ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞা বা পরিচয়। এক দেশের মুসলমান অপর মুসলিম দেশের কাছে কি কেবল সাহায্যই চায়? প্রাজ্ঞ অধ্যাপকের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, প্রয়োজনে, আপদে বিপদে সে অন্য দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলমানদেরও সাহায্য দিয়ে থাকে। সাউদী আরব, কুয়েত কাতার, আবুধাবী, ইরাক ইরান, লিবিয়া যে কি পরিমাণ সাহায্য বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে দিয়ে থাকে, তা অধ্যাপক সাহেবের অজানা থাকার কথা নয়। এর ফলে যে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীবনধন জোরদার হয়ে সে কথার গুরত্ব কি তিনি উড়িয়ে দিতে চান? তিনি শুধু হীনমন্যতাই দেখতে পান, কিন্তু এর যে একটা খুবই সৃষ্টিধর্মী ইতিবাচক দিক আছে-- মৈত্রী সৃষ্টি ও পরিপোষণ সে দিকটা কি তার চোখে পড়ে ন? একচোখা হরিণের মত চললে অবশ্য এ

www.pathagar.com

রকমই উপলব্ধি হতে পারে। এক মুসলমান যে অন্য মুসলমানকে সাহায্য দেয়, তা অন্য ধর্মাবলম্বীদের দানের মত দান এবং দাতা ভিক্ষুকের সম্বন্ধ মোটেই নয় যেখানে হীনমন্যতাও কাঙ্গালপনা প্রকট হতে পারে।

এ সাহায্য করে সে আল্লাহর ওয়াস্তে তার স্বজাতি ভাইকে সাহায্য করার তার যে কওমী দায়িত্ব রয়েছে তা সাধ্যানুযায়ী পালন করতে, আল্লাহ,রসূলের মহব্বতে, দয়া বা সৌজন্য দেখাবার জন্য নয়। আর গ্রহীতাও তা গ্রহণ করে স্বপ্রেম অন্তরে-দীনহীন ভিখারীর হীনমন্যতা কাঙ্গালপনা নিয়ে নয় যা মানুষকে ছোট করে। বাংলাদেশ যদিও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পেয়ে থাকে, তবুও প্রতিবেশী বার্মা হতে বিতাড়িত দুর্দশাগ্রস্ত আরাকানী মুসলিম ভাইদের দুর্দিনে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পিছপা হয়নি-পাকিস্তানের বন্যার্তদের জন্যও সে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য প্রদান করেছে। এর ফলে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে রেষারেষির বদলে যে একটা প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে, তা এসব কূট নিন্দুকের মধ্যে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করলেও তাতে করে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি হয় তা সকল সুস্থ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই স্বীকার করবেন।

এই দেশের বাজেট ফিনাংসিং-এ মুসলিম দেশগুলোর দান-অনুদানের পরিমাণ যে কতখানি তা পণ্ডিত অধ্যাপকের অবশ্যই জানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চেয়ারটা তিনি অলংকৃত করেছেন, তার খরচ পরোক্ষভাবে হলেও যে এসব সাহায্যনির্ভর, তা অধ্যাপক সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন সম্ভবতঃ নেই। এত বড় যে ভারত সেও কি নিযমিত ভিন দেশের সাহায্য নিচ্ছে না?

একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আন্তর্জাতিক ইসলামী জাতীয়তাবাদের চেতনা বাংলাদেশী চেতনাকে আরো শক্তিশালী করতে পারে-- নতুন জীবনশক্তি দান করতে পারে। ইতিহাসে নজিরের অভাব নেই, এই ইসলামী আন্তর্জাতিক চেতনা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বহুক্ষেত্রে বহু মুসলমান রাজ্যের সংকটময় মুহূর্তে বলিষ্ঠ সাহায্যের কারণ হয়েছে। এই ইসলামিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কল্যাণে স্পেনের মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির পতন অন্ততঃপক্ষে এক শতাব্দীকাল বিলম্বিত হয়। তিন শতাব্দী ধরে খৃষ্টান ইউরোপের সম্মিলিত শক্তির আক্রমণে সৃষ্ট ইতিহাসখ্যাত ক্রুজেডের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মুসলিম শক্তি শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ করে। বেশী দূরের কথা কি, এই 'বঙ্গদেশেও' রাজা গণেশের অভ্যুত্থানে বাংলার মুসলিম সমাজ জীবনে যে বিপত্তি দেখা দিয়েছিল জৌনপুরের মুসলিম সুলতানগণের হস্তক্ষেপে তার নিরসন হয় এবং সিলেটের মুসলিমগণ সেখানকার রাজা গৌড় গোবিন্দের অত্যাচার-নিপীড়ন হতে গৌড়ের

www.pathagar.com

সুলতান এবং আউলিয়া শ্রেষ্ঠ হজরত শাহ জালালের অছিলায় রক্ষা পান। মাত্র দু'শতাব্দী পূর্বে ১৭৬১ খৃঃ আফগান বীর আহমদ শাহ আবদালীর সামরিক অভিযানের ফলে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে উগ্র হিন্দু মারাঠা শক্তির আগ্রাসন হতে যে এই উপমহাদেশের মুসলমানগণ (তথা সমগ্র জন সাধারণ) রক্ষা পেয়েছিল তাও এই আন্তর্জাতিক ইসলামী মৈত্রী চেতনার কার্যকারিতা ও সাফল্যই ঘোষণা করছে। আর তাই ইসলামের শত্রুদের এটা একটা চমৎকার কৌশল-ভাষা, বর্ণ, ভৌগৌলিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্নতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য বা অন্য যেকোন উপলক্ষে এই বিরাট আন্তর্জাতিক ইসলামী চেতনাবোধে বিভেদের বীজ প্রবেশ করিয়ে ক্যান্সারের মত দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করা, বিরাট ইসলামী সমাজকে বিভ্রান্ত বিপথগামী করে দুর্বল করা। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ মুসলিম ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী সূক্ষ্ম প্রচার প্রচারণার মহৎ এক শিকার পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মিঃ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ভাষা আন্দোলনের দায় চাপিয়ে যার কুশপুত্তলিকা দাহ করার দুর্লভ গৌরব আমরা অর্জন করেছি এবং এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রতিনয়তই চালানো হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশী সংস্কৃতির মোকাবেলায় হিন্দু সম্প্রদায় জাত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির (তথা রবীন্দ্র সংস্কৃতির তথা হিন্দু সংস্কৃতির) ধুয়া তুলে অতিধূর্ত প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে। উদ্দেশ্য মহৎ, যাতে এক ঢিলে দুই পাখী শিকার করা যায়। একদিকে এই বিভেদের অস্ত্রে মুসলমানদের একতা ও মৈত্রী বিনষ্ট করে তাদের দুর্বল করা, অপরদিকে এই বিজাতীয় জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতি আমদানী করে বাংলাদেশের নিজস্ব জাতীয়তার চেতনা ও সংস্কৃতি নষ্ট করে তাকে এই বিজাতীয় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও বাঙ্গালী তথা হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা গ্রাস করা এবং এভাবে তার স্বতন্ত্র জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সত্তা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের মূল ভিত্তি ধ্বংস করা।

[সংসক্তি ক। ইতিহাসের রূপান্তর ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একদিক]

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনে মিঃ জিন্নাহ

(এক)

কিছুকাল পূর্বে দৈনিক সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের যে সাক্ষাৎকার পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল তা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মিঃ জিন্নাহর কার্জন হলের ভাষণ সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ যেসব কথা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এদের বক্তব্যঃ মিঃ জিন্নাহ কার্জন হলের ভাষণে বলেছিলেন--

'উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'

(মিঃ তোয়াহঃ সংগ্রাম ৯-২-'৮৩)

'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা-

(মিঃ গোলাম আজমঃ সংগ্রাম ১২-২-'৮৩)

লক্ষ্যণীয়, কার্জন হলে লিখিত ভাষণ পাঠ করার সময় লিখিত ভাষণ বাদ দিয়ে এক্সটেম্পোরভাবে মিঃ জিন্নাহ যে কয়েকটি শব্দ ভাষা প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন তা সঠিকভাবে কেউই উদ্বৃত করেননি এবং এদের সকলের বিবৃতি হতে এটাও বোঝা যায় যে এরা অনেকেই মিঃ জিন্নাহর উর্দুর সপক্ষে কথা বলায় প্রতিবাদমনা হয়েছিলেন কিন্তু কেউই প্রতিবাদ জানাননি। দ্বিতীয়তঃ রেসকোর্স ময়দানেও ছাত্রদের সঙ্গে মিঃ জিন্নাহর কোন বিরূপ আলোচনা বা কথা কাটাকাটি হয়নি। বরঞ্চ একটা আপোষমূলক ভাবই বজায় ছিল। তবে এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মাহমুদ হাসান। তিনি '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঘটনাবলীর পরিণতিতে যে সব বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা মিঃ জিন্নাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছিল সে সবের মোকাবিলায়, মর্নিং নিউজ পত্রিকায় একটি বিবৃতি প্রদান করেন। অবশ্য তিনি তখন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মেম্বার। তার ভাষ্যঃ আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর। আমিই মিঃ জিন্নাহকে কনভোকেশনে অ্যাড্রেস দেবার জন্য দাওয়াত করেছিলাম। মিঃ জিন্নাহর কার্জন হলের ভাষণের সময় আমি তার পাশেই ছিলাম। সে কারণে মিঃ জিন্নাহ কি বলেছিলেন তা সঠিকভাবে জানবার সুযোগ আমার ছিল। উর্দু ভাষা প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন-- তা এইঃ 'উর্দু এণ্ড উর্দু এলোন স্যাল বি দ্য লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা অব পাকিস্তান' (Urdu and Urdu alone shall be the lingua franca of Pakistan)। 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের

www.pathagar.com

জনগণের পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের বাহন হতে বাধ্য।' মিঃ জিন্নাহ কখনই 'স্টেট ল্যাংগুয়েজ' কথা ব্যবহার করেননি।

মিঃ হাসানের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ কেউ করেছেন বলে আমরা জানা নেই। এই বক্তব্য যদি যথার্থ না হতো, তাহলে অবশ্যই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হতো।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাংবাদিক অনথনী ম্যাসকারেন হাস (antony Mascarenhas)- এর Bangladesh a legacy of Blood নামক বই-এর তেরো পৃষ্ঠায় এই কথারই প্রতিধ্বনি রয়েছে। তিনি বলছেন, Mr. Jinnah Stunned his audience when be bluntly told them- " Urdu is going to be the lingua franca of the country."

(মিঃ জিন্নাহ তার শ্রোতমণ্ডলীকে হতবুদ্ধি করে ফেললেন, যখন তিনি তাদের সোজাসুজি বললেন, 'উর্দু এই দেশের জনগণের পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের বাহন হতে যাচ্ছে।'

এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মিঃ হাসানের বক্তব্য সঠিক থাকার কারণে কেউ প্রতিবাদের সুযোগ করতে পারেন নি। তাহলে প্রশ্ন, মিঃ জিন্নাহর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ কেন যে তিনিই প্রথম কনভোকেশন অভিভাষণে বলেছিলেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা।'

মনে হয় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী মিঃ জিন্নাহর কথা সঠিকভাবে শুনে থাকুন আর না থাকুন তারা ধরে নিয়েছিলেন যে, মিঃ জিন্নাহর কথাটা উর্দুর সপক্ষে, বাংলার পক্ষে নয়। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী নেতৃবর্গের কথা হতেও তাই বোঝা যায়। পরবর্তীকালে ১৯৪৯ সালে নাজিমুদ্দিন প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উর্দুকে রাষ্টভাষা করার সপক্ষে প্রচেষ্টার সঙ্গে মিঃ জিন্নাহর বক্তব্য এক পর্যায়ে মিলিয়ে আনা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন 'লিংগুয়া ফ্রাংকা' মানে কি? এটা অবশ্যই স্টেট ল্যাংগুয়েজ নয়। যদিও মন হচ্ছে, নেতৃবৃন্দ দু'টি কথাকে সমার্থ জ্ঞাপক বলেই ধরে নিয়েছিলেন। অক্সফোর্ডের ডিগ্রীধারী ডাঃ হাসান ছিলেন একজন নামকরা ইংরেজীর প্রফেসর। তার ইংরেজী ভাষা জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করার কোন কারণ নেই। আর মিঃ জিন্নাহর যে ইংরেজী ভাষার উপর দখল ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। 'স্টেট ল্যাংগুয়েজ' বোঝাতে তিনি কখনই 'লিংগুয়া ফ্রাংকা' কথা ব্যবহার করতেন না যদি বা শ্রোতৃমণ্ডলীর কেহ তার বক্তব্য অযৌক্তিভাবেই গ্রহণ করে থাকতে পারেন।

www.pathagar.com

আসলে 'লিংগুয়া ফ্রাংকা' মানে সাধারণ লোকের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের জন্য সাধারণের বোধগম্য একটি ভাষা, স্টেট ল্যাংগুয়েজ নয়।

(দুই)

মিঃ জিন্নাহর কার্জন হলের এই ঐতিহাসিক ভাষণ সম্বান্ধ আরও একটি নিরপেক্ষ বিবরণ লাভের সুযোগ আমার হয়েছিল। তখন আমার সতীর্থ মিঃ ভবতোষ বাড়রী ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্সের লেকচারার। তিনিও কার্জন হলের এই কনভোকেশনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ভাষ্যঃ "তখন বাংলা-উর্দু নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্ছিল। পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক, উত্তেজনাকর। মিঃ জিন্নাহর কনভোকেশন মিটিং-এ আমরা সবাই রীতিমত তৈরী হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমরা বাংলা ভাষার সপক্ষে জোর বক্তব্য রাখবো এবং বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে মি জিন্নাহ কিছু বললে আমরা সবাই তার প্রতিবাদ জানানোর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম।"

মিঃ জিন্নাহ এলেন, তাঁর ভাষণ দিলেন। সঠিক কি কথাটা বলেছিলেন, তা ধরতে না পারলেও এ কথাটা বুঝেছিলেম যে, তিনি একমাত্র উর্দুর পক্ষেই কথা বললেন-- "একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের ভাষা।" আমাদের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে তোলপাড় হচ্ছিল, তা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার লক্ষ্যে। কাজেই যদিও আমরা মিঃ জিন্নাহর উর্দুর সপক্ষে যে কোন কথার প্রতিবাদ জানানোর জন্য তৈরী হয়েই এসেছিলোম তবুও মিঃ জিন্নাহর যুক্তির কারণেই হোক, বা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই হোক, আমরা কেউই তার প্রতিবাদ করিনি-- করতে পারিনি।"

অবশ্য রেসকোর্স ময়দানে ছাত্ররা মিঃ জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করেন ও বাংলা ভাষাকে, রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে প্রস্তাব রাখেন। এই আলোচনা সমঝোতামূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। কোন পক্ষে হতেই বৈরিতামূলক বা কোন প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টিকর কোন কিছু হয়নি। অবশ্য মিঃ জিন্নাহ তখন কোন ফাইনাল জবাব দেননি। তিনি তাঁর বিবেচনার জন্য প্রস্তাবটা রাখেন।

এর ছ'মাসের মধ্যেই ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সংশিষ্ট গুরুত্বপূন্ সাক্ষাৎকারে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে উপরোক্ত দু'টি ভাষ্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

কাজেই দেখা যাচ্ছে মিঃ জিন্নাহর বক্তব্য সম্বন্ধে একটা ভ্রমাত্মক অ-যথার্থ ধারণা পরিকল্পিতভাবেই হোক, আর অনিচ্ছাকৃতাবেই হোক (এবং মিঃ জিন্নাহর বক্তব্যের অপভাষ্য রচনার ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জ্ঞানী-গুণী ও বৈদগ্ধশালী ব্যক্তিবর্গের প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের ঐতিহ্য রয়েছে) প্রচলিত হয়ে গেছে। বিলম্বে হলেও সত্যের খাতিরে এবং আমাদের নিজেদের কল্যাণেই এই অসত্যের অপনোদন প্রয়োজন। বিকৃত ধারণার সংশোষন আবশ্যক। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে মিঃ জিন্নাহর উপরোক্ত ভাষণ এবং সাক্ষাৎকারের পরে ভাষা আন্দোলন যে ঝিমিয়ে পড়ে এবং মিঃ নাজিমুদ্দিন কর্তৃক (তাঁর ১৯৪৯ সালের ভাষণে) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব না দেয়া পর্যন্ত যে ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি, তা এই সহজবোধ্য কারণেই। এখানে উল্লেখ্য যে, মিঃ গোলাম আজমের বক্তব্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে (যা হয়তো কারো জানা থাকলেও), যা ভাষা আন্দোলনে গুরুত্ব লাভ করেনি এবং সম্ভবতঃ উদ্দেশ্যমুলকভাবেই তা উহ্য রাখা হয়েছে। কথাটা হচ্ছেঃ 'উর্দু যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মাতৃভাষা নয়, এটা বাংলাভাষীরা অনেকেই জানতেন না।' 'অবাঙ্গালী পাকিস্তানীরা (এখানে) যেহেতু উর্দুতেই কথা বলতেন, তাই এটাকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভাষা মনে করা হতো' (মিঃ গোলাম আজমের সাক্ষাৎকার সংগ্রাম ১২-২-৮৩) বাংলা যেমন পূর্ব পাকিস্তানীদের মাতৃভাষা। এরকম একটা ধারণা প্রচলিত হওয়ার কারণেই বাংলার মোকাবিলায় উর্দুকে খাড়া করে অত্যন্ত সহজভাবে উর্দু বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই। ফলে, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবেই এটা সত্য যে এইসত্য উপলব্ধি হয়নি যে, যখন মিঃ জিন্নাহ উর্দুকে Lingua Franca করার কথা বললেন, তখন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানীদের কোন মাতৃভাষা- পাঞ্জাবী, পশতু, সিন্ধী বা বেলুচ-এর সপক্ষে কথা বলেননি। বলেছিলেন, উর্দুর সপক্ষে, যা পূর্ব পাকিস্তানী বা পশ্চিম পাকিস্তানী কারুরই মাতৃভাষা না হলেও সবারই নিকট অল্প বিস্তর বোধগম্য ছিল। সত্য কথা বলতে কি পাকিস্তানী আমলে চিটাগাং রেল স্টেশনে বা বাসে চাটগাঁর লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তায় ভাবের আদান-প্রদানে চিটাগোনিয়ান বাংলা ভাষার বদলে উর্দুই আমাদের পক্ষে অধিকতর বোধগম্য ছিল। লাহোরে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে বাক্যলাপেরকালে উর্দুতে কথা বলায় ভদ্রলোক বিরক্তি বোধ করে আপত্তি জানান কেন আমি উর্দু বলছি, কেন আমি পাঞ্জাবীতে কথা বলতে পারি না? উর্দু তার জন্য একটু অসুবিধাজনক ছিল। এই উপমহাদেশে, অন্ততপক্ষে দক্ষিণ ভারত বাদ দিলে, উর্দুই (যার বর্তমান হিন্দুয়ানী সংস্করণ হিন্দী) একমাত্র ভাষা, যার মাধ্যমে আসাম হতে পেশোয়ার পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে

www.pathagar.com

ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব। কাজেই মিঃ জিন্নাহ কোন নতুন কথা বলেননি। একটা প্রতিষ্ঠিত সত্যকেই পেশ করেছিলেন-অত্যন্ত জোরালোভাবে জিন্নাহর বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ভাষায়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে শেখ মুজিবের আমলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের 'বন্ধুদেশ' ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবী ইন্দিরা গান্ধী বাংলা গভরমেন্ট কর্তৃক তাঁরই উপলক্ষে তাঁরই নামে গঠিত 'ইন্দিরা মঞ্চে' ভাষণদানকালে কোনমতে দু'একটি কথা 'বাংলায় বলে তাঁর পর উর্দুতেই (তথাকথিত হিন্দী) তাঁর বক্তব্য পেশ করেন (এবং আমরা তা অম্লান বদনে নির্বিবাদে হজম করেছিলেম যদিও তখনকার বিশেষ রাজনৈতিক পঠভূমিতে অবাঙ্গালীদের সাথে সাথে উর্দুকেও শত্রু হিসেবেই গণ্য করা হতো। ফলে কার্যতঃ মিঃ জিন্নাহর বক্তব্যের সত্যতাই কি প্রামাণিত হয় না?) এই সমস্ত সাক্ষাৎকার হতে একথা বোঝা যায় না যে, মিঃ জিন্নাহ পাঞ্জাবী ঘেঁষা বা পূর্ব পাকিস্তানী বিদ্বেষী ছিলেন বা বাংলাভাষার প্রতি শত্রুতার ভাব-পোষণ করতেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভাষা আন্দোলনের 'সংগ্রাম পরিষদের' সদস্য ও ছাত্র সংসদের নেতা হিসাবে মিঃ নুরুল হুদা (ডিআইটির ইঞ্জিনিয়ার) মিঃ জিন্নাহর সঙ্গে দু'বার বৈঠক করেন। তিনি বলছেন 'প্রথম বৈঠকে ছাত্রদের সথে মিঃ জিন্নাহর মৃদু কথা কাটাকাটি হয়। এরপর আমাদের আলোচনা বেশ ভালোভাবে এগোয়।' ছাত্রনেতা মিঃ শামসুল হকের ভাষা আন্দোলনের অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মিঃ জিন্নাহ বলেন, 'অবশ্যই আছে' অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের অধিকার অবশ্যই আছে। 'কিন্তু শত্রুদের সম্পর্কে সতর্ক থেকে'। তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের বড় সমস্য হচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা। পাঞ্জাবী পুঁজিপতিদের সাথে তোমরা প্রতিযোগিতায় পারছো না। চাকরির ক্ষেত্রে তোমরা ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছ না।' পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে তিনি চাকরির ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের ৪০ভাগ কোটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। (মিঃ নূরুল হুদা সংগ্রাম ১৩-২-৮৩)। অবশ্য আমরা 'জিন্নাহর পাকিস্তান আজিমপুরের গোরস্থান' শ্লোগান দিতে ও মিঃ জিন্নাহর কুশপত্তিলিকা দাহ করতে কোনই কার্পণ্য করিনি যদিও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে মিঃ জিন্নাহর হুঁশিয়ারির সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তান বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে এবং শত্রুদের হাজার বছরের আশা সফল করে পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যায়। শত্রুরাই হয়েছে লাভবান। আর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বন্ধুদেশের সর্বাত্মক আগ্রাসন হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামের মধ্যে 'ওয়ালা ইয়াইয়া' (না মরা না বাঁচা) অবস্থায় কোন রকমে টিকে আছে।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে উর্দুকে Lingua framca করার কথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন- মিঃ ফজলুল হক, শেরে বাংলা- মিঃ জিন্নাহ নয়। " ১৯৩৮ সালে অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত All India Muslim Education Conference- এ সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে ফজলুল হক সাহেব বলেন, হিন্দী নয় উর্দুকেই গ্রহণ করতে হবে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে। (Lingua fraca)...

৫২'র ভাষা আন্দোলন উর্দু বিরোধী বা পাকিস্তান বিরোধী কোনো আন্দোলন ছিল না। তখনকার আওয়াজ "উর্দু বাংলা ভাই ভাই, উর্দুর পাশে বাংলা চাই"। ইবনে গোলাম সামাদ-সংগ্রাম ২৬শে ফালগুণ, ১৩৯৫।

দেশের দুর্ভাগ্য ঃ লিয়াকত- নেহেরু চুক্তিসিদ্ধ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ফসল সমৃদ্ধ বেরুবাড়ী বাংলাদেশের জন্মের পরেই শেখ মুজিবের বাধ্যতামূলক বদান্যতায় হারাতে হয়েছে একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বন্ধুদেশের সশস্ত্র সহায়তার মাশুল হিসেবে। সেই রাষ্ট্রনেতার বাধ্যতামূলক কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে ফারাক্কা বাঁধ কমিশন করতে দেয়া হয়েছে। ফলে সেই বন্ধুর গোগ্রাসে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা বঞ্চিত দুর্ভাগ্যা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সাহারার পত্তন দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী স্বীকৃত বাংলাদেশের সাগরসীমায় তালপট্টি দ্বীপের দক্ষিণাংশে গড়ে ওঠা দ্বীপ 'পূর্বাশার (তালপট্টি) ছলে বন্ধু দেশের নৌবাহিনীর কবলিত। এদিকে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার পানির প্রতি বন্ধুত্বের লোলুপ দৃষ্টি বাংলাদেশের জিভের পানি শুকিয়ে ফেলেছে।

কেন এই বিড়ম্বনা? আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশের একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে--(মিঃ বি. এম. আববাস।) যিনি পাকিস্তানী আমলে, বাংলাদেশের জন্মের পরে শেখ মুজিবের আমলে ও জিয়াউর রহমানের আমলেও ভারতের সঙ্গে ফারাক্কা সংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন-- কিছুদিন পূর্বে আলাপ হয়েছিল ফারাক্কা ও গঙ্গা প্রবাহ সম্বন্ধে। তাঁর অভিমতঃ ফারাক্কা বাঁধ কমিশন হওয়ার আগে আমাদের যে সুবিধাজনক অবস্থান ছিল এখন তা নেই। আমাদের সম্মতি ব্যতীত ভারতের পক্ষে ফারাক্কা বাঁধ কমিশন করা সম্ভবপর ছিল না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সশস্ত্র সহযোগিতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং একাত্তুরের ষোলই ডিসেম্বর পরবর্তীকালে ভারত-বাংলাদেশের যে বিশেষ সম্বন্ধ, তৎকালীন রাজনৈতিক সামরিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ পরিস্থিতি এবং তার মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী

www.pathagar.com

প্রধান জেঃ অরোরার নিকট (মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক জেঃ ওসমানীর নিকট নয়) পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনীর আত্মসমর্পণ বিশেষ গুরুত্ববপূর্ণ। তারপর ভারতীয় সামরিক-অসামরিক ব্যক্তিবর্গের প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান ও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব বিভিন্নমুখী কারণে ফারাক্কা বাঁধ কমিশন করার ব্যাপারে বাধ্যতামুলক বদান্যতা প্রদর্শন করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। এখন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেটুকু পাওয়া যায়, ভারতের বদান্যতা। তবে এই 'পাওয়ার' জন্য অত্যন্ত উচ্চমুল্যই দিতে বাধ্য হচ্ছি আমরা।

হতে পারে, এ মূল্য বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা বাঁধের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্রের পানি সারেণ্ডার করা, হতে পারে বাংলাদেশের রেল লাইনের পাশাপাশি বাংলাদেশের জমিতে ভারতের নিজস্ব রেল লাইন চালু হতে দেয়া। নৌ-টানজিট সুবিধা প্রদান। যার মানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব প্রকারান্তরে ভারতের কাছে বিলিয়ে দেয়া। অন্যথায় ফারাক্কার কল্যাণে-সুজলা সুফলা কৃষি প্রধান বাংলাদেশকে পানির অভাবে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। অন্য কথায় ফারাক্কা বাঁধ কমিশন করতে দিয়ে আমাদের বাঁচবার, আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের চাবিকাঠি আমরা ভারতের হাতে তুলে দিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা লর্ড কর্নওয়ালিশের 'সাবসিডিয়ারী অ্যালায়েন্স' (বশ্যতামুলক মিত্রতা) অপেক্ষা অধিকতর মর্যদাজনক তো নয়ই বরঞ্চ অনেক দিক দিয়ে অধিকতর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। মোটের উপর এই সত্য আজ বিশেষভাবে প্রণিধান কারা প্রয়োজন যে, শেষ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন ভাষার স্বার্থে নয়- বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছিল-- এবং তা অচেতন সচেতনভাবে- যেভাবেই হোক না কেন- বিদেশী স্বার্থে। প্রকাশ্যে ভাষাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং যদিও এর প্রাথমিক উদ্যোক্তাগণ 'তমুদ্দুন মজলিস ও সংগ্রামী রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত ইনাসেন্টভাবেই সরল বিশ্বোসে এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন, আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তা বাংলাভাষার স্বার্থেই। প্রকৃতপক্ষে এরা কুটবুদ্ধি ইসলামের শত্রুদের আসল উদ্দেশ্য সাধনে ক্যাট'সপ (বিড়ালের হাত) হিসেবেই কাজ করেছিলেন যদিও হয়তো তখন তারা এই সত্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। রাজাকার হিসাবে নিন্দিত মিঃ গোলাম আজম, মিঃ শাহ আজিজুর রহামান, মওলভী ফরিদ আহমদ প্রমুখ ভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানীবৃন্দ যখন ভাষা আন্দোলনের নামে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তখন কি তাঁরা ঘুণাক্ষরেও সে আন্দোলনের পরবর্তী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও বর্তমান পরিণতি কল্পনা করতে পেরেছিলেন? এদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে এই-ই কিন্তু ছিল সে আন্দোলনের মৃত্যুর মতো নির্মম, আমোঘ,

www.pathagar.com

অভ্রান্ত পরিণতি। ইতিহাস খ্যাত 'গাদ্দারে বাঙ্গাল' মীর জাফর যখন সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, ইংরেজ ও হিন্দুদের সহায়তায়, তখন কি তিনি তা করেছিলেন ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য,- না অন্য একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে, নিজের নবাবী নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে? আলীবর্দী খান ও অন্য দশজন উচ্চাভিলাষী আমীর-ওমরাহর মতো যা করেছিলেন, তা নিজের নবাবীর জন্যই করেছিলেন। কিন্তু দূরদৃষ্টির অভাব, চালে ভুল ছিল। ফলে মীরজাফর ও তার ফ্যামিলির বিপর্যয়, মুসলমানদের পতন, আর ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু জাগরণ। এরা কি এখনও বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের চালে ভুল ছিল? ইতিহসের লেখা তারা ঠিক মত পড়তে পারেননি। পারলে সখাদ সলিলে তাদেরকে ডুবতে হতো না। ফলে বাংলাভাষার নামে এত আন্দোলন, এত রক্তপাত সত্ত্বেও বাংলাভাষার মর্য্যাদা পাকিস্তান আমল হতে খুব বেশী অগ্রসর হয়নি। কেন এই ব্যর্থতা! রাজস্থানের চারন কবিদের রচিত ও গীত রাজপুতদের বীরত্ব গাথার মতো- 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' শ্লোগান মুখরিত সঙ্গীতাবলীই কি বাংলাভাষার জন্য ভাষা আন্দোলনের শেষ অবদান হয়ে রইবে?

এই সাক্ষাৎকারগুলো হতে এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, শুরুতে এই আন্দোলন ছিল বাংলাভাষার মর্য্যদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে নয়। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ স্বার্থপ্রণোদিতভাবে ভাষা আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে একে রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে ব্যবহার করেন। 'রাজনীতিবিদরা ভাষার মর্য্যদার চাইতে নিজেদের ক্ষমতার আরোহণের সিঁড়ি হিসাবে এ আন্দেলন ব্যবহার করেন বেশী।'-নুরুল হুদাঃ সংগ্রাম, ১৩-২-৮৩, ১৯৪৭ সাল। পাকিস্তানের জন্মের পরে পূর্ব বাংলা তথা ইস্ট পাকিস্তানে যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই অধ্যাপক আবুল কাশেম, আধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখের প্রচেষ্টার ফলে এবং তমুদ্দুন মজিলিস ও সৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে মূলতঃ বাংলা ভাষার মর্য্যদা রক্ষার্থে, তা বায়ান্নতে এসে নেয় বিচ্ছিন্ন একটি রাজনৈতিক মোড়। ফলে এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হতে জন্ম নিল উর্দু ভাষা বিদ্বেষ, পশ্চিম পাকিস্তানী অবাঙ্গালী বিদ্বেষ, স্বাধিকার আন্দোলন, আওয়ামী লীগের ছয় দফা, শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাদেশের জন্ম আর ভাষা আন্দোলন হারালো তার মূল উদ্দেশ্য, 'আদি তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত হল।' (মুজিবুলাহঃ সংগ্রাম, ১৪-২-৮৩) তাই বাংলা ভাষার মর্য্যদা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বস্তরের নেতৃবর্গের ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে প্রতি বৎসর বজ্রকঠিন শপথ গ্রহণ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী আমলে অর্জিত মর্য্যদা ও তরক্কীর

www.pathagar.com

চাইতে খুব বেশী কিছু বাংলাভাষার ভাগ্যে জোটেনি। আফসোস! উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী প্রভৃতি শিক্ষার মাধ্যম ও রাষ্ট্র ভাষার ব্যাপারে বাংলাভাষার অবস্থান, আগে যা ছিল প্রায় তাই রয়ে গেছে। পাকিস্তানী আমলে বাংলাভাষাকে প্রাদেশিক পর্যায়ে যে মর্য্যদা দেয়া হয়েছিল এই পর্যন্তই। বাংলাভাষার জন্য এ অতিশয় দুর্ভাগ্যজনক।

জাতির পক্ষে এ অতি দুর্ভাগ্যজনক যে, যে বাংলাভাষা আন্দোলন ছিল প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী সকল প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎসভূমি এবং বাংলাদেশের জন্মের সূতিকাগার, সেই ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিক ছিলেন এদেশের যে সব কৃতী সন্তান. . . এই বাংলাদেশেই তারা হয়েছেন অবহেলিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত, নিন্দিত এবং নিহতও বটে। শামসুল হক, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, গোলাম আজম, মওলভী ফরিদ আহমদ, শাহ আজিজুর রহমান প্রমুখ ভাষা আন্দোলনের বীর সৈনিকদের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষত : উনিশশ একাত্তুরের ষোলই ডিসেম্বরের পরে, তা ইতিহাসের এক বিরাট ট্রাজেডী।

ইতিহাসের এও আর এক ট্রাজেডী . . . জাতির জীবনে ঐতিহাসিক বিবর্তনে সবচাইতে গুরুত্ববহ যে ভাষা আন্দোলন, বাহান্নতে এসে তার শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের তথা বাংলাদেশেরও স্রষ্টা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর একটি বক্তব্যের ভ্রমাত্মক ভাষ্যের উপর!

www.pathagar.com

হিন্দু জীয়তাবাদ ও যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা

এই দেশে বর্ণহিন্দু শাসন-শোষণ প্রতিষ্ঠর প্রথম ধাক্কা খায়, খুবই সাময়িকভাবে হলেও ১৯০৫ সালে স্বতন্ত্র পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনে যদিও বর্ণহিন্দু 'বাঙ্গালীদের' সফল বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় কয়েক দশকের জন্য হিন্দু জাতীয়তাবাদ বিজয় লাভ করে। তবে প্রকৃতপক্ষে প্রথম স্থায়ী আঘাত এই বর্ণবাদী হিন্দুজাতীয়তাবাদ - ধ্বজাবাহীগণ লাভ করেন ১৯৩৫ সালে ভারত হতে বার্মার স্বাতন্ত্রীকরণের দরুণ বার্মার উপর ন্যস্ত 'ভারতমাতার' বাম করতল ও হস্তের কিয়দাংশের ব্যবচ্ছেদে। এরপর 'খণ্ডিত' ভারতমাতার জয়যাত্রা শুরু হয়। এই 'বৃহৎ' ভারত আদর্শবাদীগণ দ্বিতীয় এবং চরম আঘাত লাভ করেন কুশাগ্রবুদ্ধি মিঃ জিন্নাহে'র দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম অংশে মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলে স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কারণে যার ফলশ্রুতিতে পূর্ব-পশ্চিম দুই স্থানে 'ভারতমাতার' দেহ ব্যবচ্ছেদ, উপমহাদেশে হিন্দুস্থান (ভারত) এবং পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম যে পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান নামে ইতিহাসে স্থান লাভ করে। এ স্থলে লক্ষণীয় যে, যদিও এই বর্ণহিন্দু জাতীয়দাবাদীগণ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সর্বদাই 'ভারতমাতার' দেহ ব্যবচ্ছেদের ঘোর পরিপন্থী ছিলেন এবং তারা এই আদর্শের বুলি কপচিয়ে 'বঙ্গাসাম' পরিকল্পনা ও নব গঠিত 'বঙ্গাসাম' প্রদেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদসহ সর্বপ্রকারে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করে বঙ্গাসামপ্রদেশ বানচাল করেন এবং এই আদর্শের সাইনবোর্ড দেখিয়ে তারা বাংলার কতিপয় মুসলিম নেতৃস্থানীয় গুণীজনকে মুসলিম স্বার্থের প্রতিকূলে নিজেদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়ে ছিলেন, তবুও ১৯৪৭ সালে এইসকল বর্ণহিন্দু নেতৃপ্রধানগণের (যাদের পুরোধা ছিলেন, মিঃ গন্ধী, সুভাষ বোস, মিঃ জওহরলাল নেহেরু, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী, মিঃ গোপীবল্লভ বড় দুলুই প্রভৃতি হিন্দু সমাজের বিদগ্ধশালী ব্যক্তিবর্গ।) প্রচণ্ডতম বিরুদ্ধতার কারণেই 'যুক্তবাংলা' রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়নি। এই বিরুদ্ধতার কারণেই সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বোস প্রমুখের যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং দ্বিতীয়বারের এই ঐতিহাসিক বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় যদিও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার ফলে নেহায়েত অযৌক্তিক এবং অপ্রামাণিকভাবেই মিঃ জিন্নাহকেই এজন্যে দায়ী করা হয়ে থাকে। অবশ্য যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে সেই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম্ভবপর ছিল কিনা, সে সন্দেহ যে ওয়াকিফহাল মহলে ছিল না, তা

www.pathagar.com

নয়। তবে হিন্দু মুসলিম কেহ কেহ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে দেশ বিভাগজনিত আমূল পরিবর্তন, অসুবিধা ও সবকিছু ওলট-পালট হওয়া থেকে বাঁচবার আশায় কম-বেশী এর পক্ষপাতী ছিলেন।

মিঃ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পদ-স্বার্থ কলিকাতা এবং সন্নিকটস্থ অঞ্চল সমূহেই অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের যুগসন্ধিক্ষণে মুসলিম প্রধান বাংলার মুসলীম লীগ নেতা এবং বাংলা সরকারের চীফ মিনিস্টার এই উভয় পদেই তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার একজন বড় সমর্থক ছিলেন। এদিকে সুভাষ বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎ বোসের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক হিন্দু এই পরিকল্পনার সমর্থক ছিলেন। মিঃ সোহরাওয়ার্দী এই ব্যাপারে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্নাহর সমর্থন প্রার্থী ছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল, দূরদর্শী মিঃ জিন্নাহ এই যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন না। তবে তিনি এর বিরুদ্ধতাও করেননি। তিনি এটা বুঝতে মোটেই ভুল করেননি যে, এই পরিকল্পনা মিঃ গান্ধী প্রমুখ বর্ণবাদী আগ্রাসী হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থক হিন্দু নেতৃবর্গের চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। মিঃ জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীকে বলেছিলেন, তিনি যদি এ পরিকল্পনা কায়করী করতে পারেন তাহলে তার নিজের বা মুসলিম লীগের কোন আপত্তি নেই। মিঃ জিন্নাহর এই অভিমতের আরও একটি কারণ ছিল। এই উপমহাদেশেকে পূর্ব, পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় এই তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করার ক্যাবিনেট মিশন ব্যর্থ হওয়ার পরে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান এ দু'টি রাষ্ট্র ছাড়া তৃতীয় একটি রাষ্ট্রসম্বলিত অন্য কোন পরিকল্পনা যে গ্রহণীয় ছিলনা, সে কথা মিঃ জিন্নাহ বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে খণ্ডিত বাংলা, খণ্ডিত পাঞ্জাব এবং সমগ্র আসামের পরিবর্তে একটি মাত্র জেলা সিলেট তাও র‍্যাডক্লিক ও হিন্দু আঁতাতের ফলে খণ্ডিত, এই অসম্পূর্ণ 'পোকায় খাওয়া' পাকিস্তান কোনক্রমেই লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ছিল না এবং মুসলিম লীগের নিকটও গ্রহণীয় ছিল না। অনেক আলাপ-আলোচনার পর শেষ মুহূর্তে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস নেতা এবং মুসলিম লীগ নেতাকে ডেকে তার হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দিয়ে লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন যে, হয় এই পরিকল্পনার গ্রহণ আর না হয় বর্জন- এছাড়া অন্য কোন বিকল্প বা এই প্রস্তাবের কোন প্রকার সংশোধনী গ্রহণ করা হবেনা। মুসলিম লীগ কাউন্সিল তাদের দিল্লী অধিবেশনে যখন এই খণ্ডিত পাকিস্তান গ্রহণ করার বিরুদ্ধে তুমুল তর্কালোচনা করেছিলেন, তখন ভাইসরয়ের অনমনীয় এই সিদ্ধান্ত সকল তর্কের অবসান

www.pathagar.com

ঘটিয়ে লীগকে এই খণ্ডিত পাকিস্তান পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য করে। মোটের উপর মিঃ জিন্নাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান এবং যুক্তবঙ্গ এই তিনটি রাষ্ট্রের পরিকল্পনা কার্যকরী করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

তাই তিনি যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধতাও করেননি বা এটা কার্যকরী করার দায়িত্বও ঘাড়ে নিননি। তাই তিনি যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার উদ্যোক্তাদেরকে বলেছিলেন যে, তারা যদি এ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারেন তাহলে তার নিজের বা মুসলিম লীগের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা এসেছিল, কংগ্রেস, মিঃ গান্ধী, জওহর লাল নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ হিন্দু নেতৃবর্গের দিক থেকে। এই সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য মিঃ গান্ধীর সেক্রেটারী পিয়ারী লাল বিরচিত "মহাত্মা গান্ধী, দি লাস্ট ফেজ"-এ পাওয়া যাবে। 'যুক্তবঙ্গ' পরিকল্পনার যুগ্ম উদ্যোক্তাদের একজন তদানীন্তন বাংলার চীফ মিনিস্টার মিঃ সোহরাওয়ার্দী (অপর উদ্যোক্তা মিঃ শরৎ বোস) ১১ মে ১৯৪৭ তারিখে, ক্যাবিনেট মন্ত্রী মিঃ মোহম্মদ আলী (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী) বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সেক্রটারী মিঃ আবুল হাসেম সমভিব্যহারে মিঃ গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাঃ করেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা নিয়ে।

পিয়ারী লাল বিলছেনঃ মিঃ গান্ধী মিঃ সোহরাওয়ার্দীকে তাঁর অন্তরের পরিপূর্ণ এবং অকপট পবিরবর্তনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করানোর চেষ্টা করলেন। তিনি (অর্থাৎ মিঃ সোহরাওয়ার্দী) যদি এই আশা করেন যে, হিন্দুরা তাঁর বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করবে তা হলে তিনি তাঁর নিজের চরিত্রে এবং প্রশাসনের চরিত্রে অবশ্যই তা দেখাবেন। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তৎপরিবর্তে এই মতে স্থির রইলেন যে, কলিকাতায় তখন শান্তি বিরাজমান এবং কেহই বাংলার গভণমেণ্টকে কোন প্রকার অন্যায়ের জন্য অপরাধী করতে পারেন না। যখন মিঃ গান্ধী তাঁকে বাললেন যে, বাংলায় যতগুলো মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে, প্রশাসনের প্রধান হিসাবে নীতিগতভাবে তার প্রত্যেকটির জন্যই তিনি দায়ী-- তখন মিঃ সোহরাওয়ার্দী মেজাজ গরম করে পাল্টা মিঃ গান্ধীকে সকল গোলমালের স্রষ্টা বলে দোষী করেন।

(পিয়ালী লালঃ মহাত্মা গান্ধী-- দি লাস্ট ফেজ দ্বিতীয় খণ্ড।)

"পরে মিঃ গান্ধী বলেছিলেন, "কি অদ্ভুত লোক! সে কি বলে না বলে তাতে তার কিছুই আসে যায় না। সে চায় যে, লোকে তাকে বিশ্বাস করুক, কারণ তাঁর কথা অনুযায়ী যে নতুন বাংলা সে গড়বে- সেখানে সকল সম্প্রদ্রায়ের প্রতি সমব্যবহার নিশ্চিত থাকবে।"

www.pathagar.com

পরদিন আবার মিঃ সোহরাওয়ার্দী মিঃ গান্ধীর সম্মতি লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালান পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে। তিনি মিঃ গান্ধীর সাথে দেখা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, হিন্দুরা (অর্থাৎ মিঃ গান্ধীও) তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করছেন না, যদিও তিনি যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব অত্যন্ত অকপটভাবে এবং সরল বিশ্বাসের সাথেই করেছেন। এর জবাবে মিঃ গান্ধী সহাস্যে তাঁর আপতঃ মধুর ও রহস্যবিধুর মন্তব্য রাখলেন, 'তুমি যা বলছ, সে সম্বন্ধে যদি তুমি সত্য সত্যই অকপট হয়ে থাকো এবং তোমার সম্বন্ধে আমার যা সন্দেহ আছে তা আমার মন থেকে দূর করতে পারো, তাহলে আমি সর্বতোভাবে রাজি আছি তোমার অবৈতিনিক প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করতে।"

স্বভাবতঃই এই জটিলতা ও কুটিলতাপূর্ণ জবাবে মিঃ সোহরাওয়ার্দী অবাক হয়ে বলেছিলেন, "কি রকম পাগলামী কথা! এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে আমাকে অন্ততপক্ষে দশবার চিন্তা করতে হবে।"

এর কয়েকদিন পরে ১৯ মে ১৯৪৭ তারিখে মিঃ শরৎ বোস পাটনায় মিঃ গান্ধীর নিকট যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা পেশ করে অত্যন্ত জরুরীভাবে 'মহাত্মা'র সমর্থন চেয়ে পাঠালেন। তার এই পরিকল্পনায় আসাম প্রদেশকেও ধরা হয়েছিল। তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, এই পরিকল্পনা তাঁর বাড়ীতে মিঃ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী মিঃ ফজলুর রহমান, মন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ আলী, মুসলিম লীগ সেক্রটারী মিঃ আবুল হাসেম, লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী মেম্বার মিঃ মালেক (পরবর্তীকালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্ণর) এবং মিঃ কিরণ শঙ্কর রায় ও সত্যরঞ্জন বকসী প্রমুখ প্রভাবশালী হিন্দু নেতৃবর্গ কর্তৃক তৈরি করা হয় এবংসকলের সম্মতির নিদর্শনস্বরূপ মুসলিম লীগের তরফ হতে মিঃ আবুল হাসেম এবং হিন্দুদের পক্ষ থেকে মিঃ শরৎ বোস সই করেন। তিনি এও জানান যে, কিছু অদল-বদল করে হলেও এই পরিকল্পনা বাংলার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে পাশ হবে এবং যদি কংগ্রেস ও বাংলার মুসলিম লীগ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহলে মিঃ জিন্নাহ তাতে নাও বাধা দিতে পারেন। বাংলার মুসলিম মেজরিটি আতঙ্কগ্রস্ত, সর্বভারতে হিন্দু মেজরিটির গোঁড়া সমর্থক মিঃ গান্ধী এইবার সংখ্যালঘুদের অর্থাৎ বাংলার হিন্দুদের স্বার্থ সন্ধানে যে প্রস্তাব দিলেন, তা মিঃ গান্ধীর বিরাট ব্যক্তিত্বের মতই মানানসই গণতন্ত্রের প্রতি মিঃ গান্ধীর এক বিরাট অট্টহাসির শামিল। সংখ্যালঘু মুসলিমদের বা অন্যান্য সখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থার কথা উত্থাপন করলে যারা গণতন্ত্রের নামে আকাশ-পাতাল ওলট-পালট করে ফেলেন, তারা এবার অবলোকন করুন, মিঃ গান্ধীর গণতান্ত্রিক মানসের একদম এক অদ্ভুত

www.pathagar.com

পরিচিতি। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি রায় দিলেনঃ " খসড়া পরিকল্পনায় (অর্থাৎ যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনায়) এমন কিছুই নেই যে, কেবলমাত্র সংখ্যাগুরুত্বের দ্বারা কিছুই করা যাবে না। গবর্নমেটের প্রত্যেক কাজে গর্ভর্নমেন্টের এক্সিকিউটিভ এবং লেসিলেটিভ-এ 'সংখ্যালঘু হিন্দুদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন' বাধ্যতামূলকভাবে থাকা আবশ্যক। এ কথার স্বীকৃতিও থাকা চাই যে, ট্যাগোরের(রবীন্দ্রনাথের) সংস্কৃতি, যার মূল রয়েছে উপ নিষদের দর্শনে- বাংলার সকলের (অর্থাৎ হিন্দু ত বটেই, মসুলমানদেরও) সংস্কৃতি।"

বালাবাহুল্য, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই মিঃ গান্ধীর এহেন অগণতান্ত্রিক এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রভুত্বসূচক এই প্রস্তাব মিঃ সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবর্গ বা মুসলিম লীগ কারো পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

কাজেই মিঃ শরৎ বোস আদুরে গোপালের মত মিঃ গান্ধীর এই অদ্ভুত প্রস্তাবের কারণে যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারেননি।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু কংগ্রেসের তথা মিঃ গান্ধীর আপত্তির মূল কারণ এখানে নয়, অন্যত্র নিহিত ছিল।

আসল কথা সার্বভৌম যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনায় আসাম কেন্দ্রীয় হিন্দু ব্লকের সাথে সংযোগহীন হয়ে পড়বে-- এই ছিল তাদের আপত্তির মূলীভূত কারণ। যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকরী হলে ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক আসামকে যুক্তবঙ্গের সাথে যোগদান করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না। ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যোগদান করা আসামের পক্ষে সম্ভবই হতো না।

তৎকালীন আসামের মুখ্যমন্ত্রী বাঙ্গালখেদা আন্দোলন খ্যাত মিঃ গোপীনাথ বড়দলই আতংকগ্রস্ত মিঃ গান্ধীকে জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করেছিলেন, 'যদি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলারাষ্ট্র গঠন করতে দেয়া হয়, তাহলে আসাম কেন্দ্র এবং কেন্দ্রে যোগদানকারী অন্যান্য প্রদেশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সমুদ্র পথ বন্ধ হবে এবং পূর্ব পশ্চিম উভয়দিক হতে আক্রমণের শিকার হতে হবে। আসামকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেই হবে।

বলা বাহুল্য, এখানেই ছিল যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার আসল কারণ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সোহরাওয়ার্দ্দী শরৎ বোস যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা যাতে কার্যতঃ আসামকে বাংলার সঙ্গেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হোত মূলতঃ ছিল কাবিনেট মিশন বা ক্রীপস মিশন পরিকল্পনার (১৯৪৬) একটা পরিবর্তিত রূপ- ক্রীপস মিশনের A,B,C, গ্রুপ এর C গ্রুপ যে যে গ্রুপে ছিল বাংলা এবং আসাম প্রদেশ। ১৯৪৭ সালের যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা

www.pathagar.com

বানচাল করার পূর্বে ১৯৪৬ সালের এই ক্রীপস মিশন পরিকল্পনাও মিঃ গান্ধী, জহরলাল নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বানচাল হয়। এ সম্বন্ধে তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে বিশেষ গুরুত্ববহ নিরপেক্ষ এক ব্যক্তিত্ব লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটনের পূর্ববর্ত্তী (ব্রিটিশ ভারতের ১৯৪৩ সালের অক্টোবর হতে ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত) ভারতের ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল ওয়াভেলের মন্তব্য বিশেষ প্রনিধান যোগ্যঃ

"গান্ধীজী সাময়িক ভাবে বন্ধু ভাবাপন্ন, কিন্তু সুযোগ বুঝে তিনি পিছু হঠতে ওস্তাদ। ক্রীপস মিশনে ব্যর্থতার জন্য গান্ধীজিই দায়ী। তার ৪০ বছরের একমাত্র লক্ষ্য হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা। সেদিক থেকে তিনি যে কোন পন্থা গ্রহণ করতে পারতেন, তার তথা কথিত সত্য সাধনা হতে বিচ্যুত হতে তিনি 'দ্বিধা করতেন না।'

[সংগ্রাম ১৮/৫/৯৪]

এই সত্য এবং স্পষ্ট ভাষণের জন্যে তাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। তাছাড়া তিনি মিঃ গান্ধী এবং কংগ্রেসের আবদার অনুযায়ী মুসলীম লীগও মুসলমানদের সায়েস্তা করার জন্য পাঞ্জাবে মিলিটারী শাসন প্রবর্তন করতে অস্বীকার করেন। ফলে তার জায়গায় আনা হয় নেহেরুর বন্ধু লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেনকে ভারত বিভাগের জন্য। সংসক্তি-গ ডাঃ বিমলানদ শাসনামল। [ইনকিলাব ১১ই আশ্বিস ১৩৯৮]

লারি কলি নস ও ডোমিনিক লাপিয়ের 'ফ্রীডম এট মিডনাইট' নামক গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত ইং ১৯৭৬ সালে। এই গ্রন্থরচনার জন্য গ্রন্থকারদ্বয় উপমহাদেশে ও ইংল্যাণ্ডে ছয় হাজার মাইল সফর করেন। পাঁচ শতাধিক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৪৭ সালের মে মাসের কথা। এই উপমহাদেশ কি পদ্ধতিতে স্বাধীন হবে সেই পরিকল্পনা লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়ে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন সিমলা সফরে গিয়েছেন। পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহারু এবং কৃষ্ণ মেননও তখন সিমলায় ছিলেন। গ্রন্থকারদ্বয় বলছেনঃ "Mountbatten had inserted in the plan a clause which would allow a province to become independent if a majority of both its communities wishes to. That clause was intended to provide that the sixty five millions of Hindus and Muslims of Bengal could join into one viable country with the great seaport of calcutta as their Capital"

www.pathagar.com

অর্থাৎ "মাউন্ট ব্যাটেন ঐ পরিকল্পনায় এমন একটি ধারা যোগ করিয়াছিলেন যে, কোনও প্রদেশের উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ইচ্ছা করিলে আজাদ হইতে পারিবে। বৃহৎ সমুদ্র বন্দর কলিকাতাকে রাজধানী করিয়া বাংলাদেশের সাড়ে ছয়কোটি হিন্দু-মুসলমানকে একযোগে একটি স্থিতিশীর দেশ গঠনের সুযোগ করিয়ে দেয়াই এই ধারাটির উদ্যেশ্য"

ইহাই হইতেছে সেই ' আজাদ বাংলাদেশে'র মূল পরিকল্পনা। উক্ত গ্রন্থের ১২৪ নং পৃষ্ঠার বিবরণ থেকে দেখা যায় যে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে এই ধারাটি দিয়েছিলেন এবং "The viceroy liked it. To his surprise he discovered Bengal's congress Hindu leaders were interested in the project. He had quietly encouraged their inetrest. He had even discovered Jinnah would not oppose the idea."

অর্থাৎ বড় লাট ইহা পছন্দ করেছিলেন। তিনি বিস্ময়ের সহিত আবিষ্কার করিলেন যে, বাংলাদেশের কংগ্রেসী হিন্দু নেতাগণ এই বিষয়ে আগ্রহী। তিনি গোপনে তাহাদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এমনকি, তিনি ইহাও আবিষ্কার করিলেন যে, জিন্নাহ সাহেব, ইহার বিরোধিতা করিবেন না'

তাহা হইলে 'আজাদ' বাংলাদেশ কায়েম হইল না কেন? মাউন্টব্যাটেন উহা প্রথমে নেহরু ও প্যাটেলকে বলেন নাই। পরে তিনি সমগ্র পরিকল্পনাটি 'নেহেরু' কে দেখাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সেই মোতাবেক তিনি জওয়াহের লাল নেহেরুর হাতে একখানি দলিল দিয়া অবসর মত পড়িয়া দেখার অনুরোধ করিলেন। গ্রন্থকারদ্বয় মন্তব্য করিতেছেনঃ

"The door Mountbatten had left open for Bengal, would become, Nehru Found, a wound through which best blood of India would pour. He saw India deprived of the lungs, the Port of Calcutta along with its Mills, Factories and steel works,"

অর্থাৎ "নেহেরু দেখিলেন যে, মাউন্টব্যাটেন বাংলাদেশের জন্য যে পথ খোলা রাখিয়েছেন, তা এমন একটি জখমে পরিণত হইবে, যাহার মধ্য দিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ রক্তক্ষরণ হইবে। তিনি দেখিলেন, ভারতকে তাহার ফুসফুস হইতে- অর্থাৎ কল-কারখানা ও ইস্পাতমিলসহ কলিকাতা বন্দর হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।"

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কৃষ্ণ মেননের কামরায় গিয়ে দলিলখানি বিছানার উপর ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'ইট ইজ অল ওভার।'

www.pathagar.com

তার পরের খবর, মাউন্টব্যাটেন ঐ সিমলায় বসিয়াই তার অফিসার ভিপি মেননের সাহায্যে পরিকল্পনা বদল করেছিলেন এবং নিজে লণ্ডনে গিয়ে হুমকি দিয়ে তা পাশ করে এনেছিলেন।

যাই হোক মিঃ গান্ধীর সাথে এই আলাপ-আলোচনার পর মিঃ শরৎ বোস মিঃ জিন্নাহকে ৯ই জুন, ১৯৪৭ তারিখে এক পত্রে লিখলেনঃ

'আমি আপনার নিকট যে অনুরোধ করছি, তা আমাদের মধ্যে সাক্ষাতের সময় আপনি যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন সেই অনুযায়ী। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আপনি যদি কেবল মাত্র আপনার মতামত আপনার মেম্বারদের (অর্থাৎ লীগের) কাছে প্রকাশ করেন ও তারা কিভাবে ভোট দেবেন, সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নির্দেশ প্রদান করেন, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি রক্ষা করা যাবে। যদি বাংলাদেশের আইনসভার মুসলিম মেম্বারগণ প্রস্তাব অনুযায়ী একযোগে ভোট দেন, তাহলে আমার মনে হয়, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন বাধ্য হবেন ইউরোপীয়ান বাদে অপর সকল অ্যাসেম্বলী মেম্বারদের সভাডাকতে। সেখানে সিদ্ধান্তনেয়া যেতে পারে যে সম্পূর্ণ প্রদেশটি (অর্থাৎ যুক্তবঙ্গ প্রদেশ) তার নিজের জন্য আলাদা একটা সংসদীয় সভা চায় কি না' [পিয়ারী লাল মাহাত্মা গান্ধী... দি লাস্ট ফেইস' দ্বিতীয় ভল্যুম।]

মিঃ জিন্নাহর নিকট লিখিত মিঃ শরৎ বসুর এই পত্রের কথা জানতে পেরে অসাম্প্রদায়িক(?) মহাত্মা প্রমাদ গুণলেন। তিনি আশংকা করেছিলেন যে, এই পরিকল্পনায় মিঃ জিন্নাহ যদি সম্মতি প্রদান করেই ফেলেন ... অন্ততঃপক্ষে অসম্মতি যদি প্রকাশ না করেন- তাহলে যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা বানচাল করার সমস্ত বদনাম নিজের ঘাড়ে নিয়েই তাকে এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে। যুক্তবঙ্গের সম্ভাবনায় আতকংগ্রস্থ মিঃ গান্ধী তখন তাড়াতাড়ি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটের, জওয়াহেরলাল নেহেরু এবং গোপীনাথ বড় দলুই প্রমুখ হিন্দু নেতৃবগৃের সাথে সলাপরামর্শ করে যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করলেন তাঁর জবাবী চিঠিতে। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে হিন্দু মহাসভা প্রধান শ্যামাপ্রসাদ যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে অপরিবর্তনীয় অভিমত প্রকাশ করে বিবৃতি দেন যে, ভারতের বাকী অংশে যদি ভাগাভাগি নাও হয়, তাহলেও বাংলাকে ভাগ করেতেই হবে।

'বঙ্গমাতা'র দুর্ভাগ্য যে, যে বর্ণহিন্দুরা ১৯০৫ সালে বঙ্গমাতার দেহ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বানচাল করেছিলেন, তারাই ১৯৪৭ সালে আদাজল খেয়ে লাগলেন সেই বঙ্গমাতারই

www.pathagar.com

দেহ ব্যবচ্ছেদের প্রচেষ্টায় এবং এবারও অত্যন্ত সাফল্যের সাথে। তাই মিঃ গান্ধী শরৎ বোসকে লিখলেনঃ

'আমি তোমার খসড়া পরিকল্পনা পড়েছি। পণ্ডিত নেহেরু এবং সর্দার প্যাটেলের সাথেও মোটামুটি আলাপ করেছি। তাঁরা উভয়েই এই প্রস্তাবের ভীষণ বিরোধী এবং তাঁরা মনে করেন যে, এটা হিন্দু এবং তফসিল সম্প্রদায়ভুক্ত নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি কৌশলমাত্র। এটা তাদের কেবলমাত্র একটা সেন্দেহ নয়-- একেবারে নিশ্চিত বিশ্বাস। তাঁরা এ-ও অনুভব করেন যে, অজস্র টাকা ঢালা হচ্ছে তফসিলী সম্প্রদায়ের ভোট সংগ্রহ করার জন্য। যদি ব্যাপার এই হয়, তাহলে অন্ততঃপক্ষে বর্তমানের জন্য তোমার এই প্রচেষ্টা বাদ দেয়া উচিত। কারণ 'দুর্নীতির মাধ্যমে ক্রীত ঐক্য,' সুপ্রতিষ্ঠিত আন্তরিক বিভেদ এবং হিন্দুদের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি হিসাবে, সরলবিশ্বাসে কৃতদেশ ভাগাভাগির চাইতে অনেক বেশী খারাপ। আমি এ-ও দেখছি যে, ভারতের দুই অংশ ছাড়া অন্যত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন সম্ভাবনা নেই।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তৃতীয়বার বিজয়ী মিঃ সুভাষ বোসকে হিংসা এবং কলুষের গন্ধাধিক্যের দোহাই দিয়ে যেভাবে সুকৌশলে মিঃ গান্ধী প্রেসিডেন্ট পদ হতে বিচ্যুত করেছিলেন, এবার সুভাষ বসুরই সহোদর মিঃ শরৎ বোসের এই প্রচেষ্টাও অনুরূপ একটি কূট কৌশলের মাধ্যমে তথাকথিত দুর্নীতির অজুহাতে ব্যর্থ করলেন। দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের বদনাম দিয়ে এক বঙ্গ পরিকল্পনা ব্যর্থ করলেন। ধন্য মহাত্মার সূক্ষ্ম চানক্যনীতি, কূটকৌশল! ইংরেজীতে একটা কথা আছেঃ কুকুরটাকে ফাঁসী দিতে হলে আগে তার একটা বদনাম দিবে।" অধিকন্তু, সেই দিনই সন্ধ্যায় মিঃ গান্ধী তার প্রার্থনাকালীন ভাষণে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনয়ন করলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই অন্যায় আক্রমণে উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ শরৎ বোস এক কড়া তারাবার্তায় এই অভিযোগের প্রকাশ্য তদন্ত দাবী করে বললেনঃ "যদি এই খবর (অর্থাৎ দুর্নীতির অভিযোগ) মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তাহলে এই খবর রটনাকারীদের শাস্তি দিন, আর যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে যারা উৎকোচ দিয়েছে এবং নিয়েছে তাদের শাস্তি দিন।"

এর পরে ১৪ জুনের চিঠিতে শরৎ বোস মিঃ গান্ধীকে জানালেন যে, যদিও জওহরলাল এবং বল্লভ ভাই প্যাটেল উভয়েই 'যুক্ত বঙ্গ' পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী এবং তারা এর মধ্যে ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল এবং তফসিলী নেতাদের ঘুষ প্রদান দেখতে পাচ্ছেন-- তবুও শরৎ বোস ছ'মাস ধরে মুসলিম লীগ এবং

www.pathagar.com

কংগ্রেস নেতৃবর্গের সাথে যা আলাপ আলোচনা করেছেন, তাতে তিনি এসব সত্য বলে বিশ্বাস করেন না এবং উৎকোচ প্রদানের খবর সর্বৈব মিথ্যা। সব শেষে তিনি মিঃ গান্ধীকে জানিয়ে দিলেন, "যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনায় আমার স্থির বিশ্বাস অপরিবর্তিত এবং আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী এই প্রদেশের ঐক্য রক্ষার চেষ্টা করবো।"

মিঃ গান্ধী যে যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন, এটা বুঝতে পেরে শরৎ বোস তখন তার প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হতে পদত্যাগ করেন। শুধু শরৎ বোসই নয় প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা মিঃ অখিল চন্দ্র দত্ত মিঃ গান্ধীর এই সাম্প্রদায়িক কার্য্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে মিঃ গান্ধীকে একপত্রে লেখেনঃ

A movement has been set on foot for the partition of Bengal and thus secure home land for the Hindus. Infact this movement seems to me to be a communal one-দৈনিক সংগ্রাম--৩/৪/৯৪

মিঃ গান্ধী কর্তৃক এইভাবে যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা বানচাল হওয়ায় ক্রুদ্ধ সোহরাওয়ার্দী "বাপুজীকে" আঘাত হানতে ছাড়লেন না। তিনি মিঃ গান্ধীকে লিখলেনঃ "আমি দুঃখিত যে,আপনার এই বিবৃতির ফলে বিষয়টি ঘোলাটে হয়ে পড়েছে। কাগজওয়ালারা সাগ্রহে এই বিবৃতি লূফে নিয়েছেন যে, যুক্তবঙ্গ পরিল্পনা অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত। আপনার কাছ থেকে আমি কোন জবাব আশা করিনা-- বা এই চিঠি যে আপনার উপর বিন্দুমাত্র আছর করবে তাও নয়। কিন্তু আপনার বিবৃতি যে কি অপরিশোধণীয়-- আমাকে ক্ষমা করুণ, মিঃ গান্ধী এই কথা ব্যবহার কার জন্য-- ক্ষতি করতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার প্রতিক্রিয়া আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য বলে মনে করি। কাকে আক্রমণ করতে হবে তা ঠিক ধরতে না পেরে যুক্তবঙ্গ সমর্থনকারী সবারই কুৎসা আপনি করেছেন।"

উপরোক্ত প্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্যবলী এজন্য পেশ করা হল, যাতে এ সম্বন্ধে আজকের শিক্ষিত জনমনে যে বিভ্রান্তি আছে, তার কিছুটা অপনোদন হতে সাহায্য হয়। এ থেকে কয়েকটি বিষয় বেশ সুপরিস্ফুট এবং সুপ্রমাণিত।

মিঃ গান্ধীর, কংগ্রেসের বা বর্ণ হিন্দু নেতৃবৃন্দের জন্য গণতন্ত্রের বুলি কোন একটা মতাদর্শে স্থির-অচঞ্চল বিশ্বাসের পরিচায়ক নয়, প্রয়োজনের তাগিদ মেটাবার একটা সহজলভ্য শ্লোগান মাত্র।

'বাঙ্গালী' হিন্দুদের নিরাপত্তার বা উৎকোচ দুর্নীতির কারণে নয়, আসাম প্রদেশ যাতে হিন্দুদের কব্জাচ্যুত না হয়, মুসলিম প্রধান 'যুক্তবঙ্গের' সাথে সংযোগ না করতে পারে এটাই ছিল আসল মতলব। পরবর্তীকালে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের 'বঙ্গ বিভাগের' সময় এই মতলবটাই সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সংখ্যালঘু হিন্দু কর্তৃক মূল রাজধানী কলিকাতা অর্জনের পরেও

www.pathagar.com

সংখ্যাগুরু মুসলিমদেরে বঞ্চিত করে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী দার্জিলিং, দিনাজপুর ও রংপুরের অংশ বিশেষ অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের প্রদান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে আসামের সাথে ভারত ইউনিয়নের সংযোগ রক্ষা করার স্বার্থে। এটা আসামের জন্য একটা সমুদ্র পথ খোলা রাখার মতলবেও বটে। 'যুক্তবঙ্গ' হলে আসামকে বাংলার সাথেই যোগ দিতে হত। যুক্তবঙ্গ না হলেও উপরোক্ত স্থানগুলো দার্জিলিং, দিনাজপুর ও রংপুরের স্থান বিশেষ সাবেক পূর্ব বাংলা (তথা পূর্ব পাকিস্তান) থেকে কেটে না নিলে বর্তমান বাংলাদেশের সাথেই আসামকে আপোষ করে চলতে হত ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যোগদেওয়াও সহজ সাধ্য হত না। ফলে ভারতের পক্ষে সিকিম জবরদখল করা ও ভুটানের উপর কর্তৃত্ব করা সম্ভব হোত না এবং বাংলাদেশের প্রয়োজন হতো না-- নেপালের সাথে সংযোগ রক্ষার প্রয়োজনে মাত্র ১৮ মাইল দূরত্বের জন্য ভারতের দ্বারস্থ হওয়া যদিও সঙ্গতভাবেই এসব জায়গা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশেরই প্রাপ্য ছিল। দেশের দুর্ভাগ্য, র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের সময় আমাদের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও আইনজ্ঞ শেরেবাংলা ও সোহরাওয়ার্দী দেশের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনের সময় এগিয়ে এলেন না। এই দুই জন শ্রেষ্ঠ মুসলিম নেতা-- তৎকালীন মুসলিম বঙ্গে এরাই ছিলেন শীর্ষ স্থানীয়-- (যাদের মোকাবেলা করার মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্নও বৈদগ্ধশালী আইনজীবী 'হিন্দু বঙ্গে' ছির না বললেই চলে) তখন তাদের 'ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আশা ভঙ্গের কারণে জাতির এই জীবন মরণ সমস্যার কালে ট্রয় যুদ্ধের গ্রীক বীর আকিলিসের মত অভিমান ভরে এইসব রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখলেন। ফলে তৃতীয় শ্রেণীর আইনজ্ঞ দিয়েই নেহায়েৎ দায় সারা ভাবেই দেশ বিভাগ কমিশনে, -- র‍্যাডক্লিক কমিশনে-- 'মুসলিম বঙ্গের কেস পরিচালনা করা হয়। এর যা পরিণতি, তা বর্তমানে সবারই বেশ ভালো জানা আছে, যার ফল ভোগ বা দুর্ভোগ এখন আমাদেরই, বাংলাদেশকেই নিয়মিত পোয়াতে হচ্ছে তা সে সীমান্ত সমস্যাবলীর জন্যই হোক, গঙ্গার পানি বণ্টনের ব্যাপারেই হোক, অথবা ব্রহ্মপুত্র বা তিস্তার পানির বেলাতেই হোক অথবা নেপালের সাথে নদীর পানি সংক্রান্ত কোন আলাপ-আলোচনা-সহযোগিতা বা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসাণের এবং যাতায়াত ব্যবস্থার প্রয়োজনেই হোক না কেন।

[সংসক্তি ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ]

www.pathagar.com

বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা

প্রকৃতপক্ষে 'বাঙ্গালী/তথা হিন্দু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্‌গতা 'বন্দেমাতরম'-- এর জনক বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নয় এবং বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ ১ মুসলিম বিদ্বেষ, ও সামপ্রদায়িক রূপ ২ পৌত্তলিকতা এবং ৩ ব্রিটিশ তোষণ।

বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের সর্বপ্রধান উৎস মুসলিম বিদ্বেষ। তীব্র মুসলিম বিদ্বেষই বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এই সত্য বঙ্কিমের কয়েকটি নাম করা উপন্যাসে বিশেষতঃ 'আনন্দ মঠে' অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকট।

মুসলমান 'নেড়েদেরে' ধ্বংস করা, বিতাড়িত করা এবং মুসলমান রাজ্যের ধ্বংস কামনায় 'হিন্দু দেশপ্রেমিক সন্তান সংস্থা' গঠিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, একই 'মহৎ' উদ্দেশ্যে গঠিত, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত বর্তমান ভারতের জনসংঘ, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ বি, জেপি, শিবসেনা প্রভৃতি ঘোর উগ্রপন্থী হিন্দু সম্প্রদায়িক সংগঠনসমূহ গড়ে উঠেছে। এই সংগঠনগুলো মুসলমানদের দলন, দমন, নিপীড়ন ও নিধন করার প্রচেষ্টায় সতত নিয়েজিত থেকে বঙ্কিম চন্দ্রের সার্থক উত্তরসূরীর ভূমিকা পালন করছে এবং বঙ্কিম চন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষজাত হিন্দু জাতীয়তাবাদের সাথে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও তারই পূর্বাঞ্চলীয় সংস্করণ-- 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' তাদের কার্যক্রমে নিবিড় যোগসূত্র প্রমাণ করেছে। গত তিরিশ বছরে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে সংঘটিত কয়েক হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং আহমেদাবাদ, আলীগড়, অন্ধ্র, বোম্বাই বা জামশেদপুরে সাম্প্রতিক দাঙ্গা এই কথার সত্যতাই ঘোষণা করছে। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী-- নেহেরু তনয়া, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তার বিভিন্ন অভিভাষণে জনসংঘ, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ এবং প্রাক্তন কংগ্রেসী সমবায়ে গঠিত (পরবর্তীকালে, ক্ষমতাসীন) জনতা পার্টির বিরুদ্ধে মুসলিম নির্যাতনের বহু অভিযোগ করেছেন। এককালের ক্ষমতাসীন ইন্দিরা কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ। ইতিপূর্বে তিনি নিজেও ক্ষমতাসীন থাকাকালে মুসলমানদের উপরে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাতে ত্রুটি করেননি। তার আমলে এমার্জেন্সীর কালে, ছলে-বলে কৌশলে মুসলমানদের 'বন্ধ্যাকরণের মত অত্যাচার তাঁর ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধীর মারফৎ চালিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ভারতের বর্তমান নরসীমা রাও শাসিত সরকার তো বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ঐতিহাসেক কীর্ত্তি সাধন করে এখন কাশ্মিরী মুসলমানদের ধ্বংস করার অভিযানে মত্ত।

বঙ্কিম চন্দ্রের জাতীয়তাবাদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর 'সার্বভারতীয় আদর্শ' বিবর্জিত 'হিন্দু ভারতীয়' সাম্প্রদায়িক রূপ। এটাও উক্ত প্রথম বৈশিষ্ট্যেরই বিশেষ অবদান। ফলে এটা ভারতের চৌদ্দ কোটি মুসলমানদের নিকট এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিকট অগ্রহণীয়। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে বা বাংলাদেশের ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এছাড়া বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ ও 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের' মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এই ঘোর মুসলিম বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার কারণে বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদকে সারা ভারত চষে বেড়াতে হয়েছে নায়কের সন্ধানে। কারণ মুসলমান তো অস্পৃশ্য যবন। মুসলমান বাদ দিলে 'বঙ্গদেশে' তার উপন্যাসের নায়কোচিত চরিত্র কয়েক শ' বছরের ইতিহাসে বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে সুলভ ছিলনা। তাই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু ভবানী পাঠক (দেবী চৌধুরানী) ও সত্যানন্দ (আনন্দ মঠ), রাজপুতানার জগৎসিংহ (দুর্গেশ নন্দিনী) ও রাজসিংহ (রাজসিংহ) এবং অজ্ঞাত কুলশীল উৎকল যুবরাজ হেমচন্দ্র (মৃণালিনী) তার জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণার অনুযায়ী যোগ্য নায়ক। বাংলার মুসলমান ওসমান, ঈশা খাঁ বা মুসা খাঁা নয়। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ যুগে প্রায় ছয় দশক পূর্বে মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে, তা আজকের দিনেও অতি সঙ্গতভাইে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বঙ্কিমের "জাতীয়তাবাদের মহামন্ত্র 'বন্দে মাতরম' যাহার প্রশংসা কীর্তনে মিঃ গান্ধীও পঞ্চমুখ। 'বন্দে মাতরমে'র স্রষ্টা 'আনন্দ মঠে'র রচয়িতা বঙ্কিম চন্দ্রের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ কি? বঙ্কিমের আদর্শ বীর মুসলিম বিদ্বেষী। সুদূর রাজস্থানের মাড়োয়ারী যুবক জগৎসিংহকে সন্ধান করিয়া তাহাকে হিরো সৃষিট করিতে হয়। বাংলার ঈশা খাঁকে তিনি খুঁজিয়া পাননা।

[ইতিহসের রূপান্তর ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একদিকঃ ফজলুল করিম মাসিক মোহাম্মদী-শ্রাবণ-- ১৩৪৬ সাল। সংসক্তি-ক]

"হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের চির বিরোধ, হিন্দু স্বদেশবাসী, 'যবন' মুসলমান 'পরদেশী।' হিন্দু স্বভাবতঃ 'মহৎ' মুসলমান স্বভাবতঃ নীচ। হিন্দু দেশমাতার সন্তান, বিধর্মী মুসলমান অত্যচারী পররাজ্য লোভী-- হিন্দু নারী সতীত্ব গৌরবে গৌরবান্বিতা, যবনী মুসলমান নারী সতীত্বহীনা। 'রাজসিংহ', 'আনন্দ মঠ' 'সীতারাম 'মৃণালিণী,' 'দুর্গেশ নন্দিনী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠকের

www.pathagar.com

মনে এই সকল ধারণাই সৃষ্টি করে। রাজসিংহের মুসলমান বাদশাহের (ঔরঙ্গজেবের) চিত্র অত্যন্ত হীনতাসূচক। বেগম শাহজাদীদের চিত্র দেখিয়া ঘৃণায় মুখ বিকৃত হইয়া আসে।" [ঐ]

বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট এর পৌত্তলিক প্রবণতাও উক্ত প্রথম বৈশিষ্টের সম্পূরক। ঘোর পৌত্তলিকতা বিরোধী, একেশ্বরবাদী ইসলামের প্রতি তীব্র ঘৃণাবিদ্বেষ স্বভাবতঃই বঙ্কিমের পৌত্তলিক প্রবণতাকে উসকে দিতে সাহায্য করেছে। বঙ্কিমের দেশপ্রেমিক সন্তান সংস্থা দেবীমূর্তির সামনে দীক্ষা গ্রহণ করত। মুসলমান বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর স্থান সেখানে ছিল না। এও একটি গুরুতর কারণ, যে জন্য এই জাতীয়তাবাদ সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহণ করতে পারেনি। পরবর্তীকালে সংগঠিত হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় কংগ্রেস, মুসলিম বিদ্বেষের পটভূমিকায় রচিত পৌত্তলিতসমৃদ্ধ "বন্দে মাতরম" সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত রূপে গ্রহণ করে এবং এই ভাবে তার সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ার দাবী সরবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এই হিন্দু সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত "বন্দে মাতরম" কে স্বাধীনতা উত্তর কংগ্রেস শাসিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নির্বিশেষে সকলের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে-- যদিও মুসলমান সমাজের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রবল প্রতিরোধের মুখে প্রাগ স্বাধীনতা যুগে-- অর্থাৎ বৃটিশ শাসনামলে-- হিন্দুরা অনেক সময় সাময়িকভাবে অথবা আংশিক ভাবে হলেও "বন্দে মাতরম" সঙ্গীত বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিল।

এও লক্ষ্যণীয় যে, বৃটিশ আমলে, ১৯০৫ সালে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার্থে যখন বিশাল আয়তন বাংলা প্রেসিডেন্সী (বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা) ভেঙ্গে "পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ" নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয় এবং এর ফলে হিন্দু 'বাঙ্গালী' কর্তৃক বিভিন্ন প্রকারে শোষিত নির্যাতিত ও বঞ্চিত বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা এই শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনা হতে নিষ্কৃতি লাভের সুযোগ লাভ করে, তখন কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দু সম্প্রদায় 'বঙ্গমাতা'র অঙ্গচ্ছেদের এবং 'বাঙ্গালীদের বিচ্ছিন্ন ও দূর্বল করার অজুহাতে সন্ত্রাসবাদী বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন শুরু করে। এইসব সুসংগঠিত আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে দিল্লী দরবারে নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' বাতিল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পুনরায় 'বঙ্গভঙ্গ'-- পূর্ব সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত হয়।

এও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই প্রথম পর্যায়ের সন্ত্রসবাদী আন্দোলন মুসলিম বিদ্বেষজাত বঙ্কিমের 'আনন্দ মঠে'র ভাবধারা এবং আদর্শ হতে

www.pathagar.com

সবিশেষ প্রেরণা লাভ করে এবং বঙ্কিমের সেই কুখ্যাত সঙ্গীত 'বন্দোমারম' এদের সংস্থার শ্লোগান রূপে গ্রহীত হয়।

সফল 'বঙ্গবঙ্গ' রদ আন্দোলনের পরে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানে ১৯২০ সালে যখন মিঃ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বৃটিশ শক্তির মোকাবিলায় ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয় এবং ইউপির চৌরি চৌরার হত্যাকাণ্ডে আতঙ্কগ্রস্ত মিঃ গান্ধী ১৯২১ সালের জানুয়ারীতে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করেন, তখন দ্বিতীয় পর্যয়ের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে ওঠে। "এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও বঙ্কিমের আনন্দ মঠের জাতীয়তাবাদের আদর্শ হতে অনুপ্রেরণা লাভ করে। ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্যসেন ও পূর্ণেন্দু দস্তিদার, পুলিন দাস, অনন্ত সিং প্রমুখ সন্ত্রাসবাদীরাও 'আনন্দ মঠে'র "সন্তান সংস্থার অনুকরণে কালী মূর্তির সামনে অস্ত্রহাতে দীক্ষা গ্রহণ করতো। বঙ্কিম চন্দ্র 'আনন্দ মঠে'র যে প্রতিজ্ঞার নমুনা দেখাইয়াছেন বিপ্লববাদীরাও যে প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে তাহার কতকটা অনুকরণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।"

(বাংলায় বিপ্লববাদ-শ্রী নলীনী কিশোর গুহ-পৃঃ ৭৭-৮৭)

পুলিন বাবু তার দীক্ষা ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে,

"এক বেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া পি, মিত্রের বাড়ীতে তাহার নিকট হইতে দীক্ষা লইলাম। ধূপ, দীপ নৈবেদ্য, পূজা, চন্দনাদি সাজাইয়া ছান্দোগ্যপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পি, মিত্র যজ্ঞ করিলেন, পরে আমি আলীড়াসনে বসিলাম, আমার মস্তকে গীতা স্থাপিত হইলে, তদুপরি অসি রাখিয়া, উহা ধরিয়া পি মিত্র আমার দক্ষিণে দণ্ডয়মান হইলেন। উভয় হস্তে উহা ধারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নি সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞাগ্নিকে ও পি মিত্রকে নমস্কার করিলাম।" [ঐ]

পুলিন বাবু নিজেও অনুরূপ পদ্ধতিতে দীক্ষা দিতেন। তিনি বলছেনঃ

"পি মিত্র যে পদ্ধতিতে আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন, গুপ্তচক্রের মধ্যে আবস্থান গ্রহণ করিবার পূর্বে আমিও অনুরূপ পদ্ধতিতে আমার বাসায় দীক্ষা দিতাম।"

"এক সঙ্গে অনেককে দীক্ষা দিতে হইলে ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে পুরাতন ও নির্জন সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে যাইয়া একটু জাঁকজমক করিয়াই দীক্ষা দিতাম। অর্থাৎ সংযম, উপবাস, হবিষ্যাণ্ন গ্রহণ করিয়া শুদ্ধচিত্রে কালী মূর্তির

www.pathagar.com

নিকট আলীড়াসনে বসিয়া মস্তকে গীতা ও অসি ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতাম।" (ঐ)

"এই সকল প্রতিজ্ঞা বা দীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে বঙ্কিমের 'আনন্দ মঠের' অনুকরণ লক্ষ্য করিবার।"(ঐ)

এই সন্ত্রাসবাদীরা মুসলিম বিদ্বেষে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত ছিল এবং এই সংগঠনে সাধারণভাবে মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল সে মুসলমান যতবড় কংগ্রেসী বা 'অখণ্ড ভারতের' পূজারী হোক না কেন। সূর্যসেন পরিচালিত এই বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় চট্টগ্রামের সদরঘাটে একটি জিমন্যাসটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই ক্লাবে কোন মুসলমান মেম্বার হতে পারতেন না। জিমন্যাসটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এহেন ঘোরতর সাম্প্রদায়িতার প্রতিবাদে মুসলমানরা বাধ্য হয়েই চট্টগ্রামের মাদারবাড়ীতে আলাদা একটি জিমন্যাসটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠান করেন। অসাম্প্রদায়িতকার জন্য খ্যাতিমান প্রসিদ্ধ কম্যুনিস্ট নেতা কমরেড মোজাফফর আহমেদের ভাষ্য অনুযায়ীঃ "সূর্যসেনের অনুশীলন দল ছিল, বঙ্কিম চন্দ্রের 'আনন্দ মঠের' আদর্শের অনুসারী, পুনরুত্থানের আন্দোলন।... সূর্যসেনের 'অনুশীলন' দলের অনুশাসনে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়ে হয়েছে কোন মুসলমানকে দলে ভর্তি করা হবে না। এক বা দুই বৎসরের মধ্যে সমগ্র মুসলিম জাতি হিন্দুদের বশীভুত হয়ে যাবে।" (কমরেড মোজাফফর আহমদ-- আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি।)

উল্লেখ্য, সূর্যসেনের দল চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে, বলপূর্বক একজন মুসলিম ড্রইভারকে গাড়ীসহ ধরে নিয়ে যায়। লুণ্ঠন শেষে প্রত্যাবর্তনকালে এরা এই মুসলিম ড্রাইভারের চোখে-মুখে এসিড নিক্ষেপ করে । ফলে অন্ধত্বপ্রাপ্ত এই হতভাগ্য মুসলিম ভিক্ষুকের অবস্থায় পতিত হয়।

উল্লেখ্য, এই সময়ে চট্টগ্রামে মুসলমানদের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সূর্যসেনের দল এই সময়েই কয়েকটি দোকানপাট লুঠ করে। যাতে মুসলমানদেরে এই দুষ্কর্মের জন্য দায়ী করা হয়-- সেই 'মহৎ উদ্দেশ্যেই এরা ঘটনাস্থলে কতগুলো টুপী ফেলে যায়।' অবশ্য পরবর্তীকালে তদন্তে এই চালাকি ধরা পড়ে।

মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা সাধনের ব্যাপরে হিন্দুরা যে কতদূর হিংস্র, বিশ্বাসঘাতক ও ন্যায়নীতিবিহীন এবং এইসব তথাকথিত হিন্দু দেশপ্রেমিক সংস্থার মনমানসিকতা কি ভীষণভাবে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট, উপরোক্ত ঘটনাবলী তার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে এও উল্লেখ্য, এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী, তথা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতা সংগ্রামী(?) দেশপ্রেমিক(?) সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম,

www.pathagar.com

সূর্যসেনের সহকারী অনন্ত সিং ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা অর্জনের পরে স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ডাকাতি ও নরহত্যার অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। বঙ্কিমের আদর্শানুসারী রবীন্দ্রনাথের সমর্থনপুষ্ট এইসব তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদের নৈতিকতার এ এক অপূর্ব নিদর্শন বটে!

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য. . . ব্রিটিশ তোষণ. . . ব্রিটিশ শাসক-শক্তির নিকট গোলামীসূলভ নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ ও ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজমের নির্লজ্জ প্রশস্তি কীর্তন ।

"আপতঃদৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হইলেও ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য যে, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজমের হাতে অতি চমৎকারভাবে নাচিয়াছিলেন।"

(ইতিহারে রূপন্তার ও ভারতীয় ইতিহাসের একদিকঃ ফজলুল করিমঃ মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৪৬ সাল সংসক্তি ক।)

"আনন্দ মঠ' প্রভৃতি তার উপন্যাসেগুলিতে এই সত্য অত্যন্ত নির্লজ্জ ও নিষ্করণভাবে উদঘাটিত।"

"যে জাতীয়তাবোধ সন্তানদিগকে দেশোদ্ধার কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহার অনুপ্রেরণা আসিয়াছিল মুসলিম বিদ্বেষ হইতে। নেড়ে মুসলমানদের প্রাধান্য নষ্ট করাই এই জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য। ইংরাজ রাজনীতির উদ্দেশ্যও তাহাই। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের স্রোত সগর্জনে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে বিলীন হইল ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজমে। বঙ্কিম জাতীয়তাবাদের চরম আদর্শ স্থাপন করিয়া মহাপুরুষ প্রমুখাৎ দৈববাণী প্রকাশ করিলেন, "শত্রু কে? শত্রু আর নাই।" (কারণ মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে) "ইংরেজ মিত্র রাজা।" (১৭৫৭ সালে হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীগণ কর্তৃক ইংরেজ ক্লাইভকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান. . . ১৮৮৬ সালে প্রথম ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন ইংরেজকে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান আলান অক্টোভিয়াম হিউমকে প্রেসিডেন্ট পদ প্রদান, ১৯১১ সালের দিল্লী দরবারে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান "জনগণ মন অধিনায়ক, জয়হে'র মাধ্যমে ইংরেজ রাজা পঞ্চম জর্জের পূজা-অর্চনা এবং ১৯৪৭ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজার জ্ঞাতিভ্রাতা ইংরেজ লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতে প্রথম গভর্নর জেনারেলের পদে বরণ-এ সকলই হিন্দু জাতীয়তাবাদের ইংরেজ তোষণ এবং ইংরেজ মৈত্রীনীতি তথা গোলামসুলভ নীতি তারস্বরে ঘোষণা করে।)

"আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয় এমন শক্তি কাহারও নাই।" (হিন্দু জাতীয়তবাদীদের সংগ্রামী চেতনা এবং মিঃ গান্ধীর আইন অমান্য ও অসহযোগ নীতির একটা গৌরবজনক ব্যঞ্জনা বটে!) 'ইংরেজ বিজয়ী হইয়াছে। মুসলমান

www.pathagar.com

রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে।" (হিন্দু জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য) "অধর্মের পত ন হইয়াছে।" (মুসলমান মানে অধর্ম-যেমন আর্য. . . হিন্দু না হইলে সে অসুর বা যবন) "ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" (কারণ ইংরেজের স্তর-স্তুতিই স্বার্থোদ্ধারের সহায়ক) "ইংরেজ আনুগত্যই এখন সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়।" (কারণ ইংরেজের বিরুদ্ধে জয়ের আশা নাই।) (আনন্দ মঠ) এতএব, জাতীয়তাবাদীদের করিবার কিছুই নাই। দেশোদ্ধার ব্রতী সন্তান দল ছত্রভঙ্গ হইল।'

"এতএব, এসো ভাই তেলো হাই, শুয়ে পড় চিৎ/অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত/ গোলামী মাত্র সত্য আর সত্য কিছু নয়॥

ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের নুন নিমর্ক খাইয়াছিলেন। নিমকহারামী তিনি করেন নাই।" (ইতিহাসের রূপান্তর ঐ)

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডাঃ সুশীর গুপ্তের সুচিন্তিত অভিমত বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় . . .

"ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের বর্ণনায় দেশপ্রেমের যে রূপ ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে নজরুলের স্বদেশ প্রেমমূর্তির স্বাতন্ত্র্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। এই সাহিত্য রথীগণের অধিকাংশই পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তারা এসেছিলেন মধ্যবিত্ত বা জমিদার পরিবার থেকে। জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ ছিল না।" "অন্যান্য ধুরন্ধরেরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসন সুব্যবস্থার মধ্যে থেকেই সম্ভব মতো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা ভোগ করতে। ইংরেজ শাসনের পূর্ণ অবসান তো তারা চানই-নি, বরং তাদের কেই কেউ ব্রিটিশ রাজশক্তির রক্ষায়ও তার জয় কীর্তনে তৎপর ছিলেন।" (ডাঃ সুশীর গুপ্ত ঃ নজরুল চরিত মানস। পৃঃ ১২৪-২৫)

"যখন পড়ি নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে তার (কবি ঈশ্বরগুপ্তের) আবেদন এবং পরে রাজভক্ত প্রজার উক্তি. . . "রাজ বিদ্রোহিতা কারে বলে স্বপ্নে জানিনে/কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি/তোমার জয়ের বাসনা।" তখন বুঝতে বাকী থাকে না যে, তার স্বদেশপ্রেম নেহাতই রোমাণ্টিক ভাবুকতা। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" ইত্যাদি রচনার মূলেও রয়েছে সেই একই স্বদেশপ্রেম। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমও মনে সাময়িক উত্তেজনার প্রকাশ মাত্র। স্বদেশপ্রেমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্য 'আনন্দ মঠে'র প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমন্দ্র তো খোলাখুলিই বলেছেন, "সমাজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা

www.pathagar.com

আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাংলাদেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" (ডাঃ সুশীল গুপ্ত ঐ পৃঃ ১১৬) ইহাই ছিল বঙ্কিমের তথা বর্ণহিন্দু বাঙ্গালী সমাজের জাতীয়তাবাদের আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্য-বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের অন্যতম মূল ভিত্তি-- বাঙ্গালী স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের উদগাতা হিন্দু সমাজের সাধারণ মানসিকতা।

উল্লেখ্য, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র কয়েক বছর আগে ১৮৫৩ সারে বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট রাজা রাধাকন্ত দেব তার ভাষণে বলেন, "একথা বলতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ভারতের এই অংশের হিন্দুগণ সব সময়েই বৃটিশ রাজমুকুটের প্রতি ভক্তি ও বশ্যতা প্রদর্শন করেছে. . . ইহার শ্রীবৃদ্ধিতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে।" ঐ

ইহাই প্রতিনিধি স্থানীয় হিন্দু মানসিকতা তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য-যার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার বঙ্কিমচন্দ্র এবঙ তারই উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ।

লক্ষ্যণীয় যে, হিন্দু জাতীয়তাবাদের তথা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিন্দুদের ছিল এই হীনমন্যতাসূচক মানসিকতা ও ন্যাক্কারজনক কার্যক্রম, যখন সমগ্র ভারতের মুসলিমগণ অত্যল্পকাল পরেই ১৯৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের জীবন-মরণ সংগ্রামে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র হস্তে অবতীর্ণ হয় এবং এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পরেও আরও দশ-পনের বছর ধরে মুসলমানরা গুপ্তভাবে হলেও তাদের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

ইতিহাসের ট্রাজেডী, দেশেরও দুর্ভাগ্য, যেসব মহান আত্মত্যাগী মুসলিম নেতার মহান প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানের এই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছে, তাদের গৌরবোজ্জ্বল নাম মুছে ফেলে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে চরম মুসলিম বিদ্বেষী, মুসলমানের জাতশত্রু সেইসব হিন্দুদের নাম-যাদের লক্ষ্য আদর্শ এবং সকল প্রচেষ্টারই উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জাতির স্বাধীনতা হরণ, মুসলমানদের চিরতরে পদানতা করে রাখা, মুসলমানদের ধর্মীয় কৃষ্টিয় সকল সত্তা যেকোন ভাবেই হোক, বিনষ্ট করা যেমন করে জাতি হিসাবে তারা ধ্বংস করতে পেরেছে, এই উপমহাদেশের ঐতিহ্যশালী প্রাগ-আর্য জাতিসমূহকে।

এ প্রসঙ্গে একজন নামকরা ভারতীয় বর্ণহিন্দু সাংবাদিকের একটি নিবন্ধ থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিলে নেহায়েত অপ্রসঙ্গিক হবে নাঃ" শেষমেশ ১০ এপ্রিল ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে ডেকে নিয়ে ঘন্টা দু'য়েক ধরে কাতরভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, যাতে তিনি ভারতে বিভাগের জন্য জেদ না করেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রাজার এই দাম্ভিক জ্ঞাতিভ্রাতা চরম এবং শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন ক্ষয়রোগগ্রস্ত মৃত্যু পথযাত্রী মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর

www.pathagar.com

কাছে। আসলে জিন্নাহর অদম্য ইচ্ছা শক্তির কাছে মাউন্টব্যাটেনকে আত্মসমর্পণ করতেই হলো। পরের দিন ১১ এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন তার চীফ অব স্টাফ লর্ড ইসমেকে ভারত বিভাগ করতে বললেন। এই খসড়ায় ভারত বা পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে কোন প্রদেশের একক স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা ছিল যার ফলে তখনই অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি হতে পারেতো।

"১৯৪৭-এর ২০শে জুন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর অধিবেশন বসলো সদস্যদের মতামত জানবার জন্য যে, তারা ভারতীয় কনিষ্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীতে যোগ দেবেন, না নতুন ও পৃথক কনষ্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীতে যোগ দিবেন। এ্যাসেম্বলীতে সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম সদস্যরা একযোগে ভোট দিলেন তারা ভারতীয় কনষ্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীতে যোগ দেবেন না, নতুন ও পৃথক কনষ্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীতে যোগ দিবেন।এই নতুন ও পৃথক কনিষ্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীই হলো পাকিস্তান কনষ্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী। বাংলার মুসলমান এ্যাসেম্বলী সদস্যরা সেইদিন স্বেচ্ছায় অন্যের বিনা প্ররোচণায় নিজেদের স্বাধীন চিন্তায় পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলেন।"

"বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবার জন্য আমরা ভারতীয় কৃতিত্বের দাবী করি এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সেই জন্য এই সময়ে 'এশিয়ার মুক্তিদূত বলে' ও অভিহিত করা হোত। কিন্তু. . . যে লোকটির জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারলো, তার নাম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পূর্ব বাংলার মুসলমানরা জিন্নাহর আহ্বান অগ্রাহ্য করে যদি পাকিস্তানে যোগ না দিতেন এবং তারপর দশ-বিশ বছর বাদে. . . যে কারণে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেন অর্থাৎ ভাষা পার্থক্যের জন্য ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে চাইতেন, তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা 'বাঙ্গালীরা' কি ফুলের মালা দিয়ে পূজা করতাম, না রাস্তার কুকুরের মত গুলি করে মারবার দাবী জানাতাম? পাকিস্তানে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপরে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবী জানালে পাকিস্তান পূর্ব বাংলায় যে অত্যাচার করেছে, আমাদের ভারতে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপর ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হবার দাবী জানালে ভারত পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের চেয়ে বেশী না হোক, কম অত্যাচার করত না। ভারতের মত শক্তিশালী দেশের সাথে লড়াই করবার জন্য ক্ষুদ্র পাকিস্তান বা পৃথিবীর কোন দেশের কার্যকরী সাহায্য পূর্ব বাংলার লোকেরা পেতেন না। ভাগ্যবশতঃ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল, তাই খুবই সহজেই স্বাধীন হতে পারলো. . . না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দূর-দিগন্ত হয়েই থাকতো। ১৯৪০ এ লাহোরের পাকিস্তান প্রস্তাবে জিন্নাহ একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই দেকেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন

www.pathagar.com

হয়ে জিন্নাহর সেই স্বপ্নই সফল হল" বাংলাদেশ গঠনে কৃতিত্বকার ইন্দিরা, মুজিব না জিন্নাহর। বিমলানন্দ শাসমল অমৃত বাজার ২২/৯/৭৮ সংসক্তি খ।

. . . ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগ তথা পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য আল্লামা ইকবাল, মিঃ জিন্নাহ, মাওলানা মোহম্মাদ আলী, শহীদ সাইয়েদ আহমেদ বেরলবী, শাহ ইসমাইল শহীদ, স্যার সাইয়েদ আহমেদ প্রমুখের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান যেরূপ অনস্বীকার্য, তেমনি পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি বাংলাদেশও তার স্বাধীনতার জন্য এইসব মুসলিম মনীষীদের ঋণও তেমনি অনস্বীকার্য। এ ঋণের অস্বীকৃতি চরম অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। কিন্তু আমরা আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজ জীবন থেকে তাদের নাম ও স্মৃতি পর্যন্ত নির্বাসিত করে ঋণের প্রতিদান দিয়েছি এবং তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছি ঘোর মুসলিম বিদ্বেষী (ফলে পাকিস্তান এবং পরিনামে স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তির চরম বিরোধী) বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ও সূর্যসেনদেরে। আশ্চর্য! সলিমুল্লার দান সমৃদ্ধ এবং তারই প্রচেষ্টার গঠিত ১৯০৫ সালের বঙ্গাসাম প্রদেশের রাজধানী এ ঢাকাতেই সগৌরবে উদযাপিত হয় সূর্যসেন জন্ম শত বার্ষিকী (২২/৩/৯৪) যে সূর্যসেন ও তার সন্ত্রাসীদল ছিল চরমভাবেই মুসলিম বিদ্ধেষী। (সূর্যসেন ও তার দলের সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রামের পুলিশ অফিসার খান বাহাদুল আহসান উল্লাকে হত্যা করেছিল- যেহেতু তিনি ছিলেন মুসলিম। চিটাগাং অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রাক্কালে এবং আহমদ নামক একজন মুসলিম ড্রাইভারকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় এবং কার্যশেষে তার মুখে এসিড নিক্ষেপ করে তাকে অন্ধ করে দেয়। "জালালাবাদ পাহাড়ের ঢালে যখন . . . ২৮ মডেলের ট্যাক্সীটা উৎরাইয়ে আর উঠতে পারছিলনা তখন যশোদা বাবু ড্রাইভার আবদুল সাত্তারের গালে এক ঘুষি মেরে বলেছিলেন 'হারামজাদা কাডাইলের বাচ্চা মুছুয়াল্যা-" (বিদ্বেষমূলক চাটগামী ভাষায় কাডাইল মানে মুসলমান, হেয় করে হিন্দুরা মুসলিমদের এনামে ডাকতো" -শওকত উল আলম চাটগামী-সংগ্রাম - ৬/৪/৯৪।

আরও আশ্চর্য্য যে এই শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দেন কতিপয় মুসলিম নামধারী বিচারপতি এবং এই ঢাকারই মুসলিম প্রধান এলাকার প্রথম নির্বাচিত মেয়র (১৯৯৪) সেই আগের আমলের একজন সর্দারের জামাতা! ঢাকাবাসী কী নবাব সলিমুল্লাহর অবদানের কথা একদম বিস্মৃত হয়েছেন! তারা কী বিস্মৃত হয়েছেন দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসীনের কথা- সংগ্রামী শহীদ তিতুমীরের কথা! কই এসব দেশ বরেণ্য মুসলিমগণের জন্মবার্ষিকীতে তো এদের কথা শোনা যায় না!

www.pathagar.com

গোমরাহি মূর্খতা আর কাকে বলে? গাদ্দারী বা আর কাকে বলে? মীর জাফরের প্রেতাত্মাও বুঝি লজ্জায় মাথা নীচু করে!

প্রশ্ন জাগে, আত্মবিস্মৃত এই মুসলিম জাতি কি এদেশের পরাজিত, আত্মবিস্মৃত, অবক্ষীয়মান প্রাগ আর্য-জাতিসমূহের ন্যায় নিজেদের বিস্মৃতি-বিভ্রান্তি ও বিলুপ্তির পথেই পরিচালিত করবে?

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ : মুসলিম বিদ্বেষ

(এক)

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র প্রদর্শিত পন্থাই অবলম্বন করেছে- যার উৎস ও অনুপ্রেরণা হচ্ছে মুসলিম বিদ্বেষ, যার অবলম্বন হচ্ছে পৌত্তলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ- যার নীতি ছিল বৃটিশ তোষণ এবং যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লক্ষ্য ছিল মুসলিম শোষণ, মুসলিম নিপীড়ন এবং মুসলমানদের ধ্বংস সাধন যদিও তা সব সময়ই বঙ্কিমচন্দ্রের মত অতটা মুখর বা নগ্নভাবে প্রকট ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্ট বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। তিনি বিভিন্ন প্রকারে এই সব আন্দোলনে সমর্থন দান করেন।

"বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সত্যিকার 'স্বদেশ চেতনা' জাগায় বঙ্গভঙ্গ নিবারণ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ তার কবিতা- সংগীত ও প্রবন্ধে দেশের 'মুক্তি আকাংক্ষাকে' ভাষা দিলেন।"(ডাঃ সুশীল গুপ্ত নজরুল চরিত্র মানস- পৃঃ ৪৭৯)

১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনের সমর্থনে বাংলাদেশে বর্ণবাদী, মুসলিম বিদ্বেষী 'বাঙ্গালী' জাতীয়তাবাদীদের একাংশ. . . সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পরিচালনা করে। অনুরূপ মুসলিম বিদ্বেষের পটভূমিকায় ১৮৯৬ সালে মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক সংগঠিত হয় 'শিবাজী উৎসব' আন্দোলন। এই মুসলিম বিদ্বেষী 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীরা' মুসলিম বিদ্বেষে আয়োজিত এই 'শিবাজী উৎসব' হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

"মারাঠা দেশে এই আন্দোলনের (অর্থাৎ শিবাজী উৎসব আন্দোলনের) নেতা ছিলেন দামোদর হরিচাপেকার ও রামকৃষ্ণ হরি চাপেকার। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ যখন বারোদা কলেজের অধ্যাপক, তখন তিনি চাপেকারদের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী মতে দীক্ষিত হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলায় বিপ্লবী দল গঠনের সংবাদ পেয়ে যতীন্দ্র নাথ মুখার্জী এবং অরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে কলিকাতা ও মারাঠার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পাঠান। ক্রমে ক্রমে বাংলার দলের সঙ্গে যুক্ত হযে পড়েন যোগেন্দ্র বিদ্যাভুষণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, (রবীন্দ্র নাথের ভাই) অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিবনাথ শাস্ত্রী। (স্বাধীনতা সংগ্রামে চটটগ্রামঃ পূর্ণেন্দু দস্তিদার-- পৃঃ ৫৬)

মারাঠাদের 'শিবাজী উৎসব' হতে বাংলার এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণা লাভ এবং মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্ট এই উভয় আন্দোলনের সাথে রবীন্দ্রনাথের

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিশ্ব কবির সাম্প্রদায়িক মানসের পরিচয় অত্যন্ত নগ্নভাবেই প্রকাশ করেছে, যার অকাট্য নির্ভুল নিদর্শন রয়েছে তার এই সময়কার কবিতাসমূহে।

"এই সকল রচনা এমন সাম্প্রদায়িক কলুষক্লিষ্ট যে, জাতীয় স্বাধীনতার সাংগ্রামে সকল শ্রেণীদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করতে স্বতঃই হয়েছে ব্যর্থ।" (আবদুল কাদিরঃ তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ-- পৃঃ ৩০৪)

এসব মুসলিম বিদ্বেষী হিংসাত্মক হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে. . . যেমন 'শিবাজী উৎসবের' সাথে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং তার সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রভক্ত, প্রখ্যাত সমালোচক ও সাহিত্যিক কাজী আবদুল অদুদ সাহেবের ভাষ্যঃ

"হিন্দু জাতীয়তা 'শিবাজী উৎসব' আন্দোলনের দ্বারা যে আরও শক্তিমন্ত হয় . . . তা বলাই বাহুল্য । কংগ্রেসেও সেই ছোঁয়া লাগে . . . সেখানে গরম দলের আবিভাব হয়। 'শিবাজী উৎসব' আন্দোলন বাংলার (হিন্দু) স্বদেশী আন্দোলনে যথেষ্ট অবেগ সঞ্চার করেছিল। অবশ্য সে অবেগ মুখ্যতঃ হিন্দু জাতীয়তাবাদের আবেগ।" (কাজী আবদুল অদুদঃ বাংলার জাগরণ পৃঃ ১৭৬)

অদুদ সাহেব খানিকটা রেখে ঢেকে বললেও, মোদ্দা কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ- তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্বার্থে মুসলিম স্বার্থ নস্যাৎকারী বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনের সমর্থনে সকলের পুরোভাগে। ১৯০৬ সালে এই অন্দোলনের প্রথম সভার প্রেসিডেন্ট পদ তিনিই অলংকৃত করেছিলেন।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদঃ মুসলিম বিদ্বেষ

(দুই)

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'মারাঠা বন্দনা' সম্বন্ধে তার বিখ্যাত 'শিবাজী উৎসব' কবিতা। এতে ঘটেছে তার সাম্প্রদায়িক মানসের অত্যন্ত লজ্জাকর প্রকাশ। যারা 'সোনার বাংলা' হত্যা, ধ্বংস, লুণ্ঠন, ধর্ষণ প্রভৃতি পৈশাচিক কার্যকলাপের হোতা, যাদের লোমহর্ষক অত্যাচারের বিভীষিকা আজও বাংলার নর-নারীকে নিদ্রাতেও আতঙ্কগ্রস্থ করে - সেই মারাঠা বর্গী আগ্রাসনবাদের প্রশস্তি গাইতে বাংলারই জনদরদী কবি রবীন্দ্রনাথ নিয়োজিত করলেন তার অপূর্ব কাব্য প্রতিভা এইবলে-

"এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন কবির সম্বল।"

"এক ধর্মরাজ্য পাশে খন্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দেব আমি।"

"আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব/একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব/এক পুন্য নাম।" ('শিবাজী উৎসব'-রবীন্দ্রনাথ।)

এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে লুণ্ঠন, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চনাভিত্তিক শিবাজীর রাজ্যই ধর্মরাজ্য, বর্গী হাঙ্গামা-খ্যাত মারাঠা রাজ্যই ধর্মরাজ্য। যে শিবাজীর-যে মারাঠাদের অত্যাচার লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিল শুধু আলীবর্দী ও বাংলার মুসলমানই নয়-বাংলার হিন্দু, রাজপুতনার হিন্দু, উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল জনগণই-যে মারাঠাবর্গী অত্যাচারের কাহিনী আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে বাংলার গ্রামবধূর শিশুদের ভীতিসঞ্চারী ঘুমপাড়ানী গানে "ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছেখাজনা দেবকিসে।" -সেই অত্যাচার আর ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী, বঙ্গের 'কবি সম্রাট' রবীন্দ্রনাথের জমিদারী কর্ণকুহরে কি কোন দিন প্রবেশ করেনি যে, তিনি এ সবই ধামাচাপা দিয়ে সেই মারাঠাদের নির্লজ্জ চাটুকারিতায় 'বিশ্বকবির' কাব্য প্রতিভার দীপ্তি প্রদর্শন করলেন এইভাবে, "তোমার কৃপাণ দীপ্তি একদিন যবে, চমকিলা বঙ্গের আকাশে-সে ঘোর দুর্যোগ দিনে, না বুঝি রুদ্র সেই লীলা ; লুকানু তরাসে। তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি, চিনেছি হে রাজন, তুমি মহারাজ। তব রাজকর লয়ে আটকোটি বঙ্গের সন্তান দাঁড়াইবেআজি।"

এ কোন বঙ্গের সন্তান? আলীবর্দীর? সিরাজউদ্দৌলার? মীর কাশিমের? মোহনলালের?

www.pathagar.com

এ কোন লীলা? অনাচার, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞ এসব কী শ্রীকৃষ্ণের রামলীলায় রূপান্তরিত হল? এই কি "নমো, নমো, নম, সুন্দরী মম, জননী বঙ্গভূমি'র কবির পরিচয়? জননী 'বঙ্গভূমি' কি শুধুই এই দেশেরমাটি গাছপালানদী-নালাসর্বস্ব! মানুষগুলো –হিন্দু-মুসলমান, এদের সুখ দুঃখ কি কিছুই নয়? ধিক্ রবীন্দ্রনাথ! শতধিক রবীন্দ্র মানস পূজারী বৃন্দ। [সংসক্তিছ মহারাষ্ট্র পুরান-]

এই দেশপ্রেম - জাতীয়তাবাদ ডাঃ সুশীল গুপ্তের ভাষায় "কি শুধুই রোমান্টিক ভাবুকতা?"

নিজেদের স্বাধীনতা স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে ভিনদেশের অত্যাচারী শক্তির বশ্যতা স্বীকার করে রাজকর যোগানোর পরামর্শই কি এই দেশে বসবাসকারী কোটি কোটি স্বদেশবাসীর জন্য বঙ্গের কবির সর্ব শ্রেষ্ঠ বাণী? মারাঠা বর্গী কর্তৃক নিপীড়িত নিগৃহীত বঙ্গবাসীর প্রতি প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি দূরে থাক, এই কি তার মানবিকতা বোধের পরিচয়? তবু ও কি তিনি এই দেশবাসীর শ্রদ্ধা ভালবাসা দাবী করতে পারেন?

অখন্ড ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার অগ্নিঋষি-বঙ্কিমের ভাবশিষ্য রবীন্দ্রনাথও তার জাতীয়তাবাদের আদর্শ যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এমনি কি অস্তিত্বের জন্যও সর্বতোভাবে বিপদজ্জনক সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ এর পরেও কি থাকতে পারে? এরপরে ও কি তিনি শতকরা পঁচাশি জন মুসলিম অধ্যুষিত এই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় কবির আসন লাভ করতে পারেন? বর্তমানে খন্ডিত ভারতে সংখ্যালঘু নিপীড়ন নিধন, হরিজন নামে অভিহিত কোটি কোটি মানব সন্তানের প্রতি পাশবোচিত অত্যাচার, আহমেদাবাদ, জামসেদপুর, আলীগড়, বোম্বাইতে মুসলিম গণহত্যা, মুসলিমদের ধর্মীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান- মসজিদ কলেজ প্রভৃতি জাতীয়করণের নামে 'হিন্দুকরণ', গো জবেহ নিষিদ্ধকরণ, ঐতিহাসিক জুম্মা মসজিদে মুসলমানদের নামাজ আদায় করায় নিষেধাজ্ঞা, স্থানে স্থানে আজানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা, রাষ্ট্রিয় পর্য্যায়ে ষড়যন্ত্র করে বাবরী মসজিদ ধ্বংস, শিখদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম মন্দির অমৃতসরের শিখ স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সৈন্যের হামলাও দখল- এইসমস্ত পুণ্যকর্ম্ম করে আর্য-'হিন্দুরা' কবির কল্পিত অখন্ড ভারতে হিন্দুধর্ম রাজ্যের স্বরূপ বেশ নির্ভুলভাবেই প্রকাশ করছে।

যে 'ইত্তেফাক' একসময়ে পূর্ব্ব পাকিস্তানে ভারতীয় কয়লা আমদানী করার পক্ষে জোর ওকালতি চালিয়েছিল এবং যে 'ইত্তেফাকের' এ সংক্রান্ত সম্পাদকীয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে কলিকাতার কাগজগুলো পূর্ব বাংলার সাথে পশ্চিম বাংলার বাণিজ্য সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করেছিল, বর্তমান প্রসঙ্গে সেই ইত্তেফাকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ "ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসকে বাদ

www.pathagar.com

দিয়ে ভারতীয় মুসলমানেরা যে জনতা সরকারকে সমর্থন দিয়েছিল তাহারও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি মুসলমানদেরই থাকবে। কিন্তু দেশাই সরকারের ভারতীয়করণের উদ্দেশ্য যে অন্য কিছু, আলোচ্য আইন (আলীগড় মুসলিম ইউনির্ভাসিটি ভারতীয়করণের সংশোধন সম্বলিত বিল) পাসের মধ্য দিয়াই তাহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় মুসলমানরা যে ভারতীয় নয়, সে কথাটিই দেশাই সরকার তাহাদের এই তথাকথিত 'ভারতীয়করণের' মধ্য দিয়া প্রমাণ করিলেন। অথচ আলীগড় মুসলিম ইউনিভাসিটির পাশাপাশি রহিয়াছে বারানশী হিন্দু ইউনিভার্সিটি। কই, ইহাকে তো ভারতীয়করণের নামে হিন্দু শব্দটি উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই। তাহা হইলে দুইয়ে দুইয়ে চার হওয়ার মতই কি ধরিয়া লইব যে, ভারতীয়করণ আর হিন্দুত্ব সর্মার্থবোধক এবং ভারত সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি বচন আই ওয়াশমাত্র?'

(দৈনিক ইত্তেফাক ঃ সম্পাদকীয় ঃ শনিবার ২১ শে বৈশাখ, ১৩৮৬ ঃ ৫ মে, ১৯৭৯)

সুখের বিষয় যে, দেরীতে হলেও ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র 'রাম রাজ্যের' প্রকৃত রূপ নির্ভুলভাবেই প্রতিভাত হয়েছে।

বর্তমান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাভিত্তিক 'ধর্মরাজ্যে' সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার যে সর্বতোভাবে অপহরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই-তা সে দেশাই সরকারই হোক আর ইন্দিরা সরকারই হোক কিংবা বর্তমানের নরসীমা সরকারই হোক। বিশেষ করে ভারতের শাসনতন্ত্রে সংশোধনী এনে গো-রক্ষা আইনের নামে গরু জবাই নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে সংখ্যলঘু- (সম্প্রতি দিল্লীর প্রাদশিক সরকার ৩০/৩/৯৪ হতে সেখানে গরুজবাই, গরুর গোস্ত আনয়ন নিষিদ্ধ করেছে- ৫/৪/৯৪ সংগ্রাম-) মুসলমানদের নাগরিক এবং ধর্মীয় অধিকারের উপর অশোক স্তম্ভের মত এক জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এতদসঙ্গে ভারতে গণতন্ত্রের অকাল মৃত্যু ঘন্টা বাজানো হয়েছে। এখন ভারতীয় শাসনতন্ত্রে যা অবশিষ্ট রয়েছে, তা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার লেবেলধারী ভারতে হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের একনায়কত্বের দলিল, যা ভারতের বুকে অহিন্দু কোন নাগরিকের সপক্ষে কোন কথা বলার অধিকার দেয় না। সংক্ষেপে, হিন্দুকুশ পর্বতমালা হতে সুদূর আরাকান পর্যন্ত এক নিখিল রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন হিন্দু মহাসভার নেতারা শতাব্দীকাল ধরে দেখে আসছেন এই শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের অভিযানে প্রথম সফল পদক্ষেপ। তাই আল্লাহর বিশেষ রহমতই বলতে হবে যে, ভারত দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল যার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি আমাদের এই বাংলাদেশ। আর তাই সাতচল্লিশের এই

www.pathagar.com

পৃথকীকৃত সীমানা পাকিস্তান ভেঙ্গে একাত্তর সালে বাংলাদেশ সৃষ্টি সত্ত্বেও পাকিস্তানও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অটুট থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের বুকে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বাস্তবতার সাক্ষ্যদিচ্ছে।

বলাবাহুল্য, এইসব জ্ঞান চক্ষু উন্মীলনকারী ঘটনাসমূহ দ্বি-জাতিতত্ত্বের শুধু বাস্তবতা নয়-তার যৌক্তিকতাও প্রমাণ করে। সাথে সাথে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বাস্তবানুগ সমাধান অনুযায়ী দেশ বিভাগে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে শিবাজীর জাতীয়তাবাদের উত্তরসূরী রাবীন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ, তথা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ তথা উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক সম্প্রসারণবাদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হওয়া থেকে উপমহাদেশের মুসলানদের এক বৃহৎ অংশ যে পরিত্রাণ পেয়েছে সে সত্যও সমুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সাগ্রহে বরণীয় এই অতি আকাঙ্খিত বর্গী আক্রমণের আগাম খোশ-খবর দুর্ভাগ্যবশতঃ না পাওয়ার কারণে, নাকি বঙ্গ ললনাকুল 'মঙ্গলঘট' ভর্তি করে, শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি সহকারে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে এই ধ্বংসযজ্ঞের হোতাদের জামাই আদরে ধানদূর্বা দিয়ে বরণ করে ঘরে তুলে নিতে পারেননি। সেই মহা আফসোসের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে কবির কণ্ঠে, "সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে পায়নি সংবাদ, বাহিরে আসেনি ছুটে-উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে, শুভ শঙ্খনাদ।" ধিক্!

হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নর-নারীর আত্মসম্ভ্রম বোধ, স্বাধীন-সত্তা, স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টা এবং ইজ্জত হুরমতের প্রতি এ একটা ঘোর আপত্তিকর জঘন্য নির্লজ্জ আক্রমণ নয় কি? 'বিশ্বকবির' কাব্য প্রতিভার মতই হিমালয়সদৃশ অভ্রভেদী নয়কি এই অশালীন নির্লজ্জতার ব্যঞ্জনা?

'বঙ্গ ললনাকূল' কর্তৃক শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে এই বর্বর অত্যাচারীদের অভ্যর্থনা করতে না পারার পরম লোকসান তিনি এবার সুদে-আসলে পুষিয়ে নেবেন ঃ 'শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হতে এল নামি, করিল আহবান। মুহূর্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল হে স্বামী, বাঙ্গালীর প্রাণ।" এবং "মারাঠার সাথে আজি, হে বাঙ্গালী, এক কণ্ঠে বলো, জয়তু শিবাজী।" (রবীন্দ্রনাথ ঃ শিবাজী উৎসব)

এ কোন বাঙ্গালী? কোন বাঙাগলীর প্রাণ? সে বাঙ্গালী হতে পারেন রবীন্দ্রনাথ ও তদনুসারী সমগোত্রীয় বশংবদগণ, যারা বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের দাস্যসুলভ, মন-মানসিকতার সার্থক রূপায়ণে, 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি' ও 'বাঙ্গালী' জাতিয়তাবাদের ধূয়া তুলে বর্ণহিন্দু সমাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে- প্রভুভক্ত জীব বিশেষের মত লেজ নেড়ে আহলাদে–গদগদ, সে বাঙ্গালী কখনই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের এগারো কোটি তওহীদবাদী বাংলাদেশী নয়।

www.pathagar.com

শিবাজী এবং মারাঠাদের সম্বন্ধে বিশ্বকবির মূল্যায়ন, 'হে রাজ তপস্বী", "হে রাজ বৈরাগী", "অশরীরী হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্তি লয়ে" "তোমার তপস্বা তেজ" ইত্যাদি। যে মারাঠা-শিবাজীর পিতামহ মালোজীর নেতৃত্বে একটি দস্যুদল হিসাবেই নিজেদের প্রথম পরিচয় প্রদান করে; যে শিবাজী একটি বড় আকারের লুণ্ঠন বিদ্যাবিশারদ দস্যুপতি হিসাবেই সম্যক সার্থকতা লাভ করেন, যিনি বিপদে আশ্রয়দাতা-স্বধর্মীয় এক মারাঠা দুর্গাধিপতির বদান্যতায় আশ্রয় লাভ করে সেই দুর্গাধিপতিকে নৃশংসভাবে হত্যা করে আশ্রয়দাতার নুন নিমকের এই প্রতিদান দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার এক নজির বিহীন নজীর স্থাপন করেছিলেন, যিনি বিজাপুর সুলতানদের অনুগ্রহে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করে বিজাপুর সেনাপতি আফজাল খাঁকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করেন, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতাই ছিল যার রাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি এবং নিজ প্রজাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করাই ছিল যার শাসন প্রণালীর মৌলিকতা, সেই মারাঠা শিবাজী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'ধর্মরাজ্য', 'তপস্বী বীর'! ছলে-বলে-ষড়যন্ত্র এবং হত্যা-লীলার মাধ্যমে অর্জিত তার রাজ্য হল ধর্মরাজ্য! কিন্তু তিনি দেখতে পাননি শিবাজীরই সমসাময়িক মোগল রাজকুল তিলক শাহানশাহ আলমগীরকে যার কাছ থেকে শাহী সনদ লাভের অনুগ্রহের আশায় তার এই 'রাজ বৈরাগী শিবাজী' রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের সাথে সম্রাটের দিল্লী দরবারে কৃপা প্রার্থী হয়ে হাজির হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে যে আলমগীর প্রদত্ত রাজা উপাধিতে ভূষিত হয়ে গৌরবান্বিত হতে পেরেছিলেন, আসমুদ্র হিমাচল অখন্ড ভারতের সিংহাসনে উপবিষ্ট থেকেও যে আলমগীর প্রকৃতপক্ষে দরবেশের জীবন-যাপন করতেন এবং সাম্রাজ্যের সকল ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও টুপী সেলাই করে ও কোরআন শরীফ নকল করে নিজের ভরণ-পোষণ করতেন এবং মৃত্যুকালে যিনি এসব উদ্ধৃত্ত সামান্য অর্থও তার কাফন-দাফনের ও মৃত্যুর পরে লিল্লাহ জাকাতের জন্য ব্যয় করার অছিয়ত করে যান; মৃত্যুর পূর্বে যিনি অছিয়ত করে গিয়েছিলেন, 'এই মাটির জীবটিকে যথাসম্ভব শিগগির নিকটস্থ প্রথম গোরস্থানে সমাহিত করিও' (ঈশ্বরী প্রসাদ ঃ মুসলিম শাসনের ইতিহাস, পৃঃ ৬৪৬) এবং যিনি তার উইলে বলে দিয়েছিলেন যে, 'নিজ হাতে টুপী সেলাই করার মূল্য বাবদ যে চারি টাকা দু'আনা আছে, তাই যেন তার কাফনের জন্য খরচ করা হয়, কোরআন শরীফ নকল করার মজুরী বাবদ যে তিনশ' পাঁচ টাকা আছে, তা যেন ফকির-মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়' (ঐ)

তাই এহেন তাপস সম্রাটের রাজ্য ধ্বংস করে লুণ্ঠনসর্বস্ব অত্যাচারী মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হলে আর ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় না! এর পরেও কি বিশ্বকবির মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক মানস সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে?

www.pathagar.com

যাদের কাছ থেকে ইংরেজরা ছলে-বলে-কৌশলে রাজ্য অধিকার করেছিল, অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণেই ইংরেজরা সে মুসলিম রাজা-বাদশাহদেরে অত্যন্ত হীনচিত্রে অঙ্কিত করেছিল---নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে, নিজেদের রাজ্য রক্ষা করার প্রয়োজনে। একই উদ্দেশ্যে টড প্রমুখ ইংরেজ সিভিলিয়ানরা হিন্দু চারণকবি বা মুষ্টিমেয় বিদ্বেষান্ধ লেখকের অনৈতিহাসিক গালগল্প কল্পকাহিনীকে ইতিহাসের মর্য্যদা দিয়ে হিন্দুদের বিশেষতঃ রাজপুতদের মর্য্যদা দিয়েছিলেন মুসলমানদের উপর। বিদেশীদের রচিত এরূপ মুসীলিপ্ত অনেক কাহিনী ইতিহাসের নামে সাগ্রহে গ্রহণ করেই কেবল 'বিশ্বকবির' পক্ষে 'হোলি খেলা', 'গুরু গোবিন্দ সিংহ' প্রভৃতি মুসলিম-বিদ্বেষপূর্ণ এসব তথাকথিত ঐতিহাসিক কাহিনী, কাব্যের মাধ্যমে চমৎকারভাবে পরিবেশন করা সম্ভব হয়েছেঃ 'পত্র দিল পাঠান কেশর খাঁরে/কেতুন হতে ভুনাগ রাজার রাণী।' অথবা 'পঞ্চ নদীর তীরে বেনী পাকাইয়া শিরে' ইত্যাদি। যে শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, সে শতাব্দীতেই তার ঘরের কাছে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ তিতুমীরের রক্তদান-যে রক্তলেখা তখনও মুছে যায়নি, সে ইতিহাস কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে না। বিশ্বাসঘাতকতার শিকার, বালাকোটের শহীদ সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর অসাধারণ বীরত্ব ও অসম যুদ্ধে সংগ্রাম ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ, তার চোখে পড়ে না। তার চোখে পড়ে না সিপাহী বিপ্লবের (১৮৫৭) বীর সেনানীদের কোরবানী ও রক্তগঙ্গা, তার চোখে পড়েনা লক্ষ্ণৌ-এর নবাব বেগম বীরাঙ্গনা হজরত মহলের অসম সাহসিকতাপূর্ন স্বাধীনতা সংগ্রাম। এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দিব্যচোখে ছানি পড়ার একমাত্র কারণ এরা ছিলেন মুসলিম।

আরো লক্ষণীয় যে, যখন বিদেশী বর্ণিত ইতিবৃত্ত---যাদের তিনিই চুপি চুপি 'গঙ্গাজলে' পবিত্র করে বরণ করে নিলেন, "বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি, নিল চুপে চুপে," তাই যখন 'রাজ তাপসীবীর' শিবাজীর প্রতিকূলে যায়--- যেমন "বিদেশির ইতিবৃত্ত দস্যুবলি করে পরিহাস, অট্যহাস্য রবে/---তব পুণ্য চেষ্টাযত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস এই জানে সবে।" (শিবাজী উৎসব) --- তখন 'গঙ্গোদকে'র মাহাত্ম্য লোপ পেয়ে যায়। যখন প্রামাণ্য তথ্যভিত্তিক ইতিবৃত্ত শিবাজীর এই হীনচিত্র প্রদর্শন করে, তখন ইতিহাস হয়ে যায় মিথ্যাবাদী! "অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ, তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন, হবে আজ জয়ী।" (শিবাজী উৎসব')

ইতিবৃত্ত ---ইতিহাস-শুধু বিদেশী রচিতই নয়-তারই স্বদেশবাসী স্বধর্মী (নামকরা ব্রাক্ষ হলেও হিন্দুয়ানীই ছিল রবি বাবুর মধ্যে প্রকট) হিন্দু বাঙ্গালী রচিত ইতিহাসও কি মিথ্যাময়ী'? এদের রচিত ইতিহাসেও শিবাজীর বিশ্বাসঘাতক চরিত্র, শিবাজী ও মারাঠাদের দস্যুসুলভ আচরণ সন্দেহাতীতরূপেই প্রামাণিত। যেখানে অনুকূল রায় দেয় না, সেখানে প্রামাণ্য তথ্যভিত্তিক ইতিহাসও

www.pathagar.com

পরিত্যাজ্য। আর বাজারে গালগল্পও ইতিহাসের চাইতেও অধিক মর্য্যদায় 'কাহিনী' কাব্যে স্থান লাভ করতে পারে যদি তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যায়। এক দেশদর্শিতা, অন্ধত্ব, সাম্প্রদায়িকতা আর কাকে বলে? সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি অনুযায়ী ইতিহাসকে বিকৃত করার লাইসেন্স --- অবাধ অধিকার, বিশ্বকবি হলেও, কারো প্রাপ্য নয়। --- এটা তার অনধিকার প্রবেশ, অবিচার, ব্যভিচার --- কখনো অধিকার নয়।

ঐতিহাসিক সত্যোপলব্ধির কথা বাদ দিলেও এই কবিতাটিতে কি 'বিশ্বকবির' কবি-খ্যাতি অনুযায়ী কাব্য সুধা ঝরে পড়ছে, নাকি কাব্য সুষমার বিচারে এই সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট দাসসুলভ হীনমন্যতার প্রতীক কবিতাটি অনবদ্য?

এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। অর্থাৎ ১৯০৪ সালে বঙ্গ বিভাগ ও স্বতন্ত্র 'বঙ্গাসাম' প্রদেশ গঠনের (১৯০৫) মুখোমুখি সময়ে।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার স্বরূপ সম্পর্কে --- তাঁর শিবাজী প্রীতি প্রসঙ্গে --- উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রায়বাহাদুর যদুনাথ সরকার (একজন আগ্রাসনবাদী বর্ণ হিন্দু ঐতিহাসিক) রচিত ইতিহাস হতে শিবাজী সম্পর্কে কিছুটা প্রামাণ্য তথ্য পরিবেশন করা নেহায়েত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

(ক) দস্যু হিসেবে মারাঠাদের প্রথম আবির্ভাব। শিবাজীর পিতামহ মালোজীর জীবনযাত্রা শুরু হয় দস্যুদলে দস্যু হিসেবে।

"নিম্বলকার নামে এক দস্যু সর্দারের দলে যোগ দিয়ে তারা (অর্থাৎ মালোজীরা) শীঘ্রই এতটা গুরুত্ব এবং শক্তিলাভ করে যে, অধঃপতিত নিজামশাহী সরকার খুশীর সঙ্গে তাদেরে সেনানায়ক হিসেবে গ্রহণ করে।" (যদুনাথ সরকার ঃ শিবাজী ও তার সমকাল। পৃঃ ১৫)

(খ) শিবাজীর শক্তি সঞ্চয়ের ভিত্তি-প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা।

(১) পুরন্দর দুর্গাধিপতি ব্রাহ্মণ নীলোজি নীলকান্ত রাও-এর বদান্যতায় দুর্গে আশ্রয় লাভ করে শঠতা, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করে দুর্গাধিকার।

"নীলোজীর বিদ্রোহী ভ্রাতা শঙ্করজীর সঙ্গে শিবাজী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং শঙ্করজীর কৌশলে পরিবারও লোকজনসহ দেওয়ালী উৎসবে যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন এবং অতর্কিত আক্রমণে নিদ্রিত নীলোজীকে শয়নকক্ষে বন্দী করে শৃংখলাবদ্ধ করেন।" (ঐ পৃঃ৪০)

(২) জাভলি এবং বায়গড় দুর্গ ও শিবাজী ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকা করে দুর্গাধিপতি চন্দ্ররাও, তার ভ্রাতা সূর্যরাও এবং হনুমন্ত রাওকে হত্যা করে অধিকার করেন।

www.pathagar.com

"শিবাজী তার খাজাঞ্চি রঘুনাথ বল্লাল কর্দেকে বললেন, চন্দ্ররা ও মোরেকে হত্যা না করলে আমি রাজ্য লাভ করতে পারি না। তুমি ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারবে না। আমি তোমাকে আমার দূত হিসাবে তার কাছে পাঠাচ্ছি।"

'রঘুনাথ দ্বিতীয়বার চন্দ্ররাও-এর সঙ্গে আলোচনার সময় চন্দ্ররাও এবং তার ভ্রাতা সূর্যরাওকে ছুরিকাঘাত করেন। (দূত অবধ্য, দূতের উপযুক্ত কর্মই বটে!) শিবাজী দেখলেন যে, (চন্দ্ররাও -এর আত্মীয়) হনুমন্তরাওকে হত্যা না করলে জাভলি দুর্গে নিষকন্টক হওয়া যাবেনা। তাই তিনি শম্ভুজী কাবজী নামক একজন মারাঠা কর্মচারীকে দিয়ে হনুমন্তের কন্যার পানি গ্রহণের প্রস্তাবের ছলে পাঠিয়ে আলোচনার সময় হনুমন্তকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করান।' (ঐ। পৃঃ৪২-৪৩)।

এ সকলই শিবাজী এবং মারাঠাদের স্বভাবজাত ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যা প্রবণতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এমনকি মারাঠা ঐতিহাসিকগণও এ ব্যাপারে শিবাজীর কার্যকলাপের নিন্দা করতে বাধ্য হন।

"জাভলি দুর্গ দখল শিবাজীর পরিকল্পিত খুন এবং ষড়যন্ত্রপূর্ণ বিশ্বাঘাতকতার ফল। শিবাজীর সকল পূর্বতন হিন্দু জীবন চরিতকারগণ একমত যে, ইহা ছিল ব্যক্তিস্বার্থ সাধনে (হিন্দু সমাজের বা হিন্দু ধর্মের স্বার্থে নয়) শিবাজী কর্তৃক পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকান্ড।"

(ঐ। পৃঃ৪৩-৪৪)।

তবে জাভলি দুর্গ দখলে নিহতরা হিন্দু না হয়ে যদি বিজাপুর সেনাপতি আফজাল খাঁর মত মুসলমান হতেন, তা হলে অবশ্য এই মারাঠা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ও নিহত ব্যক্তিকেই ষড়যন্ত্র বা হত্যা প্রচেষ্টার জন্য দায়ী হতে হত।

(৩) শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যাংকজী অধিকৃত অঞ্চল নিজ দখলে আনার উদ্দেশ্যে শিবাজী শঠতা ও প্রবঞ্চনার সাহায্যে ব্যাংকজীকে নজরবন্দী করেন, যদিও অনুরূপভাবেই ব্যাংকজী নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। "শিবাজী তার ভ্রাতার গতিবিধির উপর নজর রাখবার ব্যবস্থা করেন তার পলায়নের পথ রুদ্ধ করার জন্য। ব্যাংকজী বুঝতে পারলো যে, কার্যতঃ সে বন্দী। কিন্তু আসলে সে-ও ছিল শাহজীরই এক ছেলে (অর্থাৎ ষড়যন্ত্র, শঠতা ও প্রবঞ্চনা বিশারদ) এবং নিজের মুক্তি সুনিশ্চিত করার কৌশলে সেও ছিল শিবাজীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়।" (ঐ। পৃঃ ২৯৯)

(গ) 'বিশ্বকবি' কল্পিত এবং নন্দিত মারাঠা ধর্মারাজ্যের স্বরূপঃ

উক্ত একই ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী 'মারাঠা ধর্মরাজ্য' ছিল একটি লুটপাটসর্বস্ব সংগঠন।

(১) "শিবাজীর নবনিযুক্ত শাসনকর্তারা এবং তাহাদের সৈন্যরাও পথচারী এবং নগরবাসীদিগকে নির্ভয়ে নির্দয়ভাবে লুটপাট করিত।" (ঐ। পৃঃ ১৯৫)

www.pathagar.com

(২) "মারাঠাদের অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রথম স্তম্ভ চৌথ ছিল একটি ডাকাতকে টাকা দিয়ে কেবলমাত্র সেই ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া; সকল প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে শান্তি রক্ষাকারী কোন ব্যবস্থা নয়।" (ঐ। পৃঃ ৩৫৮)

(৩) "সেই সঙ্গে তারা (মারাঠারা) প্রতিহিংসায় নিষ্ঠুর এবং সরকার তাদের পাওনাদারদের প্রবঞ্চনা করতে ক্বচিৎ কোন দ্বিধাবোধ করত।" (ঐ। পৃঃ ৭)

(৪) সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ মিত্ররাজ্য বিজাপুর, গোলকুন্ডা, কর্ণাটক ও তাঞ্জোর বিশ্বাসঘাতাপূর্বক লুণ্ঠন।

"তখন শিবাজী মুখোশ ফেলে দিয়ে স্বরূপ প্রকাশ করলেন। তিনি আদলশাহী অঞ্চলে লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করলেন।"

"এরূপ অজুহাত (অর্থাৎ স্বীয় নিরাপত্তা ও শক্তি সঞ্চয়ের খাতিরে সন্নিহিত রাজ্যের নিরপরাধ প্রজাবৃন্দের সম্পদ লুটপাট) তার প্রথম জীবনে হয়ত সত্য হতে পারত। কিন্তু এটা তার মিত্ররাজ্য- বিজাপুর, গোলকুন্ডা, কর্ণাটক এবং তাঞ্জোর লুটপাটের সাফাই হতে পারে না। এরূপ অজুহাত পেশোয়াদের বৈদেশিক নীতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।" (ঐ। পৃঃ ৩৭০)

(৫) লুণ্ঠনসর্বস্ব মারাঠা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে একজন দেশপ্রেমিক হিন্দু নেতার বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ঃ "মারাঠা শাসনে জমির খাজনার হারে কিছু আসে-যেতো না। সেকালে (অর্থাৎ মারাঠা শাসনামলে) যখন শস্যহানি হোত, আমাদের লোকজনেরা (অর্থাৎ মারাঠারা) ঘোড়ায় চড়ে বর্শা হাতে বেরিয়ে পড়ত এবং পরবর্তী দু'তিন বছরের পক্ষে যথেষ্ঠ মাল লুট করে আনতো। এখন (অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে) নিজেদের জমিতে থেকেই তাদের না খেয়ে মরতে হচ্ছে। কারণ লুটপাটের দ্বার খোলা নেই। (গোখেল ঃ যদুনাথ সরকারের 'শিবাজী ও তার সমকাল এ উদ্ধৃত। পৃ ৩৪১

(৬) 'বিশ্বকবি'র অনেক আশার সম্বল এই লুণ্ঠন সর্বস্ব ধর্মরাজ্যে'র নিজের মধ্যেই নিহিত ছিল তার পতনের বীজ।

'মারাঠা রাজ্যের জাতীয় চরিত্রই ছিল সকলের বিরুদ্ধে আগ্রাসন এবং ফলে সকলের হস্তই উত্থিত হয়েছিল মারাঠা রাজ্যের বিরুদ্ধে। আগ্রাসনবাদী রাজ্যের স্বভাবই একটি অবক্ষয়কারী বৃত্তের মধ্যে ঘোরা। এ রাজ্য তার খাদ্য সম্পদের জন্য নিয়মিত যুদ্ধ পরিচালনা করতে বাধ্য। কিন্তু যখন যুদ্ধ একটি রাজ্যের ধন-সম্পদ আহরণের একটি সাধারণ ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হয়, তখন আক্রান্ত এবং আক্রমণকারী উভয় দেশেরই শিল্পসম্পদ ধ্বংস হয় এবং পরিণামে এই যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে। সংগ্রাম (অর্থাৎ লুণ্ঠন) ভিত্তিক রাষ্ট্র তাই স্বর্ণ ডিম্ব প্রসবিনী রাজহংসীকেই হত্যা করে। শিবাজির পৌনঃপুনিক সুরাট লুণ্ঠনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধনসম্পদ এখান হতে অন্যত্র চলে যায়। মারাঠা আক্রমণের আতঙ্ক সুরাটকে সম্পূর্ণভাবে দরিদ্র করে ফেলে এবং শিবাজীর

www.pathagar.com

অর্থাগমের এই সূত্র কার্যকরীভাবেই বিশুষ্ক হয়। এইভাবে অর্থনৈতিক দিক হতে মারাঠা রাজ্যের কোন স্থিতিশীল ভিত্তি ছিল না, ছিলনা এর শ্রীবৃদ্ধি লাভের অন্তর্নিহিত কোন উপায় ব্যবস্থা।' (ঐ পৃঃ ৩৮১-৩৮২)

(৭) মারাঠা 'ধর্ম রাজ্যের' দুর্নীতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের রায়ঃ যখন কোন সরকার লুটতরাজকে অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানোর নিয়মিত ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে (যা ছিল মারাঠা 'ধর্মরাজ্যে'র অর্থনৈতিক বুনিয়াদ) তখন স্বাভাবতঃই সেই সরকারের কর্মচারীরা নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে উৎকোচ গ্রহণকে নীতি বহির্ভূত বলে মনে করে না। (ঐ পৃঃ ১২-১৩)

(ঘ) যে 'মারাঠাদের ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে', 'এ মহাবচন কবির সম্বল' সেই মারাঠা সভ্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের প্রামাণ্য রায়ঃ

'চারু শিল্পকলার প্রতি তাদের ছিলনা কোন রুচি, ছিলনা আলাপ-ব্যবহারে কোন ভদ্রতা শালীনতা, না ছিল সুষ্ঠু সামাজিক জীবন-ধারণের উপযোগী উপকরণের প্রতি কোন আগ্রহ। কোন একটি মহৎ স্থাপত্য বা সুন্দর চিত্রকলা বা সুলিখিত গ্রন্থ দ্বারা মারাঠা প্রভুত্বকালীন সময়ে ভারত লাভবান হয় নাই।'

(ঐ-পৃঃ ৬)

উপরোক্ত প্রামাণ্য উদ্ধৃতি হতে শিবাজী, মারাঠা রাজ্য এবং 'অখন্ড ভারতে' মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বরূপ ও পরিণতি, 'বিশ্ব কবির' রাজনৈতিককাব্য 'শিবাজী উৎসব' এবং তাঁর সাম্প্রদায়িক কলুষক্লিষ্ট বিদ্বেষান্ধ দৃষ্টিভঙ্গি-এসবই অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকট। এতেও যদি কোন মোহাবিষ্ট ভক্ত প্রবরের আঁখি না খোলে, তাহলে ভারতের দেশবরেণ্য এক মহান ব্যক্তির সুচিন্তিত অভিমত শুনুন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি অবশ্যই নিরংকুশ সত্যোপলব্ধির জন্য সহায়কহবে।

"একটি সাময়িক উত্তেজনায় দেশ আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং আমরা কল্পনা করি দেশ একতাবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমাদের সমাজদেহের ছেঁড়া ছেঁদাগুলো তাদের কাজ করে যায়; কোন মহৎভাব আমরা দীর্ঘকাল ধারণ করতে পারিনা। শিবাজী এই ছেঁদাগুলো রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি মোগলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন হিন্দু সমাজকে, যে সমাজ-জীবনে আনুষ্ঠানিক মর্য্যদাবোধ এবং জাতিভেদের ছুঁৎমার্গ নিশ্চিতভাবেই তার প্রাণস্বরূপ ছিল। পরস্পরের প্রতি যোগসূত্রবিহীন এই পাঁচ মিশেলী সমাজকে তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র ভারতের উপর বিজয়ী করতে। তিনি বালির বাঁধ গড়েছিলেন, অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়েছিলেন। বিশাল মহাদেশতুল্যভারতের ন্যায় একটি দেশের উপর, এই প্রকার বর্ণ বৈষম্যবাদী, পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত সম্প্রদায়ের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, যে কোন মানুষের শক্তির বাইরে; ইহা বিশ্ব-জাগতিক ঐশীবিধি বিরুদ্ধ।" (ঐ পৃষ্ঠা ৩৭৫ --- রায়বাহাদুর যদুনাথ সরকার অনুদিত

www.pathagar.com

মডার্ণ রিভিউ এপ্রিল, ১৯১১-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'শিখ শক্তির উত্থান ও পতন' নামক নিবন্ধ হতে উদ্ধৃত।)

কিন্তু বর্তমানেও কি এই অবক্ষয়ী নেতিবাচক সমাজ-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে? আজকের এই স্বাধীন ভারতে? সেই একই ছুঁৎমার্গ, সেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, সংখ্যালঘু নিপীড়নকারী, ব্রহ্মণ্যাভিমানী ভারত আজও ছুঁৎমার্গর অন্ধত্বের আবর্তে ঘুরছে। বলাবাহুল্য, এই লুণ্ঠনভিত্তিক 'যে ধর্মরাজ্য' তা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। মারাঠা রাষ্ট্রের ধ্বংসের বীজ এর জন্মের সাথে সাথেই রোপিত হয়।

'শিবাজী এবং প্রথম বাজীরাও (পেশোয়া)-এর বিজয় অভিযান হিন্দু গোঁড়ামীকেই শক্তিশালী করে। এটা বর্ণবৈষম্যবাদ ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে আনুষ্ঠানিক মর্য্যদা বোধকে তীব্রভাবে বৃদ্ধি করে, যা দরিদ্র এবং রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ প্রাথমিক মারাঠা সমাজের একাত্মতা এবং সরলতার বিরুদ্ধে শক্তি হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবে তার রাজনৈতিক বিজয়, বিজয়ের মূল ভিত্তিই ধ্বংস করে।' (ঐ-পৃঃ ৩৭৪)

শিবাজী এবং মারাঠারা ছিল অত্যন্ত নীচ জাতি। তার নিজ জাতিকে সম্মান দেয়ার পরিবর্তে তিনি ব্রাহ্মণদের পর্যাপ্ত ঘুষ দিয়ে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করেন। যদিও তার সমকালে বা এই শতাব্দীতেও শিবাজীর বংশাবলীকে বহু ব্রাহ্মণ 'শূদ্র' বলেই রায় প্রদান করেছেন।

'শিবাজী এবং তার শ্বশুর গাইকোয়াড় ছিল মারাঠা, অর্থাৎ ঘৃণিত জাতির সদস্য। উনিবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পূর্বেও মহারাষ্ট্রের একজন ব্রাহ্মণকে মারাঠা বললে সে অপমানিত বোধ করত। 'না', সক্রোধে সে উত্তর দিত, 'আমি দক্ষিণীব্রাহ্মণ।' (ঐ-পৃঃ ৩৭৫)

মারাঠা সমাজে এই বর্ণবৈষম্যবাদের নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি সঙ্গতভাবেই মারাঠা শক্তিকে দুর্বল করে ফেলে।

যদিও এদের আকস্মিক সাফল্য গোঁড়া হিন্দু জাতীয়তাবাদকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করে তবুও এদের ধর্মান্ধতা ও পাশবিক নিষ্ঠুরতা দক্ষিণ ভারতের তো বটেই, উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমান সককেই শত্রু হতে বাধ্য করে। ফলে শিবাজীর মৃত্যুর সাথে সাথে মারাঠাদের পতনের লক্ষণ, অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং এক শতাব্দী যেতে না যেতেই লুণ্ঠনভিত্তিক এই মারাঠা সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। এইভাবে 'বিশ্ব কবির' ভবিষ্যৎদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অত্যন্ত নির্ভুলভাবেই 'বিশ্ব কবি'র লিখন পরে 'বিধাতার অব্যর্থ লিখন --- ইতিহাসের লিখন বিজয়ী হয়।

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি সত্ত্বেও এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, তার রাজনৈতিক কাব্য 'শিবাজী উৎসব' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি সত্যই পরবর্তীকালে মোহ ভঙ্গ হয়েছিল,

www.pathagar.com

যদিও কেউ কেউ এ ধরণের কথা বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কার্যকলাপে তা প্রমাণিত হয় না। তাই যদি হবে, তাহলে বহুকাল পরে ১৯৪১ সালে মৃত্যুর কিছুদিন আগে তার স্বরচিত 'সঞ্চয়িতা' কাব্য সঙ্কলনে অন্য অনেক কবিতা বাদ দিলেও তিনি এই কবিতাটিকে পছন্দ করে স্থান দিলেন কেন?

রবীন্দ্রনাথের চৌদ্দপুরুষের সৌভাগ্য যে, তিনি সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেননি। কারণ তাহলে প্রায় দেড়শ' বছরের নিরাপদ দূরত্বে ভয়-ভাবনা হীন প্যাক্স ব্রিটানিকার (Pax Britannica) নিরাপদ আশ্রয়ে বসে 'বঙ্গ ললনা' কর্তৃক মারাঠা বর্গী ডাকাতদেরে উলুধ্বনি দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে জামাই আদরে ঘরে তুলে নেয়ার আত্মমর্যাদাহীন নির্লজ্জ ও অশালীন কাব্য বিলাসের প্রয়াস পেতেন না।

[সংসক্তি-ছ-মহারাষ্ট্র পুরাণ।]

www.pathagar.com

আগ্রাসনবাদী হিন্দু সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মিঃ গান্ধী বলেনঃ রবীন্দ্রনাথ বিধৃত বাংলার সাধারণ সংস্কৃতির রূপ উপনিষদের দর্শনে নিহিত এবং উপনিষদীয় দর্শনশুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের সাধারণ উত্তরাধিকার --- (অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টাননির্বিশেষে।)

(পিয়ারীলাল ঃ মহাত্মাগান্ধী ঃ দি লাষ্ট ফেজ ঃ দ্বিতীয় খন্ড।)

কথাটার নির্গলিতার্থ এই দাঁড়ায় যে, রবীন্দ্রনাথ-বিধৃত বাংলার সংস্কৃতি বা 'বাঙ্গালী' সংস্কৃতি এবং হিন্দু সংস্কৃতি সমার্থবোধক। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মিঃ গান্ধীর এই ভাষ্য এক তিক্ত সত্যই তুলে ধরেছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ তার লেখায় ও কার্য্যবলীতেও শুধু একথাই প্রমাণ করেননি যে, তিনি হিন্দু সংস্কৃতির একজন ধ্বজাবাহী মাত্র। বরং তিনি একথাও বেশ সাফল্যের সাথেই প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, মুসলিম সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তিনি একজন পয়লা কাতারের আগ্রাসনবাদী।

এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্র প্রতিভা ঈর্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে বৃটিশ যুগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির মনোগ্রাম পরিবর্তন করে তাতে হিন্দুদের বিদ্যার দেবী স্বরস্বতীর প্রতীক "শ্রী" এবং দেবীর আসন "পদ্ম" গ্রহণের প্রতিবাদে মুসলিম ছাত্র নেতা জনাব ওয়াসেকের নেতৃত্বে যে প্রচন্ড আন্দোলন, আলোড়ন সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু সমাজে তার গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ ভাবমূর্তি অনুযায়ী এবং একজন 'বরেণ্য নেতা' হিসাবে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এক অভিনব অধ্যায় রচনা করে "জাতির" এক উৎকট সংজ্ঞা নির্ধারণ করলেন এই বলে যে, মুসলমানদের উচিত নয়, হিন্দু দেব-দেবী প্রতীকের বিরোধিতা করা। যেহেতু ধর্মে ইসলাম অনুসারী হলেও তারা জাতিতে 'হিন্দু' অর্থাৎ তারা হিন্দু --মুসলমান?

জাতির সংজ্ঞা নির্ধারণের ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আত্ততার মধ্যে 'বিশ্বকবির' এই যদৃচ্ছ বিহার কেবল তার অনধিকার চর্চারই একটা নিদর্শন মাত্র নয়, -এখানে মুসলিম সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তার হিন্দু সাম্প্রদায়িক মানসের সত্যিকার পরিচয়ও অত্যন্ত নির্ভূলভাবেইপ্রকট।

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত সম্বন্ধে তথা মুসলমানদের ধর্ম এবং সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, হিন্দু প্রভাবান্বিত কলিকাতা ইউনির্ভাসিটির এই কূট আগ্রাসন সম্বন্ধে-প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম আবুল কালাম শামসুদ্দিন যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারণ করেন তাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

বাংলা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি এবং জাতীয়তার নামে কিভাবে-হিন্দু সংস্কৃতি ও জাতীয়তাকে পাঠ্য বইগুলোর মাধ্যমে মুসলমান ছেলেদের কিশোর মনে গেঁথে দেয়ার অপচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় চালিয়ে যাচ্ছিল .....মুসলমানদের আপত্তিকর

www.pathagar.com

তথা হিন্দুদের পরিপোষক বিষয়সমূহ চালু করে বুঝাবার চেষ্টা চলেছিল যে, এই সবই হোল বাঙ্গালী ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মত মনীষী ও এ প্রকার উক্তি করতে দ্বিধা করেননি যে, মুসলমানেরা ধর্মে ইসলাম অনুসারী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু-কাজেই তারা "হিন্দু-মুসলমান"।

(আবুল কালাম শামসুদ্দিন-অতীত দিনের স্মৃতি পৃঃ ১৭৯)

এই প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভারতীয় হিন্দুদের সর্ববৃৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'ভারতীয় কংগ্রেস' গঠিত হয় বৃটিশ সমর্থনে যার প্রথম অধিবেশনের (১৮৮৫খৃঃ) উদ্যোক্তা ও সভাপতি ছিলেন একজন ইংরেজ রিটায়ার্ড সিভিলিয়ান--অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম।

প্রথমদিকে মওলানা মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবর্গ কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন।

কালক্রমে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মিঃ গান্ধী কংগ্রেসের নীতিতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার পর (তার নিরপেক্ষতার নিদর্শনস্বরূপ তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও ছিলেন না!)- এটা গোঁড়া হিন্দু আগ্রাসনবাদী একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কংগ্রেস কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষজাত, পৌত্তলিকতাদুষ্ট "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত ভারতীয় 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসাবে গৃহীত হয়। মিঃ গান্ধী কর্তৃক মুসলমানদের ধর্ম, জাতীয়তা, কৃষ্টি, তাহজীব-তমুদ্দুন বিরোধী ওয়ার্দ্দা শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে মুসলমানদের জাতীয় সত্তা বিপন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ফলে প্রদেশগত এবং ভাষাগত বৈষম্য নির্বিশেষে মুসলিম বঙ্গসহ সমগ্র ভারতীয় মুসলিম সমাজে এর বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ এবং প্রচন্ড আন্দোলন সৃষ্টি হয়।

ঐ সময় 'দৈনিক আজাদে' প্রকাশিত খবর ঃ "অদ্য অপরাহ্নে নিখিল ভারত মোছলেম ছাত্র ফেডারেশনের অধিবেশনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাদের মধ্যে একটি ওয়ার্দ্দা পরিকল্পনা ও আর একটি 'বন্দেমাতরম'-এর বিরুদ্ধে। ওয়ার্দ্দা পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রস্তাবে বিহারে মোছলেম ছাত্র ফেডারেশনের প্রস্তাবটি পুনরায় সমর্থন করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয়, ওয়ার্দ্দা পরিকল্পনা নামক পরিকল্পনা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে। প্রস্তাবে উক্ত পরিকল্পনা বিহারে প্রবর্তনেও আপত্তি করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনা এছলামের মূলনীতি-বিরোধী ও দেশের পক্ষেও সামাজিক দিক হইতেও অকল্যাণ কর হইবে।"

"অন্য একটি প্রস্তাবে "বন্দেমাতরম" কে কেবল ধর্ম বিরোধী ও জাতীয়তা বিরোধী নয়--মোছলেম ধর্ম, সংস্কৃতি, আত্মমর্য্যদা ও মনোভাবের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, হিন্দু ছাত্ররা এ গান গাহিলে মোছলেম ছাত্রদের মধ্যে বিরোধিতার আবহাওয়াসৃষ্টি হইবে।"

(কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক আজাদ, ১ জানুয়ারী ১৯৩৯)

www.pathagar.com

এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে দেশের একজন নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এই সুমহৎ সমাধানপ্রদান করলেন যে, অন্ততঃ পক্ষে "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতের প্রথম চার লাইন--অর্থাৎ 'বন্দেমাতরম; সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম, বন্দে মাতরম" যেখানে দুর্গাদেবীর নাম উল্লেখ নেই মুসলমানদের নিকট গ্রহনীয় হতে আপত্তির কারণ থাকতে পারেনা। তথাপি তিনি গানটি পুরোপুরি বাদ দিতে রাজী হননি, যদিও এর প্রথম লাইনেই দেশকে 'মা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তার বন্দনা তথা পূজা করা হয়েছে, যা ইসলামের পুরোপুরি পরিপন্থী।

সৌমেন্দ্রনাথ বলিলেন, (কবি জসীমউদ্দীনকে) 'জহরলাল নেহেরু গানটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কবির পরামর্শের ফলে এখানে তোমাদের আপত্তিজনক অংশটি কংগ্রেসের কোন অনুষ্ঠানে আর গীত হবে না"। (জসীম উদ্দীন---ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায় ---পৃঃ২৭)

বিশ্ব কবির মতো একজন বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকের পক্ষে এহেন উৎকট অভিমত প্রকাশ বিস্ময়করই বটে।

বলাবাহুল্য, 'বন্দোতরমে'র জন্মের সূচনা ও সৃষ্টির প্রেরণাই মুসলিম বিদ্বেষ। আর তাছাড়া এক আল্লাহ ছাড়া মুসলমান কারও .....সে 'দেশমাতাই' হোক বা কোন দেব-দেবীই হোক, বন্দনা করতে পারে না এবং নির্জীব বা নৈসর্গিক কোন পদার্থ বা কোন কাব্য-কল্পনা বা সৃষ্ট বস্তুকে মানবোচিত জৈব গুণ আরোপ করে তার অর্চনা করাও প্রকৃতপক্ষে শেরেকী, পৌত্তলিকতা- ইসলাম পরিপন্থী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সূর্য, বরুণ, সৃষ্টি-রহস্য, কামরতি সম্পৃক্ত চিন্তা, সর্পভয়, পরাজিত অনার্য জাতির প্রতি আর্যদের নিদারুণ বিদ্বেষ-প্রভৃতি অত্যন্ত উর্বর মস্তিষ্ক সঞ্জাত কবি-কল্পনার মধ্য দিয়েই, কালক্রমে দেব-দেবীর স্থান অধিকার করে সূর্য পূজা, বরুণ পূজা, শিবলিঙ্গ পূজা, কুমারী পূজা, মনসা পূজা হিসাবে হিন্দু সমাজের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হয়ে একটি বিরাট মনুষ্য গোষ্ঠীকে বিপথগামী পৌত্তলিকতাবাদীতে পরিণত করেছে। ফলে রাজনীতিঘটিত আপত্তি ছাড়াও মুসলমানদের একেশ্বরবাদী মূল ধর্মবিশ্বাসের কারণেও রবীন্দ্রনাথের এই সুকৌশলী,সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধ, কূট সমাধান মুসলমান সমাজ কর্তৃক একবাক্যে পরিত্যক্ত হয়।

এছাড়াও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রতিবাদে এবং চাকরির ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রদায়িক মানস এমন নির্লজ্জভাবে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছিল যে, তদানীন্তন মুসলিম বঙ্গের একমাত্র দৈনিক 'আজাদ' রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর আক্ষেপ বাণী উচ্চারণ করতে বাধ্য হয় এই বলেঃ

"রবীন্দ্রনাথ কবি, শুধু বাংলার নয়, বিশ্বের 'বরেণ্য কবি'। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোন দিয়ে লোকে তার বিচারে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু এমন কবি যখন সংকীর্ণ

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে নামিয়া আসেন, যখন তার বিচরণভূমি সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজালে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে তখন সত্যিই দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকে না।

রবীন্দ্রনাথকে যখন আমরা দেখি, হিন্দু মহাসভাপন্থী সাম্প্রদায়িক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রতিবাদ করতে .....চাকরীর ভাগ-বাটোয়ারা প্রস্তাবে হিন্দু স্বার্থ-ধ্বজীদের নামের সাথে নিজের নাম মিলাইতে, তখন সত্যিই মনে হয় এই ভাবে নিজেকে টানিয়া নামাইবার তার কি দরকার ছিল। তিনি কেন সাম্প্রদায়িকতার কর্দম গায়ে মাখিতে গেলেন। তার বাণী কেন বিদ্বেষ বিষের জলাভূমিতে নামিয়া আসিবে-সংকীর্ণ স্বার্থের আগাছার জন্ম যেখানে চিরন্তন হইয়া আছে? (সম্পাদকীয় -কলিকাতা হতে প্রকাশিত দৈনিক আজাদ-৬জুন-১৯৩৯)।

আরও উল্লেখ্য, এরও প্রায় বারো-তেরো বছর আগেই ১৯২৭ সালে, রবীন্দ্রনাথের বিদ্বেষান্ধ সংকীর্ণ মানসিকতা সম্বন্ধে ঘোর রবীন্দ্রভক্ত কাজী নজরুল ইসলাম ও অনুরূপভাবেই খোদোক্তি করেছিলেন ঃ "বিশ্ব কবি সম্রাটের আসন রবিলোক-কাদাছোঁড়াছুড়ির' বহু উর্ধ্বে। (আত্মশক্তি-১৪ পৌষ,.১৩৩৪/৩০/১২/২০ 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ')।

প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সামন্তবাদী বর্ণাশ্রমভিত্তিক বর্ণহিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় হিন্দু জমিদার যাদের অধিকাংশ প্রজাই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত এবং প্রজা পীড়ন, তথা মুসলিম দলন ছিল যাদের সামগ্রিক এক সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য - যা থেকে জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারও (তথা রবীন্দ্রনাথও) কোনক্রমেই একেবারে মুক্ত ছিলেন না। ফলে মুসলিম বিদ্বেষান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ছিল তার জন্মগত, পরিবারিক ও জমিদারী পরিবেশগত সত্ত্বার এক অপ্রতিরোধ্য স্বাভাবিক প্রকাশ। (ফ্রন্টিয়ার-২০অক্টোবর ১৯৭৯-পাবনার প্রজাবৃন্দ ও ঠাকুর পরিবার)।

এখানে আরও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সুদীর্ঘকাল ব্যাপী সৃষ্ট বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্যে, গল্পে , উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য মুসলিম চরিত্রের অত্যন্ত বিস্ময়কর অভাব। যে দেশের কবি 'বিশ্বকবি' হিসাবে নন্দিত, সেই দেশেরই সংখ্যাগুরু যে সমাজ তার অতি নিকট প্রতিবেশী, সেই মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে কবির অত্যন্ত মুখর লেখনী বিস্ময়করভাবে নীরব। অথচ নিরাকার ব্রহ্ম হিসাবে তাঁর পৈত্রিক উত্তরাধিকার হিসাবে তাঁর পরিচয় শিক্ষা-দীক্ষা হলেও হিন্দু সমাজের দেব-দেবী এবং পুজা-অর্চনার বাহুল্যে তাঁর বহু গল্প উপন্যাসই ভারাক্রান্ত।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস কাব্য সাহিত্য হতে এই সত্য উপলব্ধি করা কোন বিদেশীর পক্ষেই সম্ভব নয় যে তাঁরই দেশের সংখ্যাগুরু সমাজ (হিন্দু নয়) মুসলমান। তাঁর সম্প্রদায়িক মানসের নিকট অবাঞ্ছিত এই সংখ্যাগুরু মুসলমান সমাজের অস্তিত্ব তিনি তার লেখার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে স্বীয় বিকৃত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত রাখার একটা প্রয়াস পেয়েছেন

www.pathagar.com

মাত্র যেমন করে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি চোখ বুঁজে কোন জলজ্যান্ত সত্যকে অস্বীকার করতে চায়। অপর পক্ষে তার গল্প-উপন্যাস কবিতা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ যে পৌত্তলিক হিন্দু সংস্কার-সংস্কৃতিরই স্বাক্ষর তা বেশ নির্ভুলভাবেই প্রকাশ করে।

কট্টর সাম্প্রদায়িক, ব্রাহ্মণ্যাভিমানী এবং সংকীর্ণ স্বার্থবাদী আর্য আগ্রাসনবাদী বর্ণ-হিন্দু সমাজের আপোষহীন শাসনে এবং পৌত্তলিকতা পূর্ণ হিন্দুসংস্কৃতি, হিন্দু জাতীয়তাবাদের দুরন্ত প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় পোষিত, অনন্য প্রতিভাদীপ্ত বৈদগ্ধশালী উন্নতমানস যে কিরূপ অসহায়ভাবে আর্যশ্রেষ্ঠত্বের জাতিগত অভিমান ও বর্ণবাদী সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে আত্মসমর্পন করেছিল, তার গ্লানিজনক স্বাক্ষর তার কাব্যে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবেই প্রকট।

"হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে/এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।" বহুল উদ্ধৃত, বহু প্রশংসিত, তথাকথিত মানবতার বাণী সম্বলিত এই "ভারত তীর্থ" কবিতায় 'বিশ্বকবি' বলে নন্দিত 'কবিগুরু' রবীন্দ্রনাথ কোন্ মহৎ উদার বাণী প্রচার করেছেন?

এই ভারতেই দুনিয়ার সকলের 'পূণ্যতীর্থ',

এখানেই 'মহামানবের আড্ডা'! যেমন নাজী দর্শন মতে পিতৃভূমি জার্মানীই দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান এবং জার্মানরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, জার্মান সংস্কৃতিই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ কালচার।

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্থ, হেথায় দ্রাবিড়, চীন। শকহুন দল, পাঠান মোঘল, একদেহে হোল লীন" সবারই, "মহা ওংকার ধ্বনি হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি" "তপস্যাবলে, একের অনলে, বহুরে আহুতি দিয়া বিভেদ ভুলি", "সে আরাধনার, যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার" এবং "হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে" কারণ, "সেই হোমানলে, হের আজো জ্বলে" ইত্যাদি। শব্দে শব্দে, ছত্রে-ছত্রে' একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম' রবীন্দ্রনাথের.....বিশ্বকবির-পৌত্তলিকতা প্রধান সঙ্কীর্ণ বর্ণবাদী হিন্দু সাম্প্রাদায়িক মানসিকতা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

'বিশ্বকবি' হলেও জলজ্যান্ত মিথ্যাকে সত্য বলে চালালে তা সত্য হয়ে যায় না। বিভেদ কি বর্ণহিন্দু সমাজ কোনদিন ভুলতে পেরেছে? নির্যাতন, উৎপীড়ন, হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠান সত্ত্বেও 'অনার্য' জাতির বর্তমান বংশধরেরা, যারা এখনও বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে-পর্বতে কোনমতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে, সেই কোল, ভীল, মুরং, চাকমা, নাগা, মিজো প্রভৃতি আদিবাসীদের কি হিন্দুসমাজ মানুষের মর্য্যদা দিয়েছে? এদেশের কোটি কোটি মুসলিম জনগণকে হিন্দু সমাজ কি কোনদিন আপন বলে গ্রহণ করতে পেরেছে? মিঃ গান্ধীর হরিজন আন্দোলনের চরম ব্যর্থতা-যার প্রমাণ আজও হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত মানব সন্তানদের পুড়িয়ে মারার মধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বিরাজিত কি বিভেদ ভোলার

www.pathagar.com

স্বাক্ষর বহন করে? না ধর্মনিরপেক্ষ সেক্যুলার ভারতে মিঃ গান্ধীর আশ্রম আহমেদাবাদে, জামশেদপুরে, আলীগড়ে, হায়দারাবাদে, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল ধরে মুসলিমের রক্তে হিন্দুসমাজ যে হোলি খেলছে, তা বিভেদ ভোলার ইঙ্গিত বহন করে? ১৯৮৪ সালে প্রথমদিকে হামলা এবং এই বছরেরই দ্বিতীয়ার্ধে দিল্লীতে সর্ব-ভারতে যে শিখ নিধন অভিযান পরিচালিত হয় এবং এখনও হচ্ছে তা কিসের পরিচয়? বর্ণ বৈশিষ্ট বিহীন ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই কি কোনদিন তার নিজের বর্ণবাদী জাত্যাভিমানী মানসিকতা ভুলতে পেরেছেন? এই কবিতার ছত্রে ছত্রে কবির সেই জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ্যের দম্ভ কি নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে? হাজার বছর একত্রে অবস্থান সত্ত্বেও মুসলানরা কি তাদের স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দিয়ে হিন্দুদের সাথে 'একদেহে' কোনদিন 'লীন' হয়েছে? তাই সবার একত্রে মিলবার স্থান সবচাইতে স্পর্শকাতর বর্ণবাদী হিন্দুর যজ্ঞশালা ছাড়া আর কোথায় হতে পরে? হায়রে বিশ্বকবির সত্যনিষ্ঠা! আর এই যজ্ঞশালার রক্ষী? তা একমাত্র হিন্দু ছাড়া আর কেইবা সঙ্গতভাবে হতে পারে?

তারপর, অন্য ধর্মাবলম্বী এক বিরাট জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সত্তা, দশ-বারো কোটি মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, তাহজীব- তমদ্দুন ও যে এইসব কালকূট ভরা অশুভ আকাংক্ষা অভিলাষের মুখে বস্তুবিশেষ নিক্ষেপ করে এই ভারতের বুকেই জলজ্যান্ত বিদ্যামান এবং তা অত্যন্ত অপ্রতিরোধ্যভাবেই-, ন্যায়-নিষ্ঠ, সত্যাশ্রয়ী, 'বিশ্বকবি'র উদার মানসে সে সবের স্বীকৃতির কোন বালাই আর নেই। সে সবই তিনি এই 'মহামানবের সাগরতীরে", সাগর নীরে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে ডুবিয়ে মারার উৎকট আকাংক্ষায় মত্ত হয়েছেন যেমন করে এরা ধ্বংস করেছে এই ভারতেরই চৌদ্দ পনের কোটি নিপীড়িত-নিগৃহীত হতভাগ্য তফসিলী সম্প্রদায়কে তাদের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা প্রভৃতি সবকিছু মুছে ফেলে, নিরাপদ দূরত্বে তাদের জন্য শুধুমাত্র চতুর্থ-বর্ণ, দাসের, শূদ্রের অবস্থান নির্ণয় করে যেখানে তারা বোবা, কালা, কানা, অন্ধ-অথচ কবিত্ব শক্তির প্রাচুর্যবশতঃ এবং জগৎকে ধোঁকা দেবার 'মহৎ' অভিপ্রায়ে- ভন্ডামির চূড়ান্ত নজির স্থাপন করে অবলীলাক্রমে পংক্তির পংক্তি নির্দ্বিধায় রচনা করতে পারলেন ঃ "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ আপমান, অপমানে হতে হবে সারা তাহাদের সবার সমান" এবং জারজ নীচ কুলোদ্ভব জাবালা পুত্র সত্যকামের বন্দনা গীতি- "অব্রাক্ষণ, নহ তুমি তাতঃ, তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্য কুলজাত" "এইসব মূঢ় মূক, ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা। ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা" ইত্যাদি নব নব ছন্দে নব নব ঢং-এ এই সব 'মহৎ' হতেও মহত্তর বাণী অথচ তিনিই 'বিশ্বকবি', তারই দেশবাসী কোটি কোটি মুসলমানের সত্তা, যার কাছে স্বীকৃতি পায় না! ডাঃ সুশীল গুপ্তের ভাষায় এসবই প্রয়োজনে সৃষ্ট তার 'রোমান্টিক ভাবুকতা' মাত্র।

www.pathagar.com

শেষ কয়টি চরণে 'বিশ্বকবির' আর্য অহমিকা ও ব্রাহ্মণ্যের জাত্যাভিমান চরমে পৌঁছে গেছে। ['দ্রোণ গুরু' কবিতায় মোহিতলাল-মজুমদারের আর্য অহমিকা ও ব্রাহ্মণ্যের জাত্যাভিমান এর সঙ্গে তুলনীয়] "এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান/ এসো, এসো আজ তুমি ইংরেজ, এসো, এসো খ্রষ্টান/এসো ব্রাহ্মণ শূচি করি মন, ধরো হাত সবাকার।"

সবাই আসবে তবে এই 'পুণ্য তীর্থের মহামানব বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দয়া করে মনটা শূচি করে সবাকার হাত ধরলে, হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ সবাইকে স্পর্শ করলে, এইখানেই তো সব গোলমাল,—তবেই মার মঙ্গলঘট ভরা যেতে পারে-সবাই জাতে উঠতে পারে। ব্রাহ্মণ না এলে কিন্তু সবই পন্ড।

এখানেও সেই ব্রহ্মণ্য শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী বর্ণবাদী অহমিকা! বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর বিংশ শতাব্দীতেও এই মন-মানসিকতা-নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবির আসনে নন্দিত হয়েছেন। আশ্চর্য!

দীর্ঘকাল ধরে মুসলিমের রক্তে হিন্দুসমাজ যে হোলি খেলছে তা কি বিভেদ ভোলার ইঙ্গিত বহন করে? বর্ণ-বৈশিষ্ট্যবিহীন ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই কি কোনদিন তার নিজের বর্ণবাদী জাত্যাভিমানী মানসিকতা ভুলতে পেরেছেন?

অথচ এর মোকাবেলায় নজরুল?

"গাহি সাম্যের গান/ যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান/যেখায় মিশেছে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খৃষ্টান/ গাহি সাম্যের গান/ মসজিদ এই, মন্দির এই, গীর্জা এই হৃদয়; এইখানে বসে ঈশা-মুসা পেল সত্যের পরিচয়/এইখানে বসি, গাইলেন তিনি কোরআনের সাম্যগান/মিথ্যা শুনিনি ভাই/এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই।"

এখানে যজ্ঞশালার মতো কোন কিছুর প্রয়োজন হোল না। ব্রাহ্মণের মত কাউকে দিয়ে হাত ধরার ও প্রয়োজন হলো না। একি নয় অধিক সাম্যবাদী? অধিকতর উদার-উন্নত মন-মানসিকতার ও অধিকতর উন্নত মানবিকতাবোধের পরিচায়ক নয় কি? নয় কি এ অধিকতর মহনীয়, অধিকতর শ্রেয়; অধিকতর বরণীয়? অধিকতর মানবতাবাদী? রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রতিভার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেও একথা অত্যন্ত নির্মমভাবেই সত্য বলে প্রমাণ হবে যে, তিনি তার স্বভাবজাত সংকীর্ণতা, জন্মজ বর্ণবাদী অহমিকা এবং শোণিত ধারায় বংশ পরম্পরা প্রবাহিত পৌত্তলিকতা এবং তজ্জনিত দুঃখজনক দূর্বলতার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি এবং এ সত্যও অনস্বীকার্য যে, ভারতে তার নিজদেশ বা বহির্বিশ্বে প্রতিষ্ঠা অর্জনের মূলে তার অনস্বীকার্য প্রতিভা ছাড়াও ছিল সুপরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যমূলক, সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত ব্রিটিশ এবং হিন্দু প্রচার-প্রচারণা।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও বিপ্লবী মানসের স্বরূপ

।। এক ।।

মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু জাতীয়তার পরিপোষক বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রিটিশ তোষণ নীতির ন্যায় রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ কারণে দাস্যসুলভ ইংরেজ তোষণনীতি সযত্নে প্রতিপালন করে গেছেন।

১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লী দরবার উপলক্ষে -যে দরবারে বঙ্গভাষাভাষী মুসলিমদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নস্যাৎ করে বর্ণহিন্দুদের মুসলিম শোষণ নীতির সমর্থনে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করা হয়—এবং পূর্ববঙ্গকে পুনরায় হিন্দু প্রধান পশ্চিম বঙ্গের সাথে জুড়ে দেয়া হয়- বর্ণ হিন্দু "বাঙ্গালী' প্রধান এবং জমিদার রবীন্দ্রনাথ সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তার সেই বিখ্যাত সম্রাট বন্দনাগাথা..... "জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা" ইংলন্ডেশ্বর ও ভারত সম্রাটকে নিবেদন করেন। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল শাসন যুগে যে হিন্দু সমাজ মোগল সম্রাটকে 'দিল্লীশ্বরো' বা 'জগদীশ্বরো' বলে আভূমি প্রণতিসহ বন্দনা অর্চনা করত, সেই হিন্দু সমাজের বিংশ শতাব্দীর হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এ একটা অভিনব অভিব্যক্তি বটে!

হিন্দুদের প্রতি ব্রিটিশের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতির প্রতিদানেই শীর্ষস্থানীয় বর্ণহিন্দু ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সম্রাটকে প্রদত্ত হীনমন্যতাসূচক এই শেরেকী ভাবপূর্ণ কাব্য অভিনন্দন। 'বিশ্বকবি' হলেও বর্ণহিন্দু প্রধান জমিদার রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলের মত বিষয় বুদ্ধিবিহীন ছিলেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এও লক্ষণীয় যে, এই সময়েই ইংলন্ডের রাজকবি ইয়েটস প্রমুখ ইংরেজ সুধীবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে 'গীতাঞ্জলীর' ইংরেজী সংস্করণ প্রাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী মহলে বহুলভাবে প্রচারিত হয়। যার ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথের সমাদর-সংবর্ধনা। এর আগে রবীন্দ্রনাথ নিজ দেশে এতাদৃশ সমাদর লাভ করেননি। তখন মাইকেল হেমচন্দ্রনবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিগণই স্বীকৃতিরযোগ্য বিবেচিত ছিলেন। বরঞ্চ প্রথমদিকে তাকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অনেক সাহিত্যিকেরই বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি সাময়িকীতেও তার বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়। এমনকি কালী প্রসন্ন বিদ্যাসাগর তাকে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন, "মাথার পাগড়ী আর, ব্রীফলেস্ ব্যারিষ্টার। ক' বর্গের পঞ্চম বর্ণ--'ঙ' রে আমার"। রবীন্দ্রনাথ তখন টুপী-পাগড়ী ব্যবহার করতেন। তখনও পদস্থ হিন্দুরা মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদের রেওয়াজ সম্পূর্ণ বর্জন করেননি। [রবীন্দ্রনাথ একবার ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন।]

www.pathagar.com

এসব কারণে প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বর্ণহিন্দু প্রধানগণ যখন 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে সভা করে সংবর্ধনা জানান, তখন স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে অনুযোগ করেছিলেন যে, পাশ্চাত্যে বিদেশীরা তার স্বীকৃতি দেয়ার পরেই কেবল তার স্বদেশবাসীরা তাকে স্বীকৃতি দিলেন।

অবশ্য এ একটা ওপেন সিক্রেট যে, এসব প্রাইজ অনেক সময়েই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়ে থাকে। ভিয়েতনামের আগ্রাসনবাদী যুদ্ধের বিভীষিকা আরও তীব্রতর করার কৃতিত্ব যার শিরে, ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর নায়ক সেই কুখ্যাত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নিক্সনের শিরেও নোবেল প্রাইজের লেবেল অর্পণযোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকে। জুলী ও কুরী শান্তি পুরস্কার ও রাজনৈতিক কারণেই প্রদত্ত হয়েছিল। আরব ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিকারী মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ারা সাদাত এবং আরবদের মহাশত্রু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী রবীন, যিনি লেবাননে আগ্রাসন চালিয়েছিলেন, অনুরূপ কারণেই 'নোবেল শান্তি' পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হন।

১৯২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে মিঃ গান্ধী প্রতিশ্রুত 'স্বরাজ' যখন এলো না এবং ইউপির চৌরীচৌরার (৫জানুয়ারী, ১৯২২) নৃশংস হত্যাকান্ডের পর যখন মিঃ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দালনের ব্যর্থতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিল এবং ১২ জানুয়ারী, ১৯২২ সালে যখন আতঙ্কগ্রস্থ মিঃ গান্ধী অসহযোগ আনোলন প্রত্যাহার করলেন, তখন অনেকটা এরই ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে ওঠে। এই সন্ত্রাসবাদীগণ-অরবিন্দ প্রমুখ হিন্দুনেতৃবর্গ-বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন সংক্রান্ত প্রথম পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ সমর্থনের ন্যায় এবারও তার প্রচুর সমর্থন লাভের আশায় প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এদিকে একটু ঝুঁকেও ছিলেন। কিন্তু পরে ব্রিটিশ সরকারের সতর্কবাণী এবং সেই সাথে পর্যাপ্ত প্রলোভন-আশ্বাস রবীন্দ্রনাথকে এসব ব্যাপারে তার সাহিত্য প্রতিভাকে বেশ একটু মেপেজুপে হিসাব করে ব্যবহার করতে বাধ্য করে।

বলাবাহুল্য, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা তখন ঘোরসঙ্গীন-- বিশেষতঃ ভারতে খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন ও নতুন পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তার সাম্রাজ্য রক্ষা, সাম্রাজ্যে শান্তি নিশ্চিত করার স্বার্থে তৎকালীন হিন্দু সমাজের অগ্রণী, 'বাঙ্গালী' বর্ণহিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় জোড়াসাঁকো জমিদার পরিবারের প্রতিভূ, আই, সি, এস, জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহোদর রবীন্দ্রনাথের মত একটি বিরাট সম্ভাবনাময় সাহিত্য প্রতিভার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতার যথোপযুক্ত মূল্যায়ন করতে কোন ভুল করেননি। তাই তারা বীরভূমের বোলপুরে হিন্দু উপনিষদ বর্ণিত মুণি-ঋষি প্রবর্তিত 'আরণ্য বিদ্যাপীঠের' অনুকরণে সহশিক্ষা সম্বলিত রবীন্দ্রনাথের

www.pathagar.com

নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'শান্তিনিকেতনাশ্রমে'র জন্য সর্ব প্রকার আনুকূল্য ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত ও প্রভাবান্বিত করেন। পূর্বোক্ত রাজকবি ইয়েট্স এর সহযোগিতায় গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ ও পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার প্রচার প্রপাগান্ডা, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ লাভ, মিঃ টমসন, সি এফ এন্ড্রুজ প্রমুখ ইংরেজ মনীষীগণের 'শান্তিনিকেতনাশ্রমে' আগমন, অবস্থান, শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান-এসকলই ছিল নিতান্ত প্রচ্ছন্নভাবে হলেও এই দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণে ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজমের স্বার্থে পরিচালিত ইন্দো-ব্রিটিশ কূটনৈতিক প্রচেষ্টার অঙ্গবিশেষ। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের, তথা ইংরেজদের কার্যাবলীর আলোচনা সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীতে ও কোন কোন উপন্যাস যেমন 'ঘরে বাইরে'র স্থানবিশেষে যেখানে বিলেতী জিনিস বর্জনের প্রসঙ্গ আছে....এ সত্যের নির্ভুল সন্ধান পাওয়া যাবে যে, অনেক স্থানেই রবীন্দ্রনাথ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রকারান্তরে ব্রিটিশ মাহাত্ম প্রচারণার সম্পূরক ভূমিকা পালন করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ তখন এই বণবাদী 'বাঙ্গালী' হিন্দু সমাজেরই কবি ঈশ্বরগুপ্তের "রাজ বিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে, কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি/ তোমার জয়ের বাসনা" পর্যায়ে নেমে এসেছে। যে ব্রিটিশ রাজত্বের কল্যাণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বর্ণহিন্দু সমাজের সামন্তবাদী নেতৃবর্গ সুবিধাভোগী জীবন-যাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন, যার কল্যাণেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার এবং অন্যান্য বর্ণহিন্দু জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, যাদের নাম-নিশানা ও ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্বে ইতিহাসে ছিল না-সেই পরিবারের সেই সুযোগ সুবিধাভোগী বর্ণহিন্দু জমিদার সম্প্রদায়ের একজন হয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইংরেজ সরকারবিরোধী রাজবিদ্রোহসূচক কোন কথা বলা যে আদৌ সম্ভব বা স্বাভাবিক ছিল না, তা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের ইংরেজ তোষণনীতি হতেই সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

এই কারণেই জেনারেল ও'ডায়ার কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার পর দেশব্যাপী বিক্ষোভের মুখে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করলেও তাঁর লেখনীতে স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ বা বিপ্লবমুখী ভাবধারার অবিশ্বাস্য রকম অনুপস্থিতি। যদিও বা স্বাভাবিক প্রেরণা বশে কোথায়ও বিদ্রোহ বিপ্লবের বাণী সুচিত হয়েছে, বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই রোমান্টিসিজ্‌ম, ভাবুকতা ও অতীন্দ্রিয়বাদের কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে তা 'মহানির্বাণের' পথে বিলীন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় সংগ্রাম, বিপ্লব, বিদ্রোহের বাণী, প্রলয় ঝঞ্ঝাসম ভীষণ বেগে উত্থিত হয়ে শেষতক অত্যন্ত 'মহৎ দার্শনিকতার' ধূম্রজালে, বিশ্বপ্রেমের রোমান্টিকতার জলাভূমিতে পথ হারিয়েছে। 'থর থর করি কাঁপিছে ভূধর- শিলা রাশি রাশি পড়িছে ধসে', 'ফুলিয়া

www.pathagar.com

ফুলিয়া ফেনিল সলিল গরজে উঠিছে দারুণ রোষে', আমি ভাঙ্গিব, পাষাণ কারা','ভাঙ, ভাঙ, কারা আঘাতে আঘাত কর।' --পরশুরামের কুঠারাঘাত সম এইসব তর্জন গর্জন এবং প্রলয়ঙ্করী তান্ডব নৃত্যের সাথে সাথে 'কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া , রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিবরে পরাণ ঢালি', অথবা, 'ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি গেয়েছে রবির কর।'-এসে যখন বিদ্রোহ-ঝঞ্ঝা-তান্ডব নৃত্যের বদলে, উবর্শী মেনকার চটুল লাস্য পরিবেশনা শুরু করে, তখন বিপ্লব বিদ্রোহের কুঠারসহ ভৃগুনন্দনের পক্ষে দড়ি কলসী নিয়ে জাহ্নবী সলিলে ডুবে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের 'বিপ্লবী' মানসের দুর্বার প্রকাশ, 'এবার ফিরাও মোরে'র বিপ্লবী বাণী, নিপীড়িত মানবতার দরদে ভরা 'স্ফীত কায় আপমান/অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান/লক্ষ মুখ দিয়া/বেদনারে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার/এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা/মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে, যার ভয়ে ভীত তুমি যে সে অন্যায় ভীরু তোমাচেয়ে/যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পলাইবে ধেয়ে। পথ কুক্কুরের মত, সংকোচ-সন্ত্রাসে যাবে মিশে/অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু/চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু/ সাহস বিস্তৃত বক্ষপট' ইত্যাদি চরণগুলোতে যখন বিপ্লবী উত্তেজনা হিমালয়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় পৌঁছে গেছে, ঠিক তখনই আবার বাউল বৈষ্ণবের প্রেমসঙ্গীতের মত, 'কি গাহিবে, কি শুনাবে? বলো মিথ্যা আপনার সুখ/ স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে. সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে' এবং 'জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন, (আহা) মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখ নিশা, তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।' প্রভৃতি অতীন্দ্রিয়বাদের কুয়াশা কান্না বিপ্লবের বাণীকে দেহাতীত প্রেমের বাণীর 'সাগর সঙ্গমে' নাকানি-চুবানি খাইয়ে দেয়। এরই পাশপাশি দূরন্ত আশার 'মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে', তখনি আবার আমরা 'স্তন্যপায়ী বঙ্গবাসী অন্নপায়ী জীব', অবশ্য তাঁর ভাষায় এই 'জীব'দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজে পয়লা কাতারের প্রথম নম্বরের ব্যক্তিই বটে।

এতে করে এ সত্য উপলব্ধি কষ্ট কর নয় 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে' -- এ সমস্তই ছিল, ডাঃ সুশীল গুপ্তের ভাষায়ঃ 'রোমান্টিক ভাবুকতা' মাত্র, দৃঢ়মূল সত্যোপলব্ধির সত্যিকারের আন্তরিক প্রকাশ মোটেই নয়। এসবই ছিল নিছক কবিত্ব এবং তা পাঠকের কাব্য তৃষ্ণা তৃপ্তির জন্য মাত্র.....কবির নিজের সত্যিকার চিন্তা বিশ্বাসের সাথে সম্পূর্ণ সংশ্রবহীন।

বেশী চেপে ধরলে কথার যাদুকর রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়তের কোন অভাব হওয়ার কথা নয়।

www.pathagar.com

চীন ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক হিন্দু সভ্যতার জয়ঢাক পিটানো এবং হিন্দু প্রাচ্যের পুনরুত্থানের (অর্থাৎ হিন্দু উপনিবেশবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার) বাণী প্রচারের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের বিক্ষোভ প্রদর্শনের মুখে যেমন তিনি আত্মরক্ষা করেছিলেন, 'আমি প্রচারক নহি, আমি কবি,' এইবলে নিজের সাফাই গেয়ে।

বিপ্লবের বাণীর দুরন্ত প্রকাশের সাথে তার অতীন্দ্রীয়বাদ বা বিশ্বপ্রেমের বাণী এমনি বেখাপ্পা ধরনের বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে, যে কথার এত 'মহৎ' যাদুকরী প্রতিভা সত্ত্বেও তা ঠিকমত ঢাকা পড়ে না।

'নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ, এবার ফিরাও মোরে' 'দুরন্ত আশা' প্রভৃতি বিপ্লব বিদ্রোহসূচক কাব্যের কবি হলেও যেখানে অত্যাচারের নিগড়ে আবদ্ধ মানবতার নবজাগ্রত প্রতিরোধের সংগ্রাম, যেখানে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের দুর্দমনীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার দূর্বার প্রকাশ, সেখানে তিনি যেভাবে এ সমস্তকে দার্শনিকতার কুহক কুয়াশাচ্ছন্ন করে প্রকৃত সত্যোপলব্ধির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন-দুনির্বার বিপ্লব বিদ্রোহের শিশুকে- যদিও অবাঞ্ছিতভাবে জাত-অতীন্দ্রিয়বাদ ও বিশ্বপ্রেমের 'সাগর সঙ্গমে' জন্মকালেই আঁতুড়ে বিসর্জন দিয়ে যেভাবে তার কাব্য প্রতিভার অপব্যবহার করেছেন তাতে তিনি তার অনন্যসাধারণ প্রতিভার কারণেই, যথেষ্ট প্রশস্তি, অভিনন্দন ও স্বীকৃতি লাভ করা সত্ত্বেও সর্বতোভাবেই নিন্দার্হ—যেমন নিন্দার্হ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র। এসবই হয়েছে দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের আবেদনের প্রতি প্রবঞ্চনামূলক ইংরেজ তোষণ নীতি ও সীমাবদ্ধ-সংকীর্ণ বর্ণাশ্রয়ী আর্য অহমিকার কারণে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, ভাবের ঘরে এই যে, উৎকট পোলারাইজেশন, এই যে প্যারেনথিসিস-ভাবের ভাবান্তর, বৈপরীত্য- বাংলা কথায় এই যে ভাবের ঘরে চুরি, মিঃ গান্ধীর প্রয়োজন কালের 'ইনার ভয়েস' বা দিব্যবাণীর মত এই যে তাঁর সময়ে-অসময়ে 'অতীন্দ্রিয়বাদে' যথেচ্ছ বিহার, এ কি ছিল কাব্যেরই নিজস্ব তাগিদে না অন্য কোন স্থূলতর কারণে? কেন রবীন্দ্রথের বিপ্লব বিদ্রোহের তর্জন-গর্জন তার রেশটুকু মিলাতে না মিলাতে, প্রেম সিঞ্চিত, সুস্নিগ্ধ মেঘ-মালার আঝোর ধারায়, অসহায় ক্রন্দনে পর্যবসিত? কেন এই যৌবনজ্বরা?

আসলে এ সকল ক্ষেত্রেই হেতু ছিল একটিই-যা মোটেই আর্ট বা কাব্যসুষমা দর্শন সম্পৃক্ত কোন নীতির প্রশ্ন নয়। যা ছিল প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রনীতি বা কূটনীতি বা সোজা কথায় রাজরোষ ভীতি এবং এর মোকাবেলায় পৌরুষের অত্যন্ত দুঃখজনক অসদ্ভাব। অন্যথা 'আনন্দ মঠের' সন্তান সংস্থারজনক 'বন্দেমাতরমের' ঋষিকে আনন্দ মঠ নয়, নিরানন্দ আন্দামানেই স্থান সন্ধান করতে হত এবং 'প্রভাত সঙ্গীতের' কবিকে অন্তরীণের অন্ধকার কারাকক্ষেই 'ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা আঘাতে আঘাত কর' বাণীর বাস্তব রূপায়নে নিয়োজিত থাকতে হত।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে, বর্ণবাদী সামন্ততান্ত্রিক সুবিধাভোগী এইসব রোমান্টিক ভাবুকতাবিলাসী জাতীয়তাবাদী কবি ঔপন্যাসিকগণ ভয়-ভাবনাহীন 'ধূমকেতুরূপ' নজরুলের মতো লাভ-লোকসান ফলাফলের তোয়াক্কাবিহীন দেশপ্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্ণবাদী বিত্তশালী সমাজের আরাম আয়েশ এবং বৃটিশ সরকার প্রদত্ত অখন্ড শান্তির সুযোগ সুবিধা হারাতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, গাছেরটা এবং তলারটা-দুটোই তাদের চাই।

ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস! যে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে অপরাধী করেছিলেন, 'মনোযোগানো' লেখা-লেখার জন্য, 'তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচার অভিযোগ এনে এবং 'চিত্ত যেথা ভয়শূণ্য উচ্চ যেথা শির' এর মতো বাণীর জন্ম দিয়েছিলেন সেই অত্যুচ্চ নীতিমালার কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্যসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা নিয়োজিত করলেন অকুতোভয়ে সত্যোপলব্ধি প্রকাশের জন্য নহে বরঞ্চ ভাষার যাদু ও কাব্যের আভরণে এবং দর্শনের আবরণে সেই সত্যোপলব্ধির বিকৃত এবং ধিকৃত প্রকাশে সেই উপলব্ধিকে সার্থকভাবে বানচাল করতে। এ সম্বন্ধে বছর কয়েক আগে 'সাপ্তাহিক গণশক্তিতে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে কিছুটা আলোকের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। "কিন্তু স্বাধীনতা? স্বাধীনতার সাথে কি রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ তার আমলে (প্রথম মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কালীন) বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে কোন ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারেননি, সেদিনের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তির প্রেরণা হতে পারেননি, সেই রবীন্দ্রনাথের এতদিন পরে হঠাৎ স্বাধীনতার প্রেরণা হিসেবে গজিয়ে ওঠার অসামঞ্জস্য দৃষ্টি এড়াবার নয়।' (সাপ্তাহিক গণশক্তি, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩ রোববার ২৩/৫/৭৬)।

এই প্রসঙ্গে, এই সময়ে এদেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী মহলে ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে স্বাধীনতার 'অনুপ্রেরণা' সৃষ্টিকারী হিসেবে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা স্মর্তব্য।

"এক সামন্ত জমিদারের শ্রেণীচেতনা, যা বিদেশী রোমান্টিক সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে--একটা বিশেষ পথে নিজস্ব বিকাশ ঘটাতে পেরেছে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী স্বর্গের ভিত।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রকাশ্য সভায় ইংরেজ প্রশস্তির রাজনীতিকে বহুবার সমর্থন জানিয়েছেন।'

'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার মত উদ্যম অথবা সাহস তার ছিল না। তার শ্রেণী স্বার্থবোধ ও তাকে এ কাজ থেকেকে বিরত রেখেছে,

'আফ্রিকায় সামাজ্যবাদী অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি লেখেন' 'এবার ফিরাও মোরে'। কিন্তু দেশীয় রাজনীতিতে এগিয়ে চলা-- গা বাঁচানোর ভূমিকার সাফাই

www.pathagar.com

গাইতে এ কালের অনেক কবির মতই তাকে বলতে হয়েছিল, "আমি, রাজনীতিক নই, আমি কবি।" ঐ

রবীন্দ্রবাদীরা তাঁর দেশপ্রেমের প্রমাণ হিসেবে যা খাড়া করার চেষ্টা করেন, তা হচ্ছে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের স্যার উপাধি ত্যাগ। 'কিন্তু অইটুকুই' --- 'সমসাময়িক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, 'বলাকা', 'পলাতকা' 'অথবা' শিশু ভোলানাথে' জালিয়ানওয়ালাবাগের অশান্তির চিহ্ন মাত্রও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিতে উদাসীন ছিলেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তথাপি তিনি নীরব থেকেছেন ---তাঁর শ্রেণী স্বার্থ নীরব থাকতে নির্দেশ দিয়েছে-রবীন্দ্র কাব্যে 'জীবন দেবতা', মানস সুন্দরীর' মতো কোন অতি মানবিক সত্ত্বার অথবা 'ঈশ্বরের' অবতারণাও এই কারণেই----সব দায় এক অপার্থিব অস্তিত্বের ঘাড়ে চাপিয়ে (মিঃ গান্ধীর ইনার ভয়েস- বা নিজস্ব দৈববাণীর মত) তিনি নিজের দায় মোচন করেছেন।,

'এই শ্রেণী কাঠামোকে অস্বীকার করার মতো সব প্রতিভাই তাঁর ছিল। শুধু ছিল না সাহস। তাই রবীন্দ্রনাথ সকলের মর্মস্পর্শ করতে পারেননি--হয়ে আছেন এক বিশেষ শ্রেণীর কবি। তাই এক বিশেষ শ্রেণীর কবি হিসেবেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল।' ঐ

প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইংরেজ গভর্ণমেন্টের তোষক, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক প্রধান স্তম্ভ সামন্তবাদী প্রজা পীড়ক 'বাঙালী বর্ণহিন্দু' জমিদার শ্রেণীর এক বিশিষ্ট নেতা। প্রজাপীড়ক হিসাবে এই ঠাকুর জমিদার পরিবারের পরিচয় ঐতিহাসিক। প্রজাকূলের -যে প্রজাকূল প্রধানতঃ ছিল মুসলমান–শোষক ও পীড়ক হিসাবে পুরুষ পরম্পরা লব্ধ উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্য হতে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। [ঐ]

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের ঃ প্রজা পীড়ক দরিদ্র শোষকের ঐতিহ্য

এই প্রসঙ্গে বর্তমান ভারতের একজন স্পষ্টভাষী সমালোচক মিঃ হিতেন্দ্র মিত্র পরিবেশিত ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্বলিত তথ্যাবলী ও তাঁর নিরপেক্ষ অভিমত বিশেষভাব প্রণিধান যোগ্যঃ

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, যারা বৃটিশ রাজত্বের ফলশ্রুতিতে সম্পদশালী হয়েছিলেন এবং শ্রেনীস্বার্থের পরিপোষক ভাবধারা দ্বারা যে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সে কথা ঐতিহাসিক সত্য। যখন অন্যান্য চারজন জমিদারসহ ঠাকুর পরিবারের বিরুদ্ধে চাষী আন্দোলন শুরু হয় তখন উত্তরবঙ্গের নিজ জমিদারীর রায়তদের প্রতি ঠাকুর পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে এই শ্রেণীস্বার্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এটা ছিল পাবনার চাষীদের আন্দোলন। শুরু হয়েছিল ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে।"

এই সম্বন্ধে পাবনার তৎকালীন এ্যাসিটেন্ট ম্যজিষ্টেট মিঃ পিটার নোলন প্রদত্ত রিপোর্ট ঃ "ঠাকুর পরিবার খাজনার উপরে প্রথমে টাকায় আট আনা এবং পরে টাকায় চার আনা হিসাবে বৃদ্ধি দাবী করে, যে খাজনা, তখনও খুবই বেশী ছিল। অধিকাংশ কবুলিয়াতে তারা শর্ত আরোপ করতো যাতে করে প্রজারা গোলমাল করলে জামিদাররা তাদের উৎখাত করতে পারতো।"

ম্যাজিস্ট্রেট নোলন আরও বলেন ঃ "জমিদাররা ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির, যাদের কাছে আইনের বা মানুষের জীবনের কোন মর্যাদা ছিল না।"

মিঃ মিত্র অভিমত প্রকাশ করছেনঃ "শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের বহু চমৎকার সাহিত্য শিল্পরূপ নিয়েছে, কিন্তু এখানেই ছিল প্রজাবৃন্দের প্রতি ঠাকুরদের নির্মম তীব্র শোষণ।"

"শিল্প সাধনার ব্যাপারে ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে, তাদের চরম উৎকর্ষ সত্ত্বেও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ-বিরুদ্ধ কোনকিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিত।"

তারা--জোর জবরদস্তি অত্যাচার করত এবং নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে প্রজাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাতে দ্বিধাবাধ করত না।"

"রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতি নিয়েই (এবং তিনি নাকি মহর্ষিও বটে) প্রজাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কাল্পনিক নৃশংস অত্যাচারের কাহিনীর বর্ণনা করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের নিকট অভিযাগ উত্থাপন করেন বিদেশী শাসক কর্তৃক এদের শায়েস্তা করার অনুরোধ জানিয়ে। বাংলার রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর নিকট বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৮৭৩ সালের ১ জুলাই তারিখে চিঠি দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

"কলিকাতা----তারিখ---১ জুলাই, ১৮৭৩। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে বাংলার গর্ভনমেন্টের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী বরাবরে।"

"আমি পাবনা জেলার শাহজাদপুরের আমাদের পরিবারের জমিদারীর ম্যানেজার প্রেরিত সংবাদ পেয়েছি যে, নিকটবর্তী জমিদারীতে এবং আমাদের জমিদারীতে প্রজারা সাংঘাতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে। এমনকি লোকজনের জীবন, সম্পত্তি এবং পারিবারিক সম্মানও নিরাপদ নয়। এই সমস্ত গ্রামে নিরাপত্তার অভাববোধ এত বেশী যে, যেকোন মুহূর্তে এবং যে কোন স্থানে বিপদের আশংকা করা হচ্ছে এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক শান্তি শৃংঙ্খলা স্থাপনের জন্য যদি জোরালো ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে যে বিশৃঙ্খলা বর্তমানে স্বল্পতর স্থানে নিবদ্ধ আছে, তা বিসতার লাভ করবে। আমার ম্যানেজার এবং লোকজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেছে এবং আমি মাননীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর মহোদয়ের নিকট আরজ করছি এই বিনীত আশা নিয়ে যে, মাননীয় মহোদয় মেহেরবাণী করে পাবনা জেলার ঘটনাবলীর প্রতি নজর দিবেন এবং গরীব ও নিরীহ প্রজাবৃন্দের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন- যারা দাঙ্গাকারীদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছে, অথবা যাদেরে অত্যাচার করবে বলে শাসিয়েছে।"

আশ্চর্যের বিষয়, তথাকথিত দেশপ্রেমিক কাগজগুলো 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রভৃতি বর্ণ হিন্দু জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ-ধ্বজাবাহী পত্রিকাগুলো (এদের সুরে সুর মিলিয়ে)' গরীব প্রজাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচার প্রচারণা আরম্ভ করে যার বেশীর ভাগই ছিল সত্য বিবর্জিত, অতিরঞ্জিত, সত্ত্বের বিকৃত প্রকাশ।'

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ বাকল্যাণ্ড গরীব প্রজাকুলের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এইসব অত্যাচারের কাহিনী পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন। তাঁর ভাষায় এরা 'ইজ্জৎহানির যে কাহিনীগুলো ছড়িয়েছে, তা ভিত্তিহীন'। ম্যাজিস্ট্রেট নোলন বলছেন ঃ 'অন্যান্য জমিদারদের মত ঠাকুররাও প্রজাদের নিকট হতে বেআইনী সেস আদায় করত, শারীরিক নির্যাতন চালাত এবং লঠিয়াল নিয়ে প্রজাদের উপর অত্যাচার জুলুম করত।'

"এই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ প্রজা নিপীড়নের উদ্দেশ্যে তারা শিখগার্ড রাখত। ম্যাজিস্ট্রেট নোলনের মতে অন্য জমিদারের তুলনায় ঠাকুররা ছিল বেশী অত্যচারী।"

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল প্রায় বারো বছর।

কাজেই এসব তার একেবারে অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখায় এই সব অত্যাচারের কাহিনীর প্রকাশ নেই। তার সুবিখ্যাত 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থের যেখানে তাঁর ৫/৬ বছর বয়সেরও অনেক খুঁটিনাটি ঘটনা অত্যন্ত মধুর ভাষায় বর্ণিত রয়েছে, সেখানেও এসবের কোন উল্লেখ নেই এবং তা অত্যন্ত

www.pathagar.com

সহজবোধ্য কারণেই। কারন এ সবের উল্লেখ তার বর্ণহিন্দু জমিদার শ্রেণীস্বার্থের পক্ষে মোটেই অনুকূর ছিল না। কিন্তু "অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণ তারে যেন তৃণ সহ দহে।" "এ জগতে হায় সেই বেশী চায়, আছে যার ভুরি ভুরি, রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।" এবং "স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছি পান, লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস" প্রভৃতি সুবিখ্যাত কবিতার কবি --- 'সৌখিন দরিদ্র বন্ধু', 'রোমান্টিক বিপ্লবী', 'দেশপ্রেমিক', 'বিশ্বকবি', রবীন্দ্রনাথের এই ছিল মুখোশ উন্মুক্ত সত্যিকার পরিচয়। এইসব পর্যালোচনার পরে হিতেন্দ্র মিত্র অত্যন্ত সুন্দর এবং সঙ্গতভাবেই তার বক্তব্যের উপসংহার টেনেছেন এই বলে ঃ "রবীন্দ্র প্রশস্তিকারগণ ঠাকুরদের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থের জন্ম এবং শ্রেণীস্বার্থ আচরণ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বাংলার রেনেসাঁজাত আধুনিক বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিশেষ দূত বলে অভিনন্দিত করে থাকেন তারা ভুলে যান যে, ঠাকুর পরিবার যে ঔপনিবেশিক রেনেসাঁর নেতৃত্ব দেন, তা ভারতে বৃটিশ শাসন কায়েমের স্বার্থে, ভারতীয় যোগসাজশকে বেশ ভালভাবে শক্তিশালী করে।

পাবনার প্রজা বিদ্রোহের পটভূমিকায় জমিদার বনাম প্রজাকূলের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত। এই অবস্থান অবশ্যই ঠাকুরদের (রবীন্দ্রনাথসহ) ভাবমূর্তির ঔজ্জ্বল্য বর্ধন করে না।"

(পাবনার প্রজাবৃন্দ এবং ঠাকুর পরিবার ঃ হিতেন্দ্রমিত্র ঃ ফ্রন্টিয়ার '২০ অক্টোবর ১৯৭৯।)

বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্যে পৌরুষের যে বিস্ময়কর অনুপস্থিতি তা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। কি স্বাধীনতার বাণীতে সমগ্র দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে, কি সমাজ দেহের সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট আচার-বিচার সংস্কারের বিভিন্ন বিষাক্ত ক্ষত সংস্কারের প্রয়োজনে, কি এই বিরাট সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কলহ বিবাদ, বিভেদ-হিংসা-দ্বেষের শিকার, বিভিন্ন ধর্মানুসারী জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াসে---কোন ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের পৌরুষের কোন সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় না।

জন্মলব্ধ এই এত প্রতিভাসম্পন্ন মানস, সামাজিক এবং পারিবারিক এত সুযোগ-সুবিধা, এত পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক আনুকূল্য, এত সুচারু নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আজন্ম জীবনযাপন, বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা-দীক্ষার এত অনুকূল ব্যবস্থা, স্ব-সম্প্রদায়ের এবং রাষ্ট্রশক্তির এত সাহায্য-সহযোগিতা, এত দীর্ঘ জীবন এবং সেই সাথে জাতির সেই ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্নে একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বাদ-প্রতিবাদের ঘূর্ণাবর্ত ..... এই যে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় যুগসন্ধিক্ষণ-, এই পরিস্থিতিতে আবেগদীপ্ত পৌরুষের যে মহৎ 'আবাহনী' বাণীর প্রয়োজন ছিল, তার সন্ধান দিতে

www.pathagar.com

রবীন্দ্র সাহিত্য অত্যন্ত দুঃখজনকভাবেই ব্যর্থ। এই দিকে রবীন্দ্রনাথের অবদানঃ "যৌবন রে তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে/ তুই যে পারিস কাঁটা গাছের উচ্চ ডালের পরে, পুচ্ছ নাচাতে'"/ "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা"/ "মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে"/ "পুণ্য পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে, মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।"/ ক্ষমা যেথা হীনদূর্বলতা,/হেরুদ্রনিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা"/"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।" "শিকল দেবীর অই যে পুজোবেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া/পাগলামী তুই আয়রে দুয়ার ভেদি।" ঝড়ের মত বিজয় কেতন নেড়ে/অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে/ ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে/ভুলগুলো সব আনরে বাছা বাছা/আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

এইসব মিঠে-কড়া মধুর বুলি-অনেকটা যেন ছেলে ভুলানো ছড়া - উদ্ধৃত করে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের পৌরুষ এবং বিপ্লবী মানসের সন্ধান এবং প্রমাণের ব্যর্থ প্রচেষ্টাকরেছেন। কিন্তু এতো পর্ব্বতের মূষিক প্রসব মাত্র। দেশের ডাকে- জাতির প্রয়োজনকালে রবীন্দ্র প্রতিভার উপযোগী সে বিরাট অবদান কোথায়? কেন, এই দুর্বলতা? কেন এই পৌরুষহীনতা? প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পৌরুষের অবক্ষয়-যৌবনজ্বরাসূচিত হয়েছিল বহু পূর্বেই।

ভ্রাতৃবধূ কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমলীলা' যখন কাদম্বরী দেবীর পক্ষ হতে শুধু প্রেমিকা বা উপপত্নী নয়, প্রেমের ন্যায় সঙ্গত স্বীকৃতি ও পরিণতি বিবাহিতা বধূর মর্য্যাদার দাবীর সম্মুখীন হল তখন রবীন্দ্রনাথ প্রেমিকা কাদম্বরী দেবী, তথা নিজ পৌরুষের সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, তা বুমেরাং হয়ে তাকে প্রত্যাঘাত করতে ছাড়েনি। যে ব্রাহ্ম সমাজে --- যে ব্রাহ্ম ধর্মে বিধবা বিবাহ মোটেই অসিদ্ধ বা অপ্রচলিত নয়, সেই ব্রাহ্মসমাজী ও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হয়েও কাদম্বরী দেবীর প্রেমাঞ্জলি সাগ্রহে সানন্দে উপভোগান্তর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যখন তিনি মৃণালিনী দেবীকে (রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত- পিতৃ দত্ত নাম ছিল ভব তারিণী দেবী) পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে স্ত্রীর মর্য্যদায় ঘরে তুললেন, তখন কাদম্বরী দেবীর পক্ষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পৌরুষ তখন কাদম্বরী দেবীর এই ব্যর্থ জীবন, ব্যর্থ প্রেমের লাঞ্ছনা এবং আত্মহত্যার বেদনায় অনুতপ্ত হওয়া দূরে থাক, যেন এক অমানবিক উল্লাসে তার এই নিষ্কৃতিলাভকেই বড় করে দেখলো। 'বিশ্বকবি' অবশ্যই এই মহা দায় হতে উদ্ধার লাভ করলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু শালীনতা? মানবিকতা? নৈতিকতা? প্রেমবিহীন এই ঘোর অন্যায় কার্যের এই গুরু অপরাধের অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া হতে বিশ্বকবি হলেও, তার পরিত্রাণ নেই। তিনি কোনক্রমেই উপযুক্ত শাস্তি হতে নিস্কৃতি পেতে পারেন না, ----"তা সম্পূর্ণই বিশ্বজাগতিক ঐশীবিধি-বিরুদ্ধ"। (শিখ শক্তির উত্থান ও পতন ঃ রবীন্দ্রনাথ)।

www.pathagar.com

দেবযানীর বিদায় অভিশাপ অপেক্ষা কাদম্বরী দেবীর মরণ অভিশাপ, অধিকতর দুর্বার এবং নিদারুণভাবে মারাত্মক হওয়াই সুসঙ্গত। তাই এমন বিরাট প্রতিভা, এত শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমা এবং অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রবীন্দ্র কাব্য হয়েছেপৌরুষবিমুখ। এমন সংবেদনশীল হৃদয়, এত বিভিন্ন সৃষ্টি বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের লেখনী এই দিক দিয়ে হল অকালে বন্ধ্যা।

সেই প্রথম প্রেমের সহিত বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়াজনিত অভিশাপে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মেঘমালা শুধু স্নিগ্ধ বারিই বর্ষণ করতে পারে বজ্রগর্ভ মেঘের জন্ম দিতে পারেনি। দেশেরই দুর্ভাগ্য, দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে, দেশের সবচাইতে প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের লেখনী হল বন্ধ্যা। এক্ষেত্রে তার অবদান প্রায় শূন্যের কোঠায়। সত্যোপলব্ধির নির্ভীক প্রকাশ সম্বন্ধে অন্যকে এত নছিহত দিলেও নিজের বেলায় এই অভিশাপের কারণে রবীন্দ্র নাথের ভাগ্যে জুটলো–

"তুমি শুধু তার ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ/শিখাইবে পারিবে না করিতে প্রয়োগ।" (বিদায় অভিশাপ- রবীন্দ্রনাথ)।

এর আর এক ফলশ্রুতি, রবীন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যের ব্যর্থতা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা অনস্বীকার্য। তাঁর সৃজন শীল প্রতিভা তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল প্রভৃতি সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভাকেই ছাড়িয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসগুলো তাঁর প্রতিভা উপযোগী সার্থকতা লাভ করিতে পারেনি। ঘোর সাম্প্রদায়িকতা ও তীব্র মুসলিমবিদ্বেষ সত্ত্বেও উপন্যাসের রাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সামান্য কয়েকটি কালির আঁচড়ে ভ্রমরের যে প্রাণস্পর্শী চিত্র (কৃষ্ণকান্তের উইল) জীবন্ত আলেখ্য তিনি অংকিত করেছেন, অতি স্বল্পপরিসরের মধ্যে ও বিধর্মী যবনী নবাব নন্দিনী আয়েশার (দুর্গেশ নন্দিনী) যে চন্দ্রকৌমুদীস্নিগ্ধ শান্ত মহৎ চরিত্র পরিবেশন করেছেন বা বনকুন্তলা কপাল কুন্ডলার (কপাল কুন্ডলা) যে অনন্য, অদ্ভুত, অভিনব আলেখ্য সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্র প্রতিভা সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যে তার কোন তুলনা নেই। এমনকি, শরৎচন্দ্র তার সামাজিক উপন্যাসগুলোর মাধ্যমে যেভাবে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ সকলের অন্তর কেড়ে নিতে পেরেছেন, তাও রবীন্দ্র উপন্যাসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভাষার অপূর্ব কারুকার্য এবং মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ সত্ত্বেও তার উপন্যাসগুলোর দুর্বলতার প্রধান কারণ এসবের প্রাণশক্তির দৈন্য, বাস্তবধর্মী চরিত্রের অভাব ..... এবং এ সকলেরই মূলীভূত কারণ পৌরুষের অবক্ষয়জনিত তার বিকৃত মানস।

'ঘরে বাইরে', 'গোরা', 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি' প্রভৃতি উপন্যাসগুলো একদিকে যেমন মতামত প্রচারের বাহুল্যে পীড়িত, অন্যদিকে তেমনি রসাস্বাদনের

www.pathagar.com

পক্ষে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী। অধিকন্তু তার পৌরুষবিহীন বিকৃত মানস সৃষ্ট, অবাস্তব কতকগুলো নর-নারীর চরিত্র এবং তাদের বিসদৃশ লীলাখেলা সুস্থ বিবেক ও সাধারণ বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নিকট অশ্লীল, অসুন্দর, বেখাপ্পা বলে প্রতিভাত হয়। 'নৌকাডুবিতে তিনি যেভাবে একটি সুশীলা, বিবাহিতা নারীর (কমলা) সরল পবিত্র স্বামীপ্রেম নিয়ে উৎকট পরীক্ষা-নিরীক্ষার খেলা দেখিয়েছেন (অনেকটা তাঁরই সৃষ্ট সুরের কাঠামোতে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর সমন্বয় সাধনে তাঁর ব্যর্থ প্রচেষ্টার মত) তা সুসভ্য সমাজবদ্ধ জীবনের ভিত্তিস্বরূপ- এইসব মুল এবং মূল্যবান চেতনা অনুভূতির, সামাজিক সংস্কারের প্রতি তার অসামাজিক অশ্রদ্ধা এবং ঘৃণা-অবজ্ঞারই পরিচায়ক। সন্দেহ নেই, পরোক্ষ এবং প্রচ্ছন্নভাবে হলেও ..... যে মানস কাদম্বরী দেবীর সর্বত্যাগী প্রেমের অপমান করেও গর্বানন্দ অনুভব করতে পারে, এসব বিকৃত হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন চরিত্রগুলো সেই বিকৃত মানসেরই সন্তান। আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন যে কোন নারীই এইসব বিকৃতমানস নারী চরিত্রের প্রদর্শনীতে নিঃসন্দেহে অপানবোধ করবেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন , "যেহেতু সাহিত্য এবং ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়া তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে....একের স্বাদ...অসীমের স্বাদ।" এই এই সত্য সম্বন্ধে তারই নির্দ্দেশিত সংজ্ঞা : সাহিত্য ও আর্টে কোন বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়।"

আর্ট এবং সত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সংজ্ঞার বিচারেই তার উপন্যাসগুলোর সাফল্যের অভাব সুপ্রমানিত হবে। এই প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক 'গণশক্তির ' এক উদ্ধৃতি প্রণিধান যোগ্যঃ

"এই শ্রেণীর (কায়েমী স্বার্থবাদী বিত্তশালী বর্ণহিন্দু শ্রেণী) প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের চেতনা এই সময়ে এক শান্তিপ্রিয়, স্বার্থপরতার কাছে বন্ধকী হয়ে পড়েছে...যার প্রভাব শুধু তার রচনাতেই প্রতিফলিত নয়...যা গ্রাস করেছে তার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসার মত চরম অনুভূতিগুলোকেও। সেজন্য তিনি কাদম্বরী দেবীর (ভ্রাতৃবধু) প্রেমকে স্বীকার করে নিয়েও তার বাস্তব রূপ দেবার কথা কল্পনা করতে পারেননি। তার সামন্ততন্ত্র শাসিত সমাজে যে প্রেমের স্থান ছিল না, তাকে সর্বসমক্ষে স্থান দেবার মত প্রগতিশীল মানসিকতা এবং সাহস....এ দু'য়েরই অভাব ছিল তার। এ প্রেম তাই সহজ পরিণতি বেছে নিয়েছিল কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যায়। আর কাদম্বরী দেবীর প্রেম পুলকিত যে রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন, "আগে কে জানিত বলো, কত কি লুকানো ছিল হৃদয় নিভৃতে/ তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া, পাইনু দেখিতে।" (দৃষ্টি) সেই রবীন্দ্রনাথই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লিখেছেন, "হেথা হতে যাও পুরাতন/হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে/আবার বাজিছে বাঁশি , আবার

www.pathagar.com

উঠিছে হাসি, বসন্তের বাতাস বইছে"। (পুরাতন)। কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার মাসতিনেক আগে কবির বিবাহের ঘটনা এখানে প্রাসঙ্গিক।'

"মানবিক চরিত্র তার নিজস্ব কল্পনার সৃষ্টি, নিজস্ব চেতনার রঙে রাঙ্গানো।...বস্তু জগতে যাদের অস্তিত্ব খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতে হয়। সাহিত্য হিসেবেও ব্যর্থ হয়েছে যে কারণে তার 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি উপন্যাস।" (গণশক্তি-২৩ মে' ৭৫)

এর উপর টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

www.pathagar.com

নজরুলের দেশপ্রেম ও বিপ্লবী মানস

প্রকৃতপক্ষে নজরুল এই দেশের একমাত্র কবি ও সাহিত্যিক, যিনি ছিলেন দেশপ্রেম ও বিপ্লবী মানসিকতায় সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। বস্তুতঃ নজরুল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন শুধু একথা বললে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায় না। বরং তিনিই একমাত্র কবি ও সাহিত্যিক যিনি স্বাধীনতার প্রেরণায়, জাতীয়তার চেতনায়, স্বদেশবাসীর মুক্তি সংগ্রামের আবেদনে এই দেশের সমস্ত অধিবাসী তা হিন্দুই হোক, আর মুসলমানই হোক সকলের সাথেই নিজেকে একাত্ম করে অনুভব করতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকারের সংগ্রাম করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রোমন্টিক বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের মত দেশের গাছপালা, নদী-নালা, মাঠ-ঘাট, পাহাড়-প্রান্তর, বন-জঙ্গল নয়, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান নির্বিশেষে দেশের মানুষ এবং তাদের কল্যাণ তাদের মুক্তি এই ছিল তাঁর দেশপ্রেমের প্রেরণার উৎস এবং লক্ষ্য। তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানসের মূলভিত্তি ছিল উদগ্র, অনর্বাণ দেশপ্রেম। ভারতীয় কংগ্রেস, (প্রথম প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫)এবং ভারতীয় মুসলিম লীগ, (প্রথম প্রতিষ্ঠা ১৯০৬) সর্বভারতীয় এই উভয় রাজনৈতিক সংস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মিঃ জিন্নাহ যেমন এক সময় মিসেস সরোজিনী নাইডু কর্তৃক "এ্যামবাস্যাডর অব হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি" (হিন্দু-মুসলিম মিলনের দূত) বলে অভিনন্দিত হয়েছিলেন, (কংগ্রেসের সত্যিকার গোঁড়া হিন্দু চেহারা সম্বন্ধে মিঃ জিন্নাহর মোহমুক্তি পর্যন্ত), নজরুল ও তদ্রুপ এই অভিনন্দন লাভের জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত। (নজরুল অবশ্য মোহভঙ্গ পর্যন্ত সজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন না।)।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর ১৯২৫ সালের 'সওগাতে' প্রকাশিত চিঠির জবাবে ১৯২৭ সালে নজরুল তাঁর মতামত অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেনঃ

"বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিরোধভাব প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। আমি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির ভাব বজায় দেখতে চাই। আর তাই আমি আমার রচনায় হিন্দু দেব-দেবীর নাম ব্যবহার করি। হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখিয়া মুসলমানদের এবং আরবী-ফারসী শব্দ দেখিয়া হিন্দুদের মনঃক্ষুন্ন হওয়া উচিত নয়।"

নজরুলের মতে, হিন্দু-মুসলমান একটি বৃক্ষের দু'টি পাতা, একটি মানুষের দু'টি চক্ষু।

অবশ্য নজরুল বিপ্লবী হলেও আসলে ছিলেন কবি, রাজনীতিক নন। রাজনীতি ও সাম্প্রায়িকতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কবির দৃষ্টি দিয়ে, রাজনীতিকের দৃষ্টি দিয়ে নয়। এ সময়ে 'বিশ্বকবি' রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নজরুলের আরবী-ফরাসী শব্দ ব্যবহার, যেমন 'রক্তের' বদলে 'খুন' ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন

www.pathagar.com

এবং নজরুল ও তীব্রতর সমালোচনায় তার মোক্ষম জবাব দিয়েছিলেন। অবশ্য আরবী-ফরাসী শব্দ ব্যবহার করে এবং তার লেখায় হিন্দুদের দেব-দেবীর উল্লেখ করে হিন্দু-মুসলমান প্রীতি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। সে যাক।

নজরুলের বিভিন্ন গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে এই অভিমতেরই প্রতিধ্বনি। বাংলা গানে অনন্য একক নজরুলের কোরাস সঙ্গীত "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার"-এ এই দেশপ্রেমিক মানসেরই এক অনবদ্য প্রকাশ।

"অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ, কাণ্ডারী আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ/হিন্দু না ওরা মুসলিম এই জিজ্ঞাসে কোন্‌জন/ কান্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।"

যদি ও 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর এই কান্ডারীর ছায়ার সন্ধান ও আর পাওয়া যায়নি তবুও কি দেশাত্মবোধের প্রেরণায়, কি হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রচেষ্টার বলিষ্ঠতায়, কি বীর্যশালী প্রাণবন্ত সঙ্গীতের মূর্ছনায় নজরুলের এই সৃষ্টি অনুপম, অননুকরণীয়। এমনকি, রবীন্দ্র প্রতিভাসমৃদ্ধ, রবীন্দ্রপ্রতিভা প্রভাবান্বিত, বাংলা সাহিত্যেও এর তুলনা নেই।

এছাড়া তাঁর অন্যান্য গানে ও বিভিন্ন সুরে এই উদার দেশপ্রেমিক কবি মানসের জাজ্বল্যমান স্বাক্ষর রয়েছেঃ "হিন্দু-মুসলিম দুটি ভাই, ভারতের দুই আঁখি তারা/এক বাগানে দুটি তরু, দেবদারু আর কদম চারা।" বা "মোরা একবুন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু-মুসলমান/মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ/এক সে আকাশ, মায়ের কোলে, যেন রবি শশী দোলে/ এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান।"

নজরুল তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমেও এই ভাবে-হিন্দু-মুসলিম মিলনের বাণী প্রকাশ করেছেন, "যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া/সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রুদুর্গ গুঁড়া/ প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ/চিনিবে শত্রু চিনিবে স্বজন---করুক কলহ জেগেছে তো তবু, বিজয়কেতন উড়া/ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণ-লংকাপুড়া।" অথবা "বদনা গাড়ুতে গলাগলি করে নব প্যাক্টের আশ নাই/ মুসলমানের হাতে নাই ছুরী, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই/ বদনা গাড়ুতে পুনঃঠোকাঠুকি, রোল উঠিল হাহন্ত, ঊর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী মাতুল, হাসে চিরকুটি দন্ত/মসজিদপানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু/আকাশে উঠিল চির জিজ্ঞাসা, করুণ চন্দ্রবিন্দু।"

'দেশবন্ধু" চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে তাঁর 'চিত্তনামাতেও' সেই দেশপ্রেম সঞ্জাত প্রেম-প্রীতিরই উচ্ছ্বসিত প্রকাশঃ

"তোমারে দেখিয়া কাহারো হৃদয়ে জাগেনিক সন্দেহ/হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি, অথবা অন্য কেহ।"/ "হিন্দুর ছিলে আকবর, আর মুসলিমের আরঙ্গজীব/

www.pathagar.com

যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব।" নিন্দা গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া পাগল মিলন হেতু, হিন্দু মুসলমানের পরাণে তুমিই বাঁধিলে মিলন সেতু/ জানিনা আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু মুসলামান/ঈর্ষা-পক্ষে পঙ্কজ হয়ে ফুটুক এদের প্রাণ"

সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর বিভিন্ন লেখায় এই বিপ্লবী কবি হিন্দু-মুসলিম মিলনের বাণী প্রচার করে গেছেন। ঘোর মুসলিম বিদ্বেষী, 'শিবাজী উৎসবের' প্রবর্তক, বালা গঙ্গাধর তিলকের মুসলিম বিদ্বেষান্ধ সাম্প্রদায়িক মানস বাদ দিয়ে তার দেশপ্রেমের দিকটাই তিনি বড় করে দেখেছেন। তাইতো তিলকের মৃত্যুতে তিনি বলছেনঃ

"ওরে ভাই, আজ যে ভারতের একটি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ পড় পড় ভারতকে রক্ষা করিতে, এই মুক্তি জাহ্নবী তটে দাঁড়াইয়া আয় ভাই, আমারা হিন্দু-মুসমান কাঁধ দেই। নইলে এই ভগ্নসৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই। আজ বড় ভাইকে হারাইয়া, একই বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া, একই লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া যেন আমরা ভাইকে-পরস্পরকে আলিঙ্গন করি।"

বলাবাহুল্য, হিন্দু-মুসলিম মিলন সম্পাদনের এই যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা মূলতঃ নজরুলের প্রগাঢ় স্বদেশ প্রেমেরই অভিব্যক্তি। এই দেশের বঞ্চিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত, দুস্ত, অসহায়, অধঃপতিত জনগণের জন্য অকৃত্রিম দরদ এবং এই দেশের রাজনৈতিক মুক্তির দুর্বার আকঙক্ষারই এক দুর্নিবার প্রকাশ। এই আকুতিই প্রবল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে যখন, "যেদিকে তাকাই কুল নাহি পাই অকূল হতাশ্বাস, কোন্ শাপে ধরা, স্বরাজ রথের চক্র করিল গ্রাস? যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে রণে পড়িল সব্যসাচী,/ ঐ হের দূরে কৌরব সেনা উল্লাসে উঠে নাচি।" (ইন্দ্রপতন)

রাজর্ষি আজ জীবন উপাড়ি অঞ্জলি দিলে তুমি/দনুজ দলনী, জাগে কিনা আছে চাহিয়া ভারততুমি।" (ইন্দ্রপতন)

নজরুলের এসব অগ্নি-অশ্রু ঝরা বাণী আর কোন ব্যাখ্য-ভাষ্যের প্রয়োজন রাখে না। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কাব্য শিবাজী উৎসবের পরিপেক্ষিতে নজরুলের এই কাব্য কত উদার, কত মহান, কত উন্নত মানস, কত দেশাত্মগত বিপ্লবী প্রাণের পরিচায়ক

পৌত্তলিকতা-প্রভাবান্বিত-মানস রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কোন নদী-অরণ্য গাছ-পালা পাহাড়, পবর্ত তার-স্বদেশ ছিলনা। তার স্বদেশ ছিল এই দেশেরই কোটি কোটি দুভাগ্য পীড়িত নরনারী। তাইতো নজরুল এই সব রোমান্টিক বিপ্লবী দেশ প্রেমিকদের লক্ষ্য করে বলেছেন -"স্বদেশ বলতে বুঝেছি কেবল/ দেশের, পাহাড় মাটি বায়ু জল/ দেশের মানুষ ঘৃণা করে তাই, করিতে চেয়েছি দেশ স্বাধীন/যত যেতে চাই, তত পথে তাই হই মা ধুলি মলিন।"

www.pathagar.com

এই দুর্নিবার দেশপ্রেমের উন্মাদনায় দেশের সমগ্র জনগণের প্রতি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রতি তীব্র কষাঘাত হানতেও নজরুল দ্বিধাবোধ করেননি,

"কসাইখানার সাত কোটি মেষ, ইহাদের শুধু নাইক প্রাণ/ মার খেয়ে খেয়ে মরিয়া হইয়া উঠিতে এদের নাই কি প্রাণ?" অথবা "পশুরাজ যবে ঘাড় ভেঙ্গে খায় একটারে ধরে আসি/ আরটা তখনো দিব্যি মোটায়ে হতেছে খোদার খাসি।" অথবা "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাতজালিয়াত খেলেছে জুয়া/ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মায়ের মুখে দিস ধুপের ধোঁয়া।"

তার এই অত্যুগ্র দেশপ্রেম কাউকেই খাতির করে কথা বলেনি। এককালের গান্ধী এবং কংগ্রেসের গোড়া ভক্ত নজরুল, "ঘোর রে ঘোর সাধের চরকা ঘোর" গান লিখলেও এবং মিঃ গান্ধীকে এ গান গেয়ে শোনালেও পরবর্তীকালে স্বরাজ সাধনে গান্ধীনীতির ব্যর্থতার কারণে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নজরুল মিঃ গান্ধীর চরকানীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে লিখলেনঃ

"সুতো দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই বসি বসি কাল গুণি।/ জাগোরে জোয়ান, বাত ধরে গেল, মিথ্যার তাঁত বুনি।"

ডাঃ সুশীল গুপ্ত প্রকৃতই বলেছেন, "নজরুল এসেছিলেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে।" অথচ "কংগ্রেস ছিল প্রধানত ঃধনিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট।" (নজরুল চরিত মানস ঃ ডাঃ সুশীল গুপ্ত পৃঃ২৯)

এই দেশাত্মবোধের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অতীন্দ্রিয়বাদী বিশ্বপ্রেমের পসারীদেরকে ও কবির লেখনী রেয়াত দেয়নি। এদের প্রতি তীব্র কষাঘাত করে তিনি বলছেন ....."ইহাদের শিশু শৃগালে মারিলে এরা সভা করে কাঁদে/অমৃতের বাণী শোনাতে এদের লজ্জায় নাহি বাধে।"

যেদেশের কোটি কোটি মানুষ অনাহারে জীর্ণশীর্ণ, দারিদ্র্য-পীড়িত, রোগজর্জরিত, প্রতিনিয়ত দুর্ভিক্ষ-কবলিত সেই দেশের কবির সুন্দরের পূজাবিলাসকে কটাক্ষ করে তাঁর অকৃত্রিম আকুতি কত মর্মস্পর্শী!

"আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা ও পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি। তার চোখে চোখ ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি।" (১৯২১, ১৫ ডিসেম্বর....কলিকাতা এলবার্ট হলে কবির সংবর্ধনার জবাবে নজরুলের প্রতিভাষণ)।

দারিদ্র্য-পীড়িত দেশের জনসাধারণের বেদনা-বঞ্চনা নিজ হৃদয়ে তীব্রভাবে অনুভব করার কারণে তার অন্তরের অগ্নি লাভা উচ্ছ্বাস ফুটে বেরিয়েছে তার "দারিদ্র্য" কবিতায়ঃ ".....দারিদ্র্য অসহ,/ কন্যা হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ,/আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশী?"

www.pathagar.com

তাই নজরুলের পক্ষে কবিসুলভ কুসুমাস্তীর্ণ গুলাবাগিচায় বা চন্দ্রকৌমুদীস্নাত নীল গগনে সদা বিহারের বিলাসে মত্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি নিজেই তার কৈফিয়ৎ দিচ্ছেনঃ "বন্ধুগো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে/ দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে/রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,/ তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা, / বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু বড় দুঃখে। অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছো সুখে।" (আমার - কৈফিয়ৎ)

নজরুলের "আমার কৈফিয়ৎ"-এর শেষের দু'টি চরণ হচ্ছেঃ "প্রার্থনা কর, যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস/যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

এই শেষের দু'টি চরণের মতো চরণেই অতি সুন্দরভাবে ধ্বনিত হতে পারতো এবং অতি সঙ্গতভাবেই রবীন্দ্রনাথের, "এবার ফিরাও মোরে'র অতি স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি। কিন্তু তা হয়নি। বর্ণবাদী সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সমাজের সুবিধাভোগী জমিদার রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ ছিল মারাত্মকভাবে আতংকজনক। তাই তার কবিসত্ত্বার সত্যিকার অনুভূতি এবং স্বাভাবিক আবেদনকে প্রতারিত করে তিনি নিজেকে দায়মুক্ত করলেন 'মহানির্বাণের' বাণীতে নিষ্কাম প্রেমের অসময়োচিত অসার্থক বুলির বিলাসিতায়ঃ "কি শুনাবে, কি গাহিবে, বল মিথ্যা আপনার সুখ,/ স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ" বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনোও শেখেনি বাঁচিতে।.....

এই ভাববিলাসী তথাকথিত বিশ্বপ্রেমের মোকাবিলায় নজরুলের বিদ্রোহ-বিপ্লবের 'আবাহনী' সঙ্গীত "যেথা মিথ্যা ভন্ডামি ভাই, করবো সেথায় বিদ্রোহ,/ ধামাধরা! জামাধরা মরণভীতু!! চুপ রহো!!!" বা "শ্রমিকের সেবা আছে তোমাদের অনুপরমাণু ঘিরে,/ ফসল যদি না ফলাতাম, খেতে টাকা গিলে নোট ছিঁড়ে।" "পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত,/ তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই, আঘাত শুধু আঘাত।"

নজরুলের এই অভিব্যক্তি এই যুগের বিপ্লবী মানসকেই কি প্রতিফলিত করে না? একথা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না, যে, রবীন্দ্রনাথের "এবার ফিরাও মোরে" প্রভৃতি বিদ্রোহ বিপ্লবের ঢং-এর কাব্য নজরুলের এসব বাণীর তুলনায় অত্যন্ত শীতল, একটা পোশাকী অভিনয়ের ঢং-এর পর্যায়ভুক্ত। বড়জোর, আন্তরিকতাবিহীন কতকগুলো সুশ্রাব্য বাণীসমষ্টার মাত্র। 'রক্ত লেখার' সংগ্রামের পরিবর্তে তা বহুলাংশেই প্রতিভাত হয় কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ মাৎসর্য বর্জিত কাগুজে সৈনিকের সৌখিন সংগ্রামের অসার্থক একটা মহড়া।

নজরুলের এই অগ্নিগিরির অগ্নিশ্বাসসম বিদ্রোহ-বিপ্লবের প্রচন্ড বিস্ফোরণ সম্বন্ধে নজরুল নিজেই বলছেনঃ

www.pathagar.com

"বিদ্রোহী করেছে মোরে, আমার গভীর অভিমান/ তোমার ধরার দুঃখ কেন, আমায় নিত্য কাঁদায় হেন/বিশৃংখল সৃষ্টি তোমার তাইতো কাঁদে আমার প্রাণ/ বিদ্রোহী করেছে মোরে; আমার গভীর অভিমান।" তার এ বিদ্রোহ বিপ্লবী মানসের মূলে রয়েছে তাঁর গভীর মানবপ্রেম এবং স্রষ্টার প্রতি গভীর ভালবাসার অভিমান। "নজরুলের বিদ্রোহের উৎস তার সুগভীর, প্রত্যয়োজ্জ্বল মানবপ্রেম।" (ডাঃ সুশীল গুপ্তঃ নজরুল চরিত মানস-পৃঃ ২১৩)

এই মর্ত্যের মানব-মানবীর দুঃখ-বেদনা তাকে এত বেশী অভিভূত করে ফেলেছিল যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের দেহাতীত অতীন্দ্রিয় প্রেমের ভাব-বিলাসে গা ঢেলে না দিয়ে মর্ত্যের মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার মধ্যেই নিজের সর্বসত্ত্বা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

"তাঁর ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনার জন্যই শুধু নয়, স্বাজাতি ও স্বদেশের অপমান-অত্যাচার-বেদনা-লাঞ্ছনাজনিত দুঃখের কারণেও কবি বড় কিছু চিন্তা করার অবকাশ পাননি। দুঃখ-বেদনার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই নজরুলকে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল থেকে পৃথক একটা উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে"। (ডাঃ সুশীলগুপ্ত ঐ পৃঃ ৪৭২-৭৩)

অবশ্য শুধু সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালই নয়, রবীন্দ্রনাথের তুলনাতেও এই বৈশিষ্ট্য, এই শ্রেষ্ঠত্ব অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। একথাটা একটু ঘুরিয়ে হলেও স্বীকার করতে হয়েছে যখন ডাঃ গুপ্ত বলছেনঃ.....

"নজরুল যে সে যুগের সবচেয়ে সক্রিয় প্রাণবন্ত ও যুগধর্মী কবি, এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।" (ঐ--পৃঃ ৩১)

তাই আর একজন কুশলী সমালোচক বলছেন, --"সর্বগ্রাসী, সর্বপ্রসারী, রবীন্দ্র প্রতিভাও সেই নূতনের সর্বাত্মক চাহিদার সঙ্গে তাল মিলাতে সক্ষম হননি।--বীর প্রাণের কবি নজরুলই এই ডাকে সাড়া দিতে স্বভাবতঃ প্রেরণা পেলেন প্রথম।"

(হাসান হাফিজুর রহমান-তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ---পৃঃ ২৪২-৪৩)

কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলছেন মিঃ আউয়ালঃ "এক্ষেত্রে নজরুল বাংলা সাহিত্যে একক এবং অনন্য।"

(মোঃ আবদুল আউয়াল---তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ--পৃঃ ৫৪৮)

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মতে, "কারাগারের শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা বাঙালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।" (১৯২৯ সালে ১৫ ডিসেম্বরে নজরুল সম্বর্ধনা সমিতির সভায়, পিসিরায়ের ভাষণ।)

বিদ্রোহ-বিপ্লবীমুখী ভাবধারা সঞ্জাত, মানবিকতাবোধ সমৃদ্ধ, বীর্যবন্ত দেশাত্মবোধক কাব্য সৃষ্টির গরীমায় নজরুল প্রতিভা যে রবীন্দ্র প্রতিভাকে

www.pathagar.com

সন্দেহাতীতভাবেই ছাড়িয়ে গেছে সেই সত্য অত্যন্ত নির্ভুলভাবেই ধ্বনিত হয়েছে 'বঙ্গ ভঙ্গ' রদ আন্দোলন খ্যাত অসাধারণ সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতা, বিপিন চন্দ্র পালের কণ্ঠেঃ

"এর কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেখলাম এতো কম নয়। এ খাঁটি মাটি থেকে উঠে এসেছে। আগেকার কবি যারা ছিলেন, তারা দোতলা প্রাসাদ থেকে কবিতা লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতলা থেকে নামেননি। কর্দম পিচ্ছিল পথের উপর পড়লে শুধু তিনি নন, দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিউরে উঠতেন। নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মেছেন জানি না। কিন্তু তাঁর কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশে যে নতুন ভাব এসেছে তার সুর তাই-ই। তাতে পালিশ বেশী নেই, আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান, মানুষের একাত্ম সাধনা। কাজী নজরুল ইসলাম নূতন যুগের কবি। জাতির প্রাণে প্লাবন এসেছে, নতুন ডেমোক্রাট নজরুলের বীণার ঝঙ্কারে তা পাই।"

(১৯৩৫ সালে মানিকগঞ্জ সাহিত্য সভায় নজরুল সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বিপিন চন্দ্র পাল।)

তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক বিপ্লবের পটভূমিকায় নজরুল তাঁর লেখায় যুগের দাবীকে সার্থকভাবে, প্রাণবন্ত, মূর্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অন্যকোন সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই নজরুল সাহিত্য সম্বন্ধে তার মূল্যায়নে বলেছেন, "কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।"

রবীন্দ্রনাথ যে একটি অনন্য সাধারণ যুগান্তকারী কবি প্রতিভা এবং সুকৌশলী, সুনিপুণ কথাশিল্পী ও যাদুকরী লেখনী শক্তির অধিকারী, সে কথা অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্র কাব্য হৃদয়কে মধুর রসে অথবা অতীন্দ্রিয় প্রেমের বাণীতে-ভাব-সুর মাধুর্যে মনোমুগ্ধকারী প্রভাব বিস্তার করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সঙ্গীতের ঝঙ্কারে আগুন ঝরে না, সে কাব্যে এবং গানে শুধু 'সখি ধরো, ধরো', 'রোদন, এন্দন বিলাপ--পৌরুষের নিদারুণ অসম্মান। তাই রবীন্দ্র প্রতিভা বাংলাভাষী সর্বস্তরের জনগণের জীবনে স্বাধীনতার দুর্দমনীয় উন্মাদনা, জাতীয়তাবাদের দুর্নিবার চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে স্বতঃই হয়েছে ব্যর্থ। এ সাহিত্য সর্বসাধারণের মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেনি। তাই কলিকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চল বিশেষের স্বল্পসংখ্যক অধিবাসী এবং অন্যান্য অঞ্চলের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, বৈদগ্ধশালী লোকের মধ্যে রবীন্দ্র সাহিত্যের সমঝদারসীমাবদ্ধ।

কিন্তু বাংলাভাষী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে রবীন্দ্র-কাব্য চিরদিনই তার ভাষাগত কৌলিন্যের আভিজাত্য নিয়ে, অতীন্দ্রিয়বাদের দার্শনিকতাপূর্ণ আলো-আঁধারির সূক্ষ্ম পর্দার অন্তরালে অত্যন্ত সম্মানজনক দূরত্বেই থেকে গেছে-কোনদিনই ঘরোয়া

www.pathagar.com

ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসে সেই মন-প্রাণ মাতানো আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি-নজরুল কাব্যের পক্ষে অতি অনায়াসেই যা সম্ভব হয়েছিল। এদেশের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর নিকট, কোটি কোটি চাষী, জেলে, কামার, কুমার, ছুতোর, মিস্ত্রী, কুলি, মুজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কেরানী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, দোকানী, ব্যবসায়ী---বিশেষতঃ 'পূর্ববাংলার' জনসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা নজরুলের মোকাবিলায়---'বিশ্বকবির' প্রতিভা এবং বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠা খ্যাতির তুলনায় অতি নগণ্য বললেই চলে।

এইখানেই 'বিশ্বকবি' রবীন্দ্রনাথের মোকাবিলায় দৃপ্ত যৌবনের কবি, দুর্দমনীয় পৌরুষের কবি, নিপীড়িত, নিগৃহীত মানবতার কবি, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার-সুরকার নজরুলের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব।

আন্তরিক সত্যোপলব্ধির অকুণ্ঠ নির্ভীক প্রকাশে, ভাব অনুগামী সহজ প্রকাশ শব্দ সম্ভারে, ও অনুকূল ছন্দ-দ্যোতনার পুলক ঝঙ্কারে, হৃদয়ের সকল তন্ত্রীতে প্রাণ মাতানো সাড়া, উন্মাদনা জাগাতে সর্বস্তরের জনসাধারণকে তার নিজস্ব জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে 'বিশ্বকবি' রবীন্দ্রনাথকে ব্যতিক্রম না করেও নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে তিনি তাঁর নিজস্ব সাম্রাজ্যে 'যুবারাজ' নন, ---সত্যিই সম্রাট শাহানশাহ।

www.pathagar.com

এ সত্য আজ নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, কথা, ভাব এবং সুরৈশ্বর্য সকল দিকের বিচারেই নজরুলের দেশাত্মবোধক গান অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই শ্রেষ্ঠ, তা সে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের মোকাবিলাতেই হোক, আর রবীন্দ্রনাথের মোকাবিলাতেই হোক। এছাড়া সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে অবস্থান করার কারণেও নজরুল মানস ও নজরুলের গান অধিকতর মর্য্যদার আসনের দাবীদার। এর মোকাবিলায় রবীন্দ্র-মানস এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত অতিমাত্রায় সাম্প্রাদায়িকতা ও পৌত্তলিকতাদুষ্ট, যে কারণে--এখানে তো নয়ই বিভিন্ন সম্প্রাদায় ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতেও রবীন্দ্রনাথ যুক্তিসঙ্গতভাবেই জাতীয় সঙ্গীতকার হিসেবে মর্য্যদা পেতে পারেন না।

ডাঃ গুপ্ত বলছেন, '১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন তার অনবদ্য কবিতা ও গানের অগ্নিসম্ভার নিয়ে। স্বদেশী আন্দোলন তাঁর কাছ থেকে আশাতীত প্রেরণা, সাহায্য ও সমর্থন লাভ করল।' এই পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন, তার বিখ্যাত গান 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' এবং আর বিখ্যাত কবিতা "শিবাজী উৎসব' ও 'ভারত তীর্থ'।

এখানে স্মরণীয় যে, ১৯০৫ সালে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার্থে এবং মহাজন, বেনিয়া, জমিদার, অফিসার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বর্ণহিন্দুদের নির্মম শোষণ, উৎপীড়ন হতে অধঃপতিত বাংলার মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় রাজধানীসহ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল নবজাগ্রত মুসলিম রাজনৈতিক চেতনাবোধ এবং নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার একটি ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক প্রকাশ এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরে অর্জিত পাকিস্তানের এবং তারই ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি--স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে এবং ১৯৭৫ সালে ১৫ আগষ্ট স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রাহুমুক্তি ও প্রকৃত অভ্যুদয়ের কালেও যেমনি, ১৯০৫ সালেও তেমনি সমগ্র বর্ণহিন্দু সমাজ এই নবগঠিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতায় মত্ত হয়। তাদের এই 'বঙ্গভঙ্গ' রদ আন্দোলনের ফলশ্রুতি ১৯১১ সালে দিল্লী দরবারে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' হয় এবং বাংলার মুসলিম সমাজ পুনরায় বর্ণহিন্দু সমাজের শোষণের যাঁতাকালে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের দেশাত্ববোধক গানগুলোতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রকট। "এসকল রচনা এমন সাম্প্রদায়িক কলুষক্লিষ্ট যে, জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে সকল শ্রেণীর কর্মীদেরে প্রেরণা সঞ্চার করতে স্বতঃই হয়েছে ব্যর্থ।" (আব্দুল কাদিরঃ তোমার সাম্রাজ্য যুবরাজ। পৃঃ ৩০৪)

www.pathagar.com

ডাঃ গুপ্ত বলছেন, "মহাযুদ্ধের সময় প্রকাশিত তাঁর অন্যতম স্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি 'বলাকাতে' (১৯১৬) মহাযুদ্ধকালীন ভগ্নহৃদয়, দারিদ্র্য-জর্জরিত ও নৈরাশ্য পীড়িত দেশ ও সমাজের বিশেষ কোন ছাপ পড়লো না।" দেশের আশা-আকাংক্ষা ও বেদনা নৈরাশ্যকে রূপ দিতে আর এগিয়ে এলেন না তিনি। "এই সময়ে জাতির স্বপ্ন, আশা, আকাংক্ষা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কোন সাহিত্যনায়কের মধ্যে ভাষা পেল না।" "এই যুগসন্ধিক্ষণে দেখা দিলেন নজরুল।" "তখন 'অগ্নিবীণা' হাতে জাতীয় চারণ কবির মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন নজরল।"

দেশাত্মবোধক গানে নজরুলের অবদান সম্বন্ধে নজরুলের এককালীন ঘোর বিরুদ্ধবাদী সজনীকান্ত দাস বলেন, "স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙালী কবিগণ যেভাবে বহুবিধ সঙ্গীত ও কবিতার সাহায্যে বাঙ্গালীর দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তর বিপ্লবে-যে কারণেই হউক, তাহারা ঠিকভাবে সাড়া দেন নাই। একমাত্র কবি নজরুলই ছন্দে গানে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন।" (তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ। পৃঃ ৪৮২)

এই আপাতঃ সামঞ্জস্যহীনতার দু'টি কারণ ছিল। প্রতমতঃ 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের প্রয়োজনে নয় বরং বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থে--সমষ্টিগতভাবে বর্ণহিন্দু সমাজ কর্তৃক মুসলিম শোষণের প্রয়োজনে যে বর্ণহিন্দু সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ছিলেন বৃটিশ রাজত্বকালের জমিদার এবং ঠাকুর বংশীয় বর্ণহিন্দু প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ। কাজেই এই পর্যায়ের আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বর্ণহিন্দু প্রধানগণ যার যার অস্ত্র নিয়ে-কবিতাই হোক, আর গানই হোক-নিপীড়ত, শোষিত বাংলার মুসলিম সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের একটা সাম্প্রদায়িক কর্তব্য হিসাবেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ ১৯১১ সালের দিল্লী দরবারে পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ বাতিল করে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার প্রতিদানার্থে এবং বৃটিশ তোষণের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত পৌত্তলিকভাব সমৃদ্ধ, হিন্দু জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক জয়হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা"র সৃষ্টি। এই তোষণনীতির ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজমের অনুকুলে প্রচারণা এবং সহযোগিতা এবং ফলে ইংলন্ডের রাজকবি ইয়েটস সমর্থিত ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র বদৌলতে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ লাভ (১৯১৩); মিঃ গান্ধীর ব্যর্থ অসহযোগ আন্দোলনের করুন পরিসমাপ্তির পর দ্বিতীয় পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন; এদিকে রবীন্দ্রাথ কর্তৃক 'বোলপুর শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠানে বৃটিশ সাহায্যের টোপ গলাধঃকরণ, এইসব সহজবোধ্য কারণে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের স্রোতধারা ফারাক্কা নিয়ন্ত্রিত পদ্মার স্রোতধারার ন্যায় নিয়ন্ত্রিতও বিশুষ্ক হতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

যা-ই হোক, সকল দিক বিদেচনা করে, মুসলিম বিদ্বেষের পটভূমিকায় রচিত পৌত্তলিক ভাবপূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' অথবা অনুরূপ পটভূমিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি', অথবা পৌত্তলিকতাপূর্ণ এবং হীনমন্যতাসূচক রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন অধিনায়ক জয়হে," প্রভৃতি গানের চেয়ে, নজরুলের অসাম্প্রদায়িক উদার, সহনশীল, ভ্রাতৃত্ববোধপূর্ণ, সমষ্টিবোধ সমৃদ্ধ, বীর্যশালী দেশাত্মবোধক গানগুলো যে জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনে--শুধু এদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতেও অধিকতর শ্রেয়ঃ বিবেচিত হওয়া উচিত, একথা আর অধিক যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা।

এই অভিমতের সমর্থনে, হিন্দু প্রধান ভারতীয় কংগ্রেসের একাধিকবার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট--যিনি শুধু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা ডি এল রায়ের জাতীয় সঙ্গীত নয়, ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষার জাতীয় সঙ্গীত উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, সেই কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী, সি আর দাশের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নস্যাৎকারী, পরম গান্ধীভক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর কৃত মূল্যায়নই এখানে তুলে দেয়া যেতে পারেঃ

"বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে তো মনে হয় না।"

(কলিকাতায় নজরুল সম্বর্ধনা সমিতির সভায় ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে প্রদত্ত সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণ)

উপমহাদেশের দুর্ভাগ্য এবং ইতিহাসের ও ট্রাজেডী যে, অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে, পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে জাতীয় কবির সম্মানিত আসনে--জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনে, পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বঙ্কিমচন্দ্র--দ্বিজেন্দ্রলাল--রবীন্দ্রনাথের মোকাবেলায় স্থান পেল না অসাম্প্রদায়িক, উদার ধর্মী, মানবতার প্রেমিক-কবি, শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরকার নজরুল ইসলাম এবং তার সর্ববাদী সম্মত শ্রেষ্ঠ, গণমানসে দেশপ্রেমের দুর্বার জোশ-উন্মাদনা সৃষ্টিকারী, অপার সুরৈশ্বর্যময়ী বীর্যব্যঞ্জক দেশাত্মবোধক গান।

www.pathagar.com

পুনশ্চ আগ্রাসনবাদীর একটি সুপ্রাচীন নীতি
Divide and rule বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর।

সাম্রাজ্যবাদী রোমান শক্তি এই নীতি অনুসরণ করে ইউরোপ, এশিয়া, ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে শাসন কতৃত্ব এবং শোষণ পদ্ধতি পরিচালনা করে। এই একই নীতি অবলম্বন করে ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় দুশো বৎসর শাসন, শোষণ, পীড়ন বজায় রাখতে সমর্থ হয়। বর্ণ হিন্দুরাও অই একই বিভেদ ও আন্তঃকলহ নীতি অবলম্বন করে মুসলমানদের উপর কতৃত্ব করার প্রয়াস চালিয়ে আসছে বহুকাল ধরে। ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের ভারত আক্রমন কালে চিতোরের রানা সঙ্গ এই বিভেদ নীতি অবলম্বন করে বাবরকে ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে দিল্লী আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের নিকট শোচনীয় পরাজয়ের কারনে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় (১৫২৭)। মুসলমান রাজন্য বর্গের আন্তঃকলহের কারনে মারাঠা গন ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে যদিও চতুর্থ মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট নিদারুণ পরাজয়ের পর তাদের সে স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয় (১৮০৪)। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগে বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের পূর্বসূরী ১৯০৫ সালের 'বঙ্গাসাম' প্রদেশ ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে বাতিল করানো হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগকালে নিজেদের মধ্যে বিভেদের কারণে মুসলমানদের স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস প্রায় বানচাল হবার উপক্রম হয়েছিল। আল্লাহর রহমে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জিন্নাহর নিরঙ্কুশ যুক্তিজাল এবং অদম্য ইচ্ছা শক্তির কারণে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান অর্জন করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল যদিও যেন তেন প্রকারেণ এই মুসলিম রাষ্ট্র ভাঙ্গার অশুভ সংকল্প নিয়েই হিন্দু কংগ্রেস তখন এই দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিল। (একথা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে মিঃ গান্ধী না থাকলেও দুদিন আগে আর পরে ভারতের স্বাধীনতা ছিল অবশ্যম্ভাবী কিন্তু মিঃ জিন্নাহ না হলে পাকিস্তান কখনোই সম্ভব হতো না। মিঃ জিন্নাহ ছিলেন যক্ষ্মা রোগগ্রস্থ এবং তার ডাক্তার মিষ্টার প্যাটেল দেশ বিভাগের কয়েকমাস আগে সুস্পষ্ট ভাবে তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তার আয়ুস্কাল বড়জোর দেড়বৎসর যদিনা তিনি তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড হতে বিরত থাকেন এবং বিশ্রাম গ্রহন করেন। একথা গোপন ছিল। এই ভবিষ্যৎ বাণীর সময়সীমার কয়েকমাস পরে-সম্ভবতঃ জিন্নাহর অদম্য ইচ্ছা শক্তির কারনে-তিনি মৃত্যুবরণ করেন-১১-৯-৪৮। এই কথা জিন্নাহর মৃত্যুর অনেক পরে জানা জানি হয়। ব্রিটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল ভাইস রয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন -যিনি ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ সম্পাদন করেন -তার স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে যদি আমরা আগে

www.pathagar.com

এই কথা জানতে পারতাম যে মিঃ জিন্নাহ অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবেন তাহলে আমরা ১৯৪৭ সালের অগাষ্টের পরির্বতে আরও অনেক পরে অর্থাৎ মিঃ জিন্নাহর মৃত্যুর পরে ভারত বিভাগ করতাম।)

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার এই ভেদ নীতির সাফল্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ভারত ১৯৭১ সালে ইষ্ট পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করে এই দেশ দখল করতে সমর্থ হয়। অন্যথা-এদেশের জনগনের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া তারা কোন ক্রমেই এদেশ দখল করবে পারত না। মোদ্দা কথা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ই তাদের সকল পররাস্ট্রনীতির প্রধান মূলনীতি। পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন দূর্বল বাংলাদেশকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে গ্রাস করার উদ্দেশ্য সাধনে এক্ষণে তারা সেই ভেদ নীতি প্রয়োগ করছে প্রধানতঃ তাদের অর্থ সমর্থন পুষ্ট এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলি এবং বিক্রীত মস্তিষ্ক ও বিকৃত ঈমান তথাকথিত বৃদ্ধিজীবি এবং সংস্কৃতি সেবীদের মাধ্যমে। এদেশের শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম সংবাদপত্র, রেডিও টিভি ইহাদের কল্যাণে বিভেদ সৃষ্টির (এবং অপসংস্কৃতি প্রচারের ও) অতি প্রশস্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সীমান্তপারের প্রভুদের নির্দ্দেশে ইহারা বহুবৎসর পূর্বে সংঘঠিত উপমহাদেশের মুসলমানদের আন্তঃকলহের রক্তাক্ত হিংসা-হত্যার কলঙ্কজনক জঘন্য ঘটনাবলী অতিসুকৌশলে এইসব প্রচার মাধ্যমের মারফত প্রতিনিয়ত প্রদর্শন করে সেই হিংসা বিদ্বেষের অগ্নি চিরকাল প্রজ্জলিত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে ইহাদের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন কোনক্রমেই সম্ভব না হয় যদিও বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এসবের কোন ইতিবাচক অবদান তো নেইই বরঞ্চ আছে শুধু ক্ষতিকারক প্রভাব। অথচ প্রতিবেশী আগ্রাসী শক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার আগ্রাসনের কারনে এখনই যে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অনেকাংশে সীমাবদ্ধ হতে চলেছে ইহাদের রচিত গানে গল্পে কাহিনী নাটকে তার কোন আভাসই নাই যদিও তাই আজ বর্তমান সময়ের সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ প্রয়োজন। ফারাক্কা, তালপট্টি, দহগ্রাম, ছিটমহল আঙ্গুরপোতা ইত্যাদি ইস্যু এবং সীমান্তে প্রতিনিয়ত সীমান্ত নীতি ভঙ্গ করে বিভিন্ন প্রকার আগ্রাসন পরিচালনার উপর কেন সংবাদপত্র রেডিও টিভিতে এসবের প্রয়োজনীয় প্রতিফলন নাই; তার কি জবাব? কেন তারা নির্বাক ও নিশ্চুপ। আফশোস এই দেশে মীরজাফরের গোষ্ঠী মীরজাফর মীরন, ঘষেটি বেগম, জগৎশেঠ রাজবল্লভরা এখনো সক্রিয় এবং অতিমাত্রায় অথচ দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তি গুলি এসম্বন্ধে এখনো ক্রিমিনালী বেখবর। তদুপরি নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দ্বন্দ্ব কলহ- লিপ্ত।

"পশুরাজ যবে ঘাড় ভেঙে খায়

www.pathagar.com

একটারে ধরে আসি,
আরটা তখনো দিব্যি মোটায়ে
হতেছে খোদার খাসী"
-নজরুল ইসলাম

বর্তমানে দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি যারা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, বহুধা বিভক্ত। অপর পক্ষে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গোলামী বাদী শক্তি প্রকাশ্যে বহু বিভক্ত হলেও ভিতরে ভিতরে তারা সকলেই এক, সব রসুনের গোড়াই এক জায়গায়। কারন তারা দশানন, তারা একই উদ্দ্যেশ্য সংগঠিত ও প্রতিপালিত যদিও মুখ তাদের বহু। বিদেশ হতে তাদের রাজনৈতিক পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক পরিপুষ্টি।

চরম পরিতাপের বিষয় যে দেশের জাতীয়তাবাদী দলগুলি চক্ষু থাকতেও এ ব্যাপারে অন্ধ। ব্যক্তিগত প্রাধ্যন্য বা দলগত স্বার্থের কারনে নিজেদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিস্মৃত হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে হিংসা কলহ এবং বাদা-বাদীতে মত্ত্ব। পূর্ব বর্ণিত অধ্যায় গুলি হতে একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হবে যে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারন তাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব। শুধু এইদেশেই নয়, সকলমুসলিম দেশেই প্রায় একই সমস্যা। প্রায় মুসলিম দেশই নানাবিধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং তার মূলে রয়েছে আন্তঃকলহ, আত্ম বিভেদ। এই সমস্যা দূর করতে না পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই সত্যের কার্যকরী উপলব্ধি বর্তমান সময়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।

আরও পরিতাপের বিষয় যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগন যারা বর্ণহিন্দু সমাজে অচ্ছ্যুৎ এবং ধর্মীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক-সকল ক্ষেত্রেই নিগৃহীত, নিপীড়িত এবং নানা ভাবে বঞ্চিত, তারা এখনও সেই দুভার্গ্যজনক অবস্থান কে কি এক অবোধ্য কারনে সাগ্রহে এবং সানন্দে আকঁড়ে ধরে আছেন। উজ্জ্বল দিনের আলোর মত পরিস্কার যে সত্য-সে সম্বন্ধে তারা দুঃখজনক ভাবে সকল অনুভূতি বিহীন। হিন্দু সমাজে তাদের আত্মমর্য্যদাহীন সকল প্রকারে নিগৃহীত যে অবস্থান তা হতে তাদের মুক্তি সহস্রাধিক বৎসরেও সম্ভব হয় নাই। হিন্দু শাসনে ভবিষ্যাতেও হবার কোন সম্ভাবনা নাই।

এই কথার সমর্থনে ভুরি ভুরি প্রমাণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

বর্ত্তমান ভারতে-উচ্চ বর্ণের অনুপাত ১৫ %। এই ১৫% শতাংশ দ্বারা অবশিষ্ট ৮৫% শতাংশ অবদমিত বঞ্চিত নিপীড়িত। এই ৮৫% এর একটা বৃহৎ অংশ শূদ্র হরিজন, (অচ্ছুৎ) আদিবাসী। এই সম্বন্ধে চল্লিশের দশকেই অচ্ছুৎদের অবিসংবাদিত নোতা ডাঃ আম্বেদকার দাবী তুলেছিলেন। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যেঃ--

www.pathagar.com

"The Hindu is alien to him as European is and what is worse, the European alien is reutral, but the Hindu is most shame fully partial to his own class and antagonistic to the untuchable"

ভারতের বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ সৈয়দ শাহবুদ্দিন বলেন "ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ শতকরা ১৫ ভাগ উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে," "যারা আজ প্রচার করছে মুসলমানরা হচ্ছে হিন্দুদের শত্রু তারাই নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে" এবং মণ্ডল কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নে বাধা দিচ্ছে"। আবদুন নূর-সংগ্রাম ১১ই মে, ১৯৯৪।

"ভারতীয় জনগোষ্ঠির শতকরা ৫২ ভাগ নিম্নবর্ণের তফশিলী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চরমে উঠে নব্বই দশকের শুরুতে যখন প্রধান মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের আলোকে তফশিলী সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরীতে শতকরা ২৭ ভাগ কোটা সংরক্ষণের ঘোষণা দেন। সাথে সাথে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নেতৃত্বে দেশ জুড়ে শুরু হয়ে যায় ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলন।"

"পরিণামে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সরকারকে বিদায় নিতে হয়েছিল" (ঐ) নিম্ন বর্ণের এক হিন্দু যুবতীর সাথে একই গ্রামের (হরিয়ানা রাজ্যের) উচ্চ বর্ণ্যের এক হিন্দু যুবকের প্রণয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গ্রাম্য সালিশে উক্ত যুবতীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।" (ঐ)

"অরুন্ধতী নামক জনৈকা নিম্নবর্ণের শিক্ষিতা রমণীকে বেদ পাঠের অপরাধে রাস্তার উপর উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত করা হয়।" (ঐ) বিগত ২২শে মার্চ (১৯৯৪) আন্তর্জাতিক Herald Tribune পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী বর্ণ- বৈষম্য নীতিকে অবজ্ঞা করার অপরাধে এক নবদম্পতীকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।" (ঐ)

"এ, এফ পির খবরে প্রকাশ উত্তর ভারতের নয়া গ্রামের চাষী যুবক মনোজ এবং সাহনী সম্প্রদায়ের যুবতী আশা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। . . . . আশার অভিভাবকগণ পরবর্তীতে নব দম্পতীকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। কয়েক শ গ্রামবাসী চতুর্দ্দিকে ঘিরে দৃশ্যটি উপভোগ করে . . . আশার অভিভাবকদের উৎসাহিত করে।" (ঐ)

"মাত্র কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রের ওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ডাঃ আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণের প্রতিবাদে বর্ণবাদী হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর প্রচণ্ডভাবে চড়াও হয়। তাদের বহুঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। যার নামকরণ কেন্দ্র করে এই দাংগা তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রাণ পুরুষ এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচয়িতা ডাঃ বি, আর আম্বেদকর।" (ঐ)

www.pathagar.com

এর পরেও কি এদেশের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মোহ ভঙ্গ হবেন? ভারতের নিম্নবর্ণের জনগণ কিন্তু বাংলাদেশের নিম্নবর্ণের তফশিলী সম্প্রদায়ের মতো হাত পা গুটিয়ে বসে নেই। তারা উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নিপীরিত নিগৃহীত হতে আর রাজি নয়। ব্রহ্মণ্য বাদীদের বিরুদ্ধে তারা এখন সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। উত্তরভারতে ব্রহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের এক পরিচয় দস্যুরাণী ফুলনদেবীর নাটকীয় অভ্যুত্থানে। যদিও ফুলনদেবীর একক প্রচেষ্টা আপাতত ব্যর্থতায় পর্যবসিত বলে মনে হয় তবুও তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। একজন অচ্ছ্যুৎ হয়েও তার দেবীপদে উন্নীত হওয়া এই সংগ্রামে একধাপ অগ্রসর হওয়া তো বটে। সন্দেহ নেই ব্রহ্মণ্য বর্ণ বাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আরও অনেক অভ্যুত্থান জন্মনেবে ফুলনদেবী হতে অনুপ্রেরণা লাভ করে হয়তো বা ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে।

আর দক্ষিণ ভারতে ব্রহ্মণ্যবাদী অত্যাচার শাসন নিগড়ের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের অচ্ছ্যুৎ গণ ইতিমধ্যেই সংঘবদ্ধ ভাবে জেগে উঠেছে।

দক্ষিণভারতের অচ্ছুৎদের অবিসম্বাদিত নেতা ডাঃ আম্বেদকার এক সময়ে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্বে মুসলমানদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি ইসলাম ধর্মগ্রহণের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু মিঃ গান্ধী প্রমুখ বর্ণ-হিন্দু নেতৃবর্গের কূট কৌশলে এবং মি গান্ধীর হরির্জন আন্দোলনে বিভ্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আর অগ্রসর হননি।

বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের অচ্ছ্যুৎগণ বর্ণ-হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। কারণ উভয়েই সমানভাবেই বর্ণবাদী হিন্দুদের শাসন শোষণ অত্যাচার নিপীড়নের স্বীকার।

তারা এই অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুখর হবার জন্য তাদের সঙ্গে ভারতের মুসলমানদেরেও তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় আহব্বান করছেন। ভারতের বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত অচ্ছ্যুৎদের পত্রিকা পাক্ষিক "দলিত ভয়েস"-এ তারা তেজোদৃপ্ত ভাষায় ভারতীয় মুসলমানদের এই বলে আহ্বান করছেন" আপনারা পবিত্র কোরআন অবমাননা সহ্যকরার চেয়ে হিন্দু নাৎসীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে শিখুন। অন্যত্র , If the Muslims do not learn to die for a Noble cause I think it will be a crime against Quran .

"মুসলমান যদি একটি মহৎ লক্ষ্য সাধনে আত্ম কোরবানী করতে না শিখেন, আমি মনে করি তাহবে কোরআনের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ।" (সংগ্রাম ২০শে মে, ১৯৯৪) দক্ষিণ ভারতে "দলিত ভুজঙ্গ নামে একদল কবি" দলিত বুদ্ধি জীবিরা এবং মননশীল লেখকগোষ্ঠী . . . ব্রহ্মণ্য বাদের বিরুদ্ধে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল "(ঐ)" আজ সারা ভারতের অচ্ছ্যুৎরা (ব্রহ্মণ্যবাদ্দের বিরুদ্ধে) সংঘবদ্ধ হচ্ছে।" (ঐ)

www.pathagar.com

কিন্তু বাংলাদেশের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কী এখনও ঘুমিয়ে থাকবেন, এখনও কী তারা ব্রহ্মন্যবাদী ভারতের বৃত্তি ভোগী ভারতের গোলামী প্রয়াসী এদেশীয় মুসলিম নামধারী বর্ণ চোরা মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং ততোধিক বর্ণচোরা রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার প্রচারণার মোহে বিভ্রান্তির শীকার হয়েই থাকবেন যাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জ্জিত এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্ব্বভৌমত্ব বিসর্জ্বন দিয়ে সকলকে ভারতের গোলামীতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে-ন্যস্ত করা। তার পরিণতি বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমান এবং এদেশের হিন্দু সমাজের তপশিলী সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলের জন্যই হবে সমান বিভীষিকা-যে বিভীষিকার মধ্যে বর্ত্তমানে ব্রহ্মণ্য বাদী ভারতের সকল মুসলমান, হরিজন, তফশীল সম্প্রদায়, শিখ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান-সবাইকে বাস করতে হচ্ছে।

স্বাধীন সার্বোভৌম বাংলাদেশ-বিশ্বাসী, বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসরমান গণ আজ উদাত্ত কণ্ঠে তপশিলী সম্প্রদায় সহ সকল বাংলাদেশী সংখ্যালঘুদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে এযাবৎ কালের সকল ভুলধারণা এবং বিভ্রান্তি মুক্ত হয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে সংখ্যা গুরু মুসলমানদের সঙ্গে একাত্ম হতে তাদের-ইচ্ছানুযায়ী তাদের ধর্মীয় সত্ত্বা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন রেখেই বাংলাদেশের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসাবে তাদের সকল অধিকার ও মান সম্মান অক্ষুণ্ন রেখেই।

হে আত্মবিস্মৃত জাতি তোমরা কী এই আহ্বানে সাড়া দেবে না? তোমরা জাগবেনা?

[সংসক্তি-ক-ইতিহাসের রূপান্তর ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একদিক।]

অথচ ইসলামী সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান সম্মানজনক। ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান যা ধর্মীয় বিধানেই ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভিন্ন ধর্মীদের জান, মাল, ইজ্জতের হেফাজত করার হুকুম প্রদান করেছে এবং কার্যত প্রায় হাজার বৎসরের মুসলিম শাসনে এই উপমহাদেশের ভিন্নধর্ম্মীগণ যে সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা লাভ করেছে তা বর্তমান সভ্যতালোক উজ্জল বিংশ শতাব্দীর কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে তার নজীর পাওয়া দুঃস্কর। (দ্রষ্টব্যঃ উপমহাদেশে আর্য সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন) ইহুদি শাসিত গাজা ইত্যাদি এলাকায়, ইউরোপের বসনিয়া হার্জগোভনিয়ায় সকল সভ্য দেশের চোখের সামনে মুসলিমদের উপর কি নিদারুন অমানবিক অত্যাচার নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। আর পৃথিবীর বৃহত্তম তথাকথিত গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু ভারতের কথা!

এই ধর্মনিরপেক্ষ গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্টীয় পলিসি হিসাবে নিম্নবর্ণের হিন্দু দলিত ও অচ্ছুৎদের এবং শিখ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের কি ভয়ঙ্কর ষ্টিমরোলার চালানো হচ্ছে চেঙ্গিস খান হালাকু খানের অত্যাচার জুলুমবাজীকেও যা লজ্জা দেয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৎসরাধিক কালের ষড়যন্ত্রে চারশত বৎসরের পুরাতন বাবরী মসজিদ ধ্বংস এবং স্থানীয় সরকারের সহযোগীতায় বোম্বাইয়ে মুসলিম

www.pathagar.com

নারীদের প্রতি যে পাশবিক অত্যাচার নিপীড়ন চালানো হয়েছে বিশ্বে তার নজীর পাওয়া দুষ্কর।

তাই এদেশে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের এ সত্য আজ এতদিনে উপলব্ধি করা উচিত যে মুসলিম শাসনে তারা অনেক অধিক নিরাপত্তা, সম্মান, সুযোগ, সুবিধা লাভ করেছে এবং করতে পারে যা অন্য শাসনে বিশেষতঃ হিন্দু ভারতীয় শাসনে কোন দিনই সম্ভবপর নয়।

সর্বশেষে বাংলাদেশবাসী মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নির্বিশেষে সকলেরই আজ এ সত্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, সকলের সার্বিক কল্যাণ এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার উপর নির্ভরশীল এবং এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্য বদ্ধ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এসত্য ও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে স্বাধীন সার্ব্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম ইসলামের কারণে এবং এদেশে জাতীয়তাবাদী শক্তি ইসলামী শক্তির সমার্থক, যেহেতু এদেশের শতকরা পচাঁশি জন ইসলাম ধর্মাবলম্বী। হে আল্লাহ, সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার তৌফিক দাও! আমীন, সুম্মাআমীন।

তামাম শোধ।

www.pathagar.com

বিভ্রান্ত নিশান

সংসক্তি-ক

ইতিহাসের রূপান্তর ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একদিক

ফজলুল করিম

প্রকৃত ব্যাপারের যথাযথ বিবরণ ইতিহাসের সত্যকার রূপ। যদি মানুষের পক্ষে সকল সময়েই সত্য জানা সম্ভবপর হইত এবং উহা জানিয়া নির্বিকার ভাবে, নিরাসক্তচিত্তে সত্য প্রকাশ-ই তাহার স্বভাবের অনুকূল হইত, তাহা হইলে ইতিহাস অনায়াসে সত্যের মাপকাঠির বিচারে জ্যামিতির স্বতঃসিক্তগুলির পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারিত। কিন্তু বাস্তব ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐতিহাসিকের নিজের বিচার-বিবেচনা, সত্যগ্রহণের ক্ষমতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ব্যক্তিগত সংস্কার ইত্যাদি বহুবিধ অনিবার্য্য কারণে স্বভাবতঃই ইতিহাস বিকৃত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক গীবন একদা সদ্য-সংঘটিত কোন ব্যাপার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিভিন্ন উত্তর পাইয়াছিলেন। ইহাতে বিচলিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, যখন সদ্য-সংঘটিত ব্যাপারের প্রকৃত বিবরণ অবগত হওয়াই এত কষ্টকর, তখন শত শত বৎসর পূর্বের সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণী সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে।

এই সকল অপরিহার্য কারণ ব্যতীত স্বার্থঘটিত উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচেষ্টা দ্বারাও ইতিহাসের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে।

রাজনীতির সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। যাহা আজিকার রাজনীতি, তাহার স্থান আগামী কল্যের ইতিহাসের পাতায়। যাহা আজ ইতিহাস, গতকাল তাহা ছিল রাজনীতি। ইহা ছাড়াও রাজনীতির সহিত ইতিহাসের আর একটা সম্বন্ধ আছে ঃ রাজনীতি-ঘটিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে ইতিহাসের রূপান্তর।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন এক শক্তির হস্ত হইতে অপর শক্তির করতলগত হয়, তখন তৎকালীন শাসক্‌শক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হয়-পূর্ববর্ত্তী শাসক-শক্তির প্রভাব কোনক্রমে নষ্ট করা ও উহাকে হেয় প্রতিপন্ন করা। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্নে উপায়ে ইতিহাসকে বিকৃত করিতে চেষ্টা করা হয়। কখনো বা ইতিহাসকে প্রয়োজনানুযায়ী রঞ্জিত করা হয়- কখনো বা প্রাচীন ঐতিহ্যের চিহ্নগুলি বিনষ্ট

www.pathagar.com

করিয়া তাহার উপর নূতন ছাপ দেওয়া হয়, কখনো বা সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইতিহাসের বিকৃত রূপকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত করা হয়। ফলে ইতিহাসের নামে জনসাধারণের মস্তিস্কে অনেক সময় যাহা অবস্থান করে, তাহা উপন্যাস অপেক্ষাও অধিক কাল্পনিক কাহিনীতে পূর্ণ। বস্তুতঃ এই সনাতন রীতির ফলে অদ্ভুতভাবে ইতিহাসের রূপান্তর ঘটিয়াছে।

আর্য্যদিগের ভারতভূমিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের আদিম অধিবাসীগণ অসভ্য রাক্ষসে পরিণত হইল এবং ইহাদের সভ্যতা বর্ব্বর সভ্যতা নামে আখ্যাত হইল। এই সভ্যতার চিহ্ন উত্তর-ভারত বা আর্য্যাবর্ত হইতে বিলুপ্ত হইয়া দক্ষিণাত্যের অঞ্চল বিশেষে এবং পূর্ব্বাঞ্চলে যৎসামান্য নিদর্শন রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। বর্তমান যুগের ন্যায় সে-যুগে ইতিহাস লেখা হয় নাই। লেখা হইয়াছিল রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় কথা ও কাহিনী। ভারতের আদিম অধিবাসীদের যে-চিত্র অঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক, উহা অবশ্য সেই ডাবেই অঙ্কিত রূপান্তরিত হইয়াছিল। তথাপি এই সকল কাহিনী রচয়িতাগণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাহিত্যের নিজস্ব অনুপ্রেরণার ফলে মাঝে মাঝে এই বর্বর জাতি ও বর্বর সভ্যতার যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপ্রত্যাশিতভাবে ইহাদের ঐশ্বর্য্যের কথাই স্বরণ করাইয়া দেয়। সুখের বিষয়, এ যুগে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণা ও মহেনজো-দারো প্রভৃতি স্থানের ভূগর্ভস্থিত আবিস্কারের ফলে প্রাগ-আর্য্য ভারতীয় সভ্যতার উপর নূতন আলোক-সম্পাত হইয়াছে। আশা করা যায়, এইবার ইতিহাসের এই পরিচ্ছেদেরও রূপান্তর ঘটিবে।

এই সনাতন রীতির ফলে ব্রহ্মণ্য-ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মৌর্য্য কুশান-সেবিত ভারতব্যাপী বৌদ্ধ-সভ্যতা ভারতবর্ষ হইতে তলপীতল্পা গুটাইয়া ভারতের অন্যান্য স্থানে ব্রহ্ম, মালয়, চীন প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা অধিকতর ট্রাজেডি আর কি সংঘটিত হইতে পারে যে, যে-ভারতেই বৌদ্ধধর্ম জনম পরিগ্রহণ করিল, যে-ভারতভূমি হইতেই উদ্ভুত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম দেশ-বিদেশে বিস্তার লাভ করিল ও যে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজণ্যবর্গ-অশোক, কনিষ্ক, হর্ষবর্দ্ধন ছিলেন বৌদ্ধ, সেই ভারতেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রকৃতপক্ষে মিসরের মমিতে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মণ্য-শক্তির অভ্যুত্থানের সময় কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রচিত হয় নাই। তবে অন্যভাবে ইতিহাসকে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সভ্যতার নির্দশনগুলিকে সাফল্যের সহিত ধ্বংস করিয়া। তাই আজ ভারতভূমি বৌদ্ধ প্রধান দেশ না হইয়া হিন্দু-প্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। গয়া, কাশী ও পুরী, বৌদ্ধ তীর্থ স্থান না হইয়া আজ শ্রেষ্ঠ হিন্দু-তীর্থক্ষেত্র।

www.pathagar.com

এই সনাতন রীতির অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ ভারতের ইতিহাস বিশেষতঃ মুসলমানদিগের ইতিহাস পাঠে শিক্ষিত ভারতবাসীর মস্তক অনেক স্থানে অবনত হইয়া আসে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজগণ যখন বাংলাদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন, তখন তাঁহারা দুইটি দেশীয় শক্তির সম্মুখীন হইলেন হিন্দু ও মুসলমান। মুসলমান সদ্য রাজ্যহারা হইয়াছে। আজিকার ন্যায় রাজ্যশাসন ও স্বাধীনতা স্বপ্ন বলিয়া প্রতিভাত না হইয়া অতিনিকট বাস্তব বলিয়াই তাহার কাছে মনে হইত। আশেপাশে তখনও মুসলিম শাসন প্রচলিত। সাময়িকভাবে রাজ্যচ্যুত হইলেও স্বাধীনতা ও নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা তাহার পক্ষে অধিকতর স্বাভাবিক ছিল। নবাব মীর কাসিমের জীবন এই কথারই প্রতিধ্বনি করে। হিন্দুগণ পূর্বে ও শাসিত ছিলেন, তখনও তাহাই রহিলেন। পরাধীনতা কষ্টকর হইলেও তাহাদের পক্ষে ইহা খুব বেশী অস্বাভাবিক ছিল না।

অধিকন্তু এককালে যাহারা হিন্দুদের উপর কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে নিজেদের সমপর্য্যায়ে ভূ-লুণ্ঠিত দেখিয়া নবাগত শাসক শক্তির সহায়ে হতমান মুসলমানদিগের উপর কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব পরিচালনা করিয়া পূর্ব ইতিহাসের প্রতিশোধ লওয়ার চেষ্টা হিন্দুদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। নবাগত শাসকগণ এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিতে তৎপর ছিলেন। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল, যেনতেন প্রকারেণ দেশ হইতে মুসলমান প্রভাব দূর করা, মুসলমানদিগের ঐতিহাসকে কলঙ্কিত করা, হিন্দু-মুসলমান বিরোধাত্বক প্রচেষ্টা দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি উগ্র করা এবং ভারতীয় যাহা- কিছু, তাহাকেই হেয় প্রতিপন্ন করা। ফলে হিন্দুর শত্রু হইল নেড়ে মুসলমান। ভারতবাসী হইল নেটিভ, ভারতবাসীর ভাষা হইল ভার্ণাকুলার। বস্তুতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পোড়াপত্তন হইয়াছিল এইভাবেই। পলাশীর যুদ্ধে নহে ; পলাশীর যুদ্ধ, দেশজয়ের একটা অভিনয় মাত্র।

ইতিহাস রূপান্তরিত হইতে লাগিল। সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ-যাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর কোন কোন শ্রেষ্ঠরাষ্ট্রের প্রধান বিশেষত্ব-স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার বলিয়া বিঘোষিত হইল। সুলতান মুহম্মদ তোগ্‌লকের মুদ্রাসংক্রান্ত উদ্ভাবন যাহা বর্তমান যুগের মুদ্রারীতির (monetory system) মূলগত ব্যাপার বেচারা সম্রাটকে বিকৃতমস্তিষ্কের দলভুক্ত করিল। ঐশ্বর্য্যমন্ডিত প্রাচ্যের সৌন্দর্য্যরাণী ভারতভূমির একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াও যিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন, যাহার সংযম-কঠোর জীবন হইতে মহাত্মা গান্ধীও বহু শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন, সেই রাজর্ষি

www.pathagar.com

বাদশাহ আলমগীরের চরিত্রও আজ এই ইতিহসের কল্যাণে কলঙ্কিত। মজলুম সিরাজউদ্দৌলা জুলুমবাজ বলিয়া দেশবাসীর অভিসম্পাত লাভ করে। ইতিহাসের ট্রাজেডি! যে সিরাজ বাংলার স্বাধীনতা-সমর-যজ্ঞে হৃদিরক্ত দিয়া আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী স্বরাজ-সাধক কংগ্রেস তাহার অর্ধ শতাব্দীকাল জীবনের মধ্যে সেই শহীদ সিরাজের নামোল্লেখ পর্যন্ত করিতে পারিলেন না। দেশের দুর্ভাগ্য, কংগ্রেসের অনুপ্রেরণা আসে ক্লাইভ ও হেস্টিংসের স্বদেশ হইতে সিরাজ বা মীরকাসিমের স্ব-ধর্মীয়গণের নিকট হইতে নহে। উল্লেখ্য ঃ-- ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন রিটায়ার্ড ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম-] তবে অত্যন্ত বেদনার সহিত আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে একথা বলিতে ইচ্ছা করে যে, যাহারা বাঙ্গালার বুকে বর্গীর হাঙ্গামার বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই মহারাষ্ট্রীয়গণের আদিপুরুষ শিবাজীর পূজা তাহারা করে, কিন্তু যাহারা সেই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বাংলাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কথা স্মরণ করে না। বাঙ্গালী হিন্দু পাঁচশত বৎসর পূর্বের চাঁদরায়, কেদার রায়ের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে, কিন্তু মাত্র পৌণে দুইশত বৎসর পূর্বে বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি বাংলার স্বাধীনতারক্ষার্থে ব্যর্থ সংগ্রাম করিয়া যে অবশেষে ঘাতকের কুঠারাঘাতে প্রাণবিসর্জন দিলেন, সে কথা স্মরণ করিতে সে আজ কুণ্ঠাবোধ করে। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইলে ফাঁসীকাষ্ঠই যাহার উপযুক্ত আশ্রয় হইত এবং অবশেষে আত্মহত্যা করিয়াই যাহাকে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, বাংলার স্বাধীনতাহরণ-ষড়যন্ত্রের অন্যতম চক্রী সেই রবার্ট ক্লাইভের স্মৃতি কলিকাতাবাসী সযত্নে রক্ষা করিতেছে। নন্দকুমার, অযোধ্যায় বেগম, কাশীরাজ-সংক্রান্ত অপকার্য্যে লিপ্ত ওয়ারেনহেষ্টিংস সম্বন্ধে প্রশাস্তি ছড়া রচিত হয় ঃ হাতীপর হাওদা ঘোড়াপর জিন, জলদী জলদী আও সাহেব হেস্টিংস। কিন্তু মীরমদন, মোহনলাল অবজ্ঞাত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিপ্লব স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা যাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রাম অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবজনক ব্যাপার বলিয়া ইতিহাসে স্থান পাইত আজ এই ইতিহাসের কল্যাণে গোটাকয়েক বিপথগামী সিপাহীর বিদ্রোহ নামে অবহেলিত। প্রয়োজনের তাগিদে রচিত অন্ধকূপ-হত্যার কল্পকাহিনী সবিস্তারে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। স্থান পায় নাই। সিপাহী বিপ্লবের অবসানে নিরস্ত্র নিরূপায় শাহজাদাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা, স্থান পায় নাই ছলচাতুরী অন্যায়ের সহায়তায় সিন্ধুর আমীর গণের স্বাধীনতা হরণ। আর স্বাধীনতা হোমাগ্নির সর্বশেষ স্ফুলিঙ্গ বাংলার আবদুল করিম তিতুমীরের ক্ষীণ প্রচেষ্টার কথা তো কেহ জানিতেই পারিল না। দেশের দুর্ভাগ্য, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয় নাই। নহিলে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই

www.pathagar.com

যাহারা সমাজের শ্রেষ্ঠ স্তর বলিয়া বিবেচিত হইত তাহারা কি করিয়া মাত্র এক শতাব্দী গত হইতে না হইতেই বর্তমানের অধঃপতিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, ইহার একটা যোগ্য সমাধান পাওয়া যাইত। ইতিহাসের নামে যাহা রচিত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস নহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক এক বিরাট প্রোপাগান্ডা মাত্র।

কাব্য নাটক উপন্যাসের ভিতর দিয়া ইতিহাস সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা প্রভুত পরিমাণে প্রভাবিত হইতে পারে। কুশীদজীবি ইহুদীগণের ইতিহাস কাহারও জানা না থাকিলেও সেক্সপীয়রের তুলিকা ইহুদী সাইলকের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, ইহুদীগণের পরিচয় হিসাবে তাহাই যথেষ্ট। সেক্সপীয়র প্রথমে সমাদৃত হয় জার্মানীতে। জার্মানীতে বর্তমান ইহুদী বিতাড়ন-নীতির পশ্চাতে সেক্সপীয়ারের সাইলক-চরিত্র যে কতখানি দায়ী, তাহা কে বলিবে?

দুঃখের বিষয়, উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত হিন্দুগণ বিদেশী শাসকগণের এই সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার মোহে ভুলিয়া এই রঞ্জিত ইতিহাস নাটক-উপন্যাসের ভিতর দিয়া জনসাধারণের নিকট প্রচার করিলেন। বস্তুতঃ মুসলিম বিদ্বেষের উগ্রতায় এই সাহিত্য ক্রুজেডযুগের ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলিত হইতে পারে। এই সাহিত্যের প্রধানতম স্রষ্টা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র।

বর্তমানে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছেন বঙ্কিমের মুসলমানপ্রীতি প্রমাণ করিতে। কিন্তু ইহার কি আবশ্যকতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান দ্বেষীই হউন বা মুসলমান-ভক্তই হউন, ইহা বিবেচ্য নহে। বিবেচ্য, শিক্ষিত হিন্দুর মনে তাহার অমর উপন্যাসগুলি মুসলমান সম্বন্ধে কি ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দুর কথা দূরে থাকুক, মুসলমানও বঙ্কিমের কোন কোন উপন্যাস-পাঠে স্বধর্মীয়গণের হীন চিত্রাবলী দর্শনে লজ্জায় অধোবদন হইবেন। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের চিরবিরোধ, হিন্দু স্বদেশবাসী, যবন মুসলমান পরদেশী। হিন্দু স্বভাবতঃ মহৎ, মুসলমান স্বভাবতঃ নীচ। হিন্দু দেশমাতার সন্তান, বিধর্মী মুসলমান অত্যাচারী, পররাজ্য লোভী, হিন্দুনারীর সম্ভ্রম বিনাশকারী। হিন্দু নারী সতীত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিতা, যবনী মুসলমান নারী-পবিত্রতা হীনা। রাজসিংহ, আনন্দমঠ, সীতারাম, মৃণালিনী, দূর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠে পাঠকের মনে এই সকল ধারণাই সৃষ্টি হয়।

রাজসিংহে'র মুসলমান বাদশাহের চিত্র অত্যন্ত হীনতাসূচক। বেগম শাহজাদীদের চিত্র দেখিয়া ঘৃণায় মুখ বিকৃত হইয়া আসে। যেখানে মুসলমানের চিত্রে মহত্তর বর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেখানে সাহিত্যিক বঙ্কিম হিন্দু বঙ্কিমকে ছাড়াইয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে। রীতির ব্যতিক্রম মাত্র।

www.pathagar.com

ইতিহাসের সম্মানই কি তিনি রক্ষা করিয়াছেন? বঙ্কিম-রচিত শ্রেষ্ঠ মুসলমান-পুরুষের চিত্র সম্ভবতঃ ওসমান। কিন্তু এই ওসমানও জগৎ সিংহের পার্শ্বে ম্লানজ্যোতি!

ইতিহাসের জগৎসিংহ মোটেই কীর্তিমান নহেন। ইতিহাসের জগৎ সিংহ মদ্যপ। অতিরিক্ত মদ্যপানবশতঃ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইতিহাসের ওসমান বীর শ্রেষ্ঠ। মোগলশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সমরে তিনি আত্মহূতি দেন। অন্তিম সময়েও এই বীরপুরুষ অভূতপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া যুদ্ধ পরিচালনাকালে তাঁর একচক্ষু বানবিদ্ধ হয়। সেই অবস্থায়ত্ত সংগ্রাম পরিচালনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নির্ভীক ওসমান সেই শায়ক উৎপাটন করিবার জন্য সবলে আকর্ষণ করেন। ফলে তাহার দুই চক্ষুই উৎপাটিত হইয়া যায়। বঙ্গবাসী জগৎসিংহ লাঞ্ছিত ওসমানকে জানে, জানে না মোগলত্রাস স্বাধীনতা-শাদ্দুল বীর ওসমানকে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের অপর বীর অধিনায়ক নবাব কতলু খাঁর চিত্রও মোটেই প্রশংসনীয় নহে।

প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে সপ্তদশ অশ্বারোহীর অধিনায়ক মুহম্মদ-ইবনে-বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গদেশের কিয়দংশ বিজিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বিশেষ কিছু প্রমাণিত হয় না। কোন বৃদ্ধ রাজা যদি অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া পলায়ন করেন, তাহাতে জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর পক্ষে অমর্য্যদার কিছুই নাই। যে-বাঙ্গলার বিজয়সিংহ সুদূর সিংহলে বাঙ্গালীর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, যে-বাঙ্গালার শশাঙ্ক মহারাজ হর্ষের পক্ষেও আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যে-বাঙ্গালার পালবংশীয় অধিপতিগণ উত্তর ভারতেও বাঙ্গালার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে-বাঙ্গালার স্বাধীনতা-প্রয়াসী পাঠান ও হিন্দু ভুস্বামীগণ প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলশক্তির নিকটও মস্তক অবনত করেন নাই, যে বাঙ্গালীর ক্ষাত্রবীর্য্য এই সেদিনও পলাশীপ্রাঙ্গণে বীর ক্লাইভকে আম্রকাননে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিল, সে বাঙ্গালীকে লক্ষণসেন ঘটিত আটশত বৎসরের পুরাতন ঐতিহাসিক নজীরের দোহাই দিয়া কোন ব্যক্তিই ভীরুতার অপবাদ দিতে সাহসী হইবেন না। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র কি এক অজ্ঞাত প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত অপ্রসাঙ্গিকভাবে মৃণালিনীর প্রারম্ভে অজ্ঞাতকুলশীল এক উৎকল-যুবরাজের বিকল্পে বীর মুহম্মদ-ইবনে-বখতিয়ারের চিত্রে এক পৌঁচকালী ঢালিয়া দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য বলিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস নহে। সত্য কথা। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইতিহাসের যেটুকু মুসলমানের

www.pathagar.com

পক্ষে প্রতিকূল সে-টুকু তিনি ইতিহাস হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং যেটুকু কাল্পনিক শক্তি এই চিত্রকে অধিকতর বিকৃত করিতে সাহায্য করে, তাহার সাহায্য লইয়া চিত্র শেষ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইতিহাসের যেটুকু মুসলমানের পক্ষে গৌরবজনক, সেটুকু তিনি গ্রহণ করেন নাই। ঔরঙ্গজেব, ওসমান, রওশন আরা, মুহম্মদ-ইবনে-বখতিয়ার প্রভৃতি চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই কথার সততা প্রকাশ পাইবে।

আপাতঃদৃষ্টিতে অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হইলেও ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্য যে, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের হাতে অতি চমৎকারভাবে নাচিয়াছেন। সিভিলিয়ান স্মিথ তাহার ইতিহাসের সাহায্যে যাহা করিতে সক্ষম হন নাই, ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্য দিয়া তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমাদের জাতীয়তা বাদীদের মহা মন্ত্র বন্দে মাতরম যাহার প্রশংসা কীর্ত্তনে মিঃ গান্ধীও পঞ্চ মুখ। বন্দেমাতরমে'র স্রষ্টা আনন্দমঠে'র রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তার স্বরূপ কি? দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত যদি ইংরেজদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন, তাহাতে আমাদের জাতীয়তাবোধ মোটেই ক্ষুন্ন হয় না। কিন্তু হিন্দু যদি মুসলমানের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন, তাহাতে বঙ্কিমের জাতীয়তা বাদের মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়। ফলে বঙ্কিমের আদর্শ বীর মুসলমান-বিদ্বেষী। সুদূর রাজস্থানের মাড়োয়ারী যুবক জগৎসিংহকে সন্ধান করিয়া তাহাকে হিরো সৃষ্টি করিতে হয়। বাংলার ওসমানকে তিনি খুঁজিয়া পান না।

বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের প্রকৃত স্বরূপ আনন্দমঠে প্রকট হইয়াছে। যে জাতীয়তাবাধ সন্তানদিগকে দেশোদ্ধার কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার অনুপ্রেরণা আসিয়াছিল মুসলিম-বিদ্বেষ হইতে। নেড়ে মুসলমানদের প্রাধান্য নষ্ট করাই এই জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য। ইংরাজ রাজনীতির উদ্দেশ্যও তাহাই। অবশ্য যদি নেড়েদের প্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করাই তাদের চরম লক্ষ্য হইত, তাহা হইলেও বন্দেমাতরমে'র ঋষির জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, এত কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদের স্রোত সগর্জনে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে বিলীন হইল ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজমে। বঙ্কিম জাতীয়তাবাদের চরম আদর্শ স্থাপন করিয়া কহিলেন ঃ মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। ইংরাজ দেশের রাজা হইয়াছে। অধর্মের পতন হইয়াছে, ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব জাতীয়তাবাদীদের করিবার আর কিছুই নাই। দেশোদ্ধার ব্রতী সন্তান'দল ছত্রভঙ্গ হইল। অতএব-

www.pathagar.com

এসো ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড়ো চিৎ,
অনিশ্চিত এ-সংসারে একথা নিশ্চিৎ,
গোলামী মাত্র সত্য, আর সত্য কিছু নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের নমক খাইয়াছিলেন, নিমকহারামি তিনি করেন নাই। পলাশী যুদ্ধে'র কবি অবশ্য জাতীয়তাবাদের মূলে এরূপ নির্মমভাবে কুঠারাঘাত করেন নাই। কিন্তু সিরাজের যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিলেন, তাহাতেও ইতিহাসের সম্মান মোটেই রক্ষিত হইল না। গর্ভিনীর উদ্‌রবিদারণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমর্থিত অসমর্থিত কোন কাহিনীই তিনি বাদ দেন নাই। ইংরাজ কবি বায়রণের ওয়াটার্লুর পূর্ববতী রজনী'র (Night before Waterloo) অনুকরণে প্রমোদরত সিরাজের যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিলেন, তাহাতে অনুকরণ সাফল্যমণ্ডিত হইলেও বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতির প্রতি বাংলার কবির আচরণ খুব বেশী শোভনীয় হইল না। রাজস্থানের চারণ কবিগণ দেশের বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ এহেন গাথা রচনা করিতেন না।

বাঙ্গালীর মনে সিরাজউদ্দৌলার যে-চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার সহিত নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধের সম্বন্ধ অল্প নহে। অক্ষয় মৈত্রেয়ের সিরাজউদ্দৌলা হয়ত ইহার কতকটা ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিশালী উপন্যাসগুলি জাতীয়তাবাদের যে মহাঅনিষ্ট সাধন করিয়াছে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষদুষ্ট আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, বর্তমান যুগের রায় বাহাদুর যদুনাথ সবকার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের আপ্রাণ চেষ্টাও তাঁহার সম্যক প্রতিকার করিতে পারে নাই। বঙ্কিমের ঔরঙ্গজেবকে অনেকেই জানেন, কিন্তু যদুনাধের ঔরঙ্গজেব বা ঈশ্বরী-প্রসাদের মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের (Medieval India) খবর কয়জনে রাখিয়া থাকেন!

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট সাহিত্য-প্রতিভাকে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে বঙ্গবাসীমাত্রই শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবেন। কিন্তু যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথা চিন্তা করা যায়, তখন তাহার অপরাধ, বিশেষ করিয়া তাহার সাহিত্যিক প্রতিভার জন্যই, ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিম প্রমুখ সাহিত্যিকগণের মুসলিম বিদ্বেষী গ্রন্থগুলি রচিত না হইত, তাহা হইলে অন্ততপক্ষে বাংলার হিন্দু মুসলমানের স্বরাজ সাধনার ইতিহাস নূতনরূপ ধারণ করিত।

মাসিক মোহাম্মদী শ্রাবণ-১৩৪৬

www.pathagar.com

সংসক্তি-খ

বাংলাদেশ গঠনে কৃতিত্বঃ ইন্দিরা, মুজিব না জিন্নাহর?

শেষমেশ ১০ই এপ্রিল মাউন্ট ব্যাটেন জিন্নাহকে ডেকে নিয়ে ঘণ্টা দুই ধরে কাতর ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, যাতে তিনি ভারত বিভাগের জন্য জেদ না করেন। জিন্নাহর কাছে তিনি পরাস্ত হলেন।

বড়লাট প্রাসাদ থেকে বিদায় নেবার আগে ওয়াভেল জওহরলালকে বলেছিলেন ঃ আমি যেখানে বিফল হলাম আমার পরবর্তী মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হয়ত সেখানে সফল হতে পারেন। মাউন্টব্যাটেন সফল হয়েছিলেন, নিশ্চয়ই সফল হয়েছিলেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, বল্লভ ভাই প্যাটেল ও জওহরলাল নেহরুর কাছে। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজার এই দাম্ভিক জ্ঞাতি ভ্রাতা চরম এবং শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন ক্ষয় রোগ গ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে। মাউন্ট ব্যাটেনের দুর্ভাগ্য, তিনি জানতেননা জিন্নাহ যাঁকে বিশ্বাস করতেন, যাঁকে শেষ পর্যন্ত কথা দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস যদি ১৬ই মের ঘোষণা মত গ্রুপ গঠনে রাজী হয়, তাহলে তিনি ভারত বিভাগ চাইবেন না, সেই সরল মানুষ সৈনিক ওয়াভেল বড়লাট প্রাসাদ থেকে চলে যাবার পর, জিন্নাহ ঠিক করে ফেলেছিলেন নেহরুর মনোনীত মাউন্টব্যাণ্টেন যা বলবেন তাতে তিনি শুধু বলবেন 'না'। ইতিহাস সেদিন লক্ষ্য করল না যে, সেদিন জওহরলালের প্রচেষ্টায় ওয়েভেলকে নয়াদিল্লীর বড়লাট প্রাসাদ ছেড়ে যেতে হলো এবং তাঁর জায়গায় ঢুকলেন তারই মনোনীত মাউন্টব্যাটেন।

অনেকে বলেন, মাউন্টব্যাটেনই বিভাগ করে দিয়ে গেছেন। কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। এটা ঠিক, মাউন্টব্যাটেন ভারতে না এলে হয়ত ভারত বিভাগ হতই না, কিংবা এ রকম লাখ লাখ লোকের মরণ যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে হতো না। আসলে জিন্নাহর অদম্য ইচ্ছা শক্তির কাছে মাউন্টব্যাটনকে আত্মসমর্পণ করতেই হলো।

পরের দিন ১১ই এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন তাঁর চীফ অফ স্টাফ লর্ড ইসমেকে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা তৈরী করতে বললেন। ইসমেকে ভারত বিভাগের খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করে বিলাতে মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাভের জন্য পাঠালেন। এই খসড়ায় ভারত ও পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে কোনো প্রদেশের

www.pathagar.com

একক স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা ছিল যার ফলে তখনই অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি হতে পারতো।

১৯৪৭-এর ২০শে জুন তারা বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে বসলেন যে, তাঁরা ভারতীয় কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীতে যোগ দিবেন না নতুন ও পৃথক কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীতে যোগ দিবেন।

এসেম্বলীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সদস্যেরা একযোগে ভোট দিলেন, তাঁরা ভারতীয় কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীতে যোগ দেবেন না, নতুন ও পৃথক কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীতে যোগ দেবেন। এই নতুন ও পৃথক কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীই হলো পাকিস্তান কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী। বাংলার মুসলমান এসেম্বলি সদস্যরা সে দিন স্বেচ্ছায় অন্যের বিনা প্ররোচনায় নিজেদের স্বাধীন চিন্তায় পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলেন।

এই সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলা দরকার। বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবার জন্য আমরা ভারতীয় কৃতিত্বের দাবী করি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সেই জন্য এই সময়ে এশিয়ার মুক্তি-সূর্য বলেও অতিহিত করা হতো। কিন্তু বিনীতভাবে বলতে চাই, যে লোকটির জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হলো তার নাম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

১৯৪৭ সালের ২০ শে জুন পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা জিন্নাহর আহ্বান অগ্রাহ্য করে, যদি পাকিস্তানে যোগ না দিতেন এবং তারপর দশ-বিশ বছর বাদে যে কারণে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হতে চাইতেন অর্থাৎ ভাষা পার্থক্যের জন্য ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে চাইতেন, তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা বাঙালীরা কি ফুলের মালা দিয়ে পূজা করতাম না রাস্তায় কুকুরের মত গুলী করে মারার দাবী জানাতাম? প্রায় একই কারণে শেখ আবদুল্লাহকে কত বছর কারাগারে থাকতে হয়েছিল নিশ্চয়ই সে কথা কেউ ভুলেন নি। পাকিস্তানে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপর পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবী জানালে পাকিস্তান পূর্ববাংলায় যে অত্যাচার করেছিল আমাদের ভারতবর্ষে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে তারপর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবী জানালে ভারত বর্ষ পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের চেয়ে বেশী না হোক, কম অত্যাচার করতো না। মিজোনাগাদের উপর আমরা যে অত্যাচার করেছিলাম পৃথিবীর লোক কোনদিন সে সংবাদ জানতে পারবে না এবং ভারতের মত শক্তিশালী দেশের সাথে লড়াই করবার জন্য ক্ষুদ্র পাকিস্তান বা পৃথিবীর কোন দেশের কার্যকরী সাহায্য পূর্ববাংলার লোকেরা পেতেন না। ভাগ্যবশতঃ পূর্ববাংলা পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলো তাই খুব সহজেই স্বাধীন হতে পারলো-

www.pathagar.com

না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দূর দিগন্ত হয়ে থাকতো। সেই জন্য বল্লাম, পূর্ববাংলার মুসলমানরা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানে যোগ দিয়ে ছিলো বলেই সহজে স্বাধীন হলো। ১৯৪০ এ লাহোরের পাকিস্তান প্রস্তাবে জিন্নাহ একাধিক মুসলমান রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নই দেখে ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে জিন্নাহর স্বপ্নই সফল হলো।

আর একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আমার মনে থেকে গেছে তার কোন সদুত্তর আমি পাইনি। একথা সবাই জানেন, ভারতীয় সৈন্য পূর্ববাংলায় যেতে না পারলে পূর্ববাংলা স্বাধীন করা যায় না। গোপনে যে ধরনের সাহায্য দেয়া হচ্ছিল তাতে একটা দেশকে স্বাধীন করা যায় না। পূর্ব থেকে লাখ লাখ আশ্রয় প্রার্থী ভারতে এসে পড়ায় ভারতের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে এই যুক্তিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত এই দাবী নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র নেতাদের সাথে সাক্ষাত করে তাঁদের কার্যকরী কিছু করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন-পৃথিবীর কোন দেশই এ ব্যাপারে ভারতকে কিছু অর্থ ভিক্ষা দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে রাজী হলনা। সত্য হোক, মিথ্যা হোক-এ কথাও তখন (ভারতের) অনেকে বলতেন যে, এই লাখ লাখ আশ্রয় প্রার্থী ভারতে আগমণও একটি ষড়যন্ত্রের ফল। এই পাকিস্তানীদের (আশ্রয় প্রার্থীরা তখনও পাকিস্তানী) ভারতে আগমণের দরুন ভারত এদের বসবাসের জন্য পাকিস্তান থেকে জমি দাবী করে লড়াই করতে পারতো এবং শেষকালে শ্রীমতী গান্ধীকে হয়তো সেই পথই নিতে হতো যদিও তাতে বিশ্বে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া খুব তীব্র হতো। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীকে রক্ষা করলেন একজন পাকিস্তানী ভদ্রলোক। তাঁর নাম জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তিনি ১৯৭১ এর ৩রা ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। অবশ্য তার পূর্বেই ভারত অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়েছিল।

বাংলাদেশ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল অরোরা ইলাষ্টেটেড উহকলি অব ইণ্ডিয়াতে লিখেছিলেন যে, এই সুযোগটি যেন ভগবৎ প্রেরিত এবং বাংলাদেশ যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে তিনি ইয়াহিয়া খাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর নামে একটি টোষ্ট পান করেছিলেন। ইয়াহিয়া খাঁ যদি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করতেন তাহলে ইন্দিরাগান্ধী বিশ্ব জনমতের সুযোগই পেতেন না। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারতো না এবং ইয়াহিয়া এইভাবে কয়েক বছর চুপ করে বসে থেকে সারা পূর্ববাংলাকে শ্মশান করে দিতে পারতো, লাখ লাখ পাকিস্তানী আশ্রয় প্রার্থী নিয়ে ভারতের অর্থনীতির উপরও অচিরেই গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। ৩রা ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইয়াহিয়া খাঁ ইন্দিরাকে পূর্ববাংলায় সৈন্য পাঠাবার সুযোগ করে দিলেন কেন?

www.pathagar.com

তিনি কি ইন্দিরা গান্ধীর কাজ থেকে মোটা টাকা ঘুষ পেয়েছিলেন? অথবা যে সব লোকের উপদেশ মেনে ইয়াহিয়া খাঁ চলতেন, তাদের মধ্যে কেউ কি ইন্দিরার চর ছিল?

ডঃ বিমলানন্দ শাসমল

(অমৃত বাজার, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৮)

www.pathagar.com

সংসক্তি-গ
ইতিহাস ঐতিহ্য
নেহেরু, জিন্নাহ এবং ভারত বিভাগ
ডঃ বিমলানন্দ শাসমল।

গত ১৪ই আগষ্টের "দি স্টেটম্যান" পত্রিকায় লণ্ডনস্থ ভারতের ভূতপূর্ব হাই কমিশনার শ্রী কুলদীপ নায়ার একটি নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যদিও বর্তমানে কোনো কোনো মহলে একটা ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সর্বান্তঃকরণে ভারত বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না তবুও সেই সময়কার বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা এখনও জীবিত তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে এবং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে নথিপত্র ঘেঁটে তিনি নিঃসন্দেহ যে, জিন্নাহ আগাগোড়া সর্বান্তঃকরণে ভারত বিভাগের দাবী নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, লর্ড ব্রুকম্যান, লর্ড ইজমে, আলান ক্যাম্পবেল জনসন প্রমুখ উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসার যাঁরা সে সময়ে কোনো না কোনোভাবে ভারত বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে ভারত বিভাগ সম্বন্ধে জিন্নাহর অনমনীয় মনোভাব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে হয়েছেন।

একথা ঠিক যে, ১৯৪০ এর লাহোর প্রস্তাবে (যাকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলা হয়) উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব ভারতে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৬ এর জুন মাসে জিন্নাহ যখন ১৬ই মের ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করলেন তখন তিনি বলেছিলেন এতে সার্বভৌম স্বাধীন পাকিস্তান পাওয়া যাবে না বটে কিন্তু তবুও এই প্রস্তাবটিকে কাজে লাগানো যায় কিনা সেটা দেখা দরকার এবং এই প্রস্তাবকে তারা ধ্বংস করে দেবার জন্য স্বেচ্ছায় কিছু করবেন না। এই কথা ভেবে তারা প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করেছেন। এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বিদেশ, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ মন্ত্রক এবং এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, শাসন ব্যবস্থার অন্য সকল অধিকার প্রাদেশিক সরকারগুলির দ্বারা গঠিত বিভিন্ন সেকশনের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। অতএব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে জিন্নাহ স্বীকৃত হয়েছিলেন।

মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যানে স্বীকৃত হওয়ায় জিন্নার পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নিতে আর বাধা ছিল না।

www.pathagar.com

কিন্তু বাদ সাধলেন জওহালাল নেহেরু। যদিও কংগ্রেস তাদের প্রস্তাবে বলেছিলো যে, তারা ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানকে সামগ্রিকভাবে মেনে নিচ্ছে তবুও জুলাই' ৪৬-এর প্রথম সপ্তাহে জহরলাল ঘোষণা করলেন, "আমরা কোন চুক্তিতে বাধ্য হইনি, আমরা শুধু একটি স্বাধীন সার্বভৌম কনষ্টিটিয়েন্ট এসেম্বলীতে যাব-এইটাই মেনে নিয়েছি এবং সেখানে এসেম্বলী যা ইচ্ছে করবে তাই পাস করতে পারবে।" গান্ধীজী মে মাসেই প্রকাশ্যেই একই মত প্রকাশ করেছিলেন। কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করতে পারতো যে অধিকার দিয়েছিল ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান। কংগ্রেস নেতাদের এই মনোভাব লক্ষ্যকরে জিন্নাহ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান থেকে তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে বলেছিলেন-আপোস মীমাংসা দ্বারা সাংবিধানিক পথে ভারতের সমস্যার এক শান্তিপূর্ণ সমাধানের সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে মুসলিম ভারত ব্যর্থ হয়েছে এবং বৃটিশ সরকারের সমর্থনে কংগ্রেস যখন ভারতে বর্ণহিন্দুদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর এবং যখন বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যাচ্ছে যে, ন্যায়বিচার এবং নিরপেক্ষ নীতি নয় বরং ক্ষমতা লিপ্সার রাজনীতি ভারতের বিভিন্ন ব্যাপারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ-করে তখন এটা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, ভারতের মুসলমানরা ততক্ষণ শান্তি লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ-না একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।" ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের গ্রুপিং কংগ্রেস মেনে নিতে পারেনি কারণ সেই ব্যবস্থায় ওই সব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে যেত ও হিন্দু ও শিখরা সংখ্যা লঘু হয়ে থেকে যেত। তখন স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য জিন্নাহ ডাইরেক্ট এ্যাকসনের ডাক দিলেন। এই কার্যক্রম শুরু হতেই পাঞ্জাবে অবস্থা খুব গুরুতর আকার ধারণ করলো। কারণ সেখানে মুসলিম লীগ "প্যারালাল গবর্ণমেন্ট" প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছিল। তখন ভারতে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বল্লভভাই প্যাটেল তখন স্বরাষ্ট্র দফতরের ভারপ্রাপ্ত। তিনি বড় লাট ওয়েভেলের নিকট দাবী করলেন যে, পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের আন্দোলন নির্মূল করে দেবার জন্য সেখানে মিলিটারী শাসন চালু করা হোক। ওয়েভেল সরাসরি এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন। নেহেরু এবং প্যাটেল বড়লাটের নিকট অনুযোগ করলেন যে, "ডাইরেক্ট এ্যাকশানের" কার্যক্রমে দেশের শান্তি শৃংখলা গভীরভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তখন ওয়েভেলের একান্ত সচিব ইভান জেংকিন্স বলেছিলেন, "কংগ্রেস'ত "১৯২১ সাল থেকেই "ডাইরেক্ট এ্যাকসন" শুরু করেছে। এবার মুসলিম লীগের পালা"

কিন্তু ওয়েভেলকে মিলিটারী শাসনের প্রস্তাবে রাজী করাতে না পেরে জওহরলাল নেহরু কৃষ্ণ মেননকে বিলাতে পাঠালেন ওয়েভেলকে বড়লাটের

www.pathagar.com

পদ থেকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট করে ভারতে পাঠাতে।

ওদিকে ১৯৪৬-এর ৩রা ডিসেম্বর বৃটিশ সরকার নেহরু, বলদেব সিং, জিন্নাহ ও লিয়াকত আলীকে লন্ডনে ডেকে পাঠালো যাতে সকলে মিলে ভারতীয় সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু এই আলোচনা সফল হোলো না। কারণ নেহরু গ্রুপবদ্ধ প্রদেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করতে রাজী হলেন না এবং জিন্নাহ বললেন, গ্রুপবদ্ধ মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলিই মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

৯ই ডিসেম্বার কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি শুরু হচ্ছে। অতএব নেহরু তার আগে ভারতে ফিরে এলেন। জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ এসেম্বলী বয়কট করেছিলেন। তিনি লন্ডনে থেকে গেলেন। তিনি বোধ হয় শান্তিপূর্ণ পথে সমস্যা সমাধানের একটা শেষ চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন। ১৪ ই ডিসেম্বর বিখ্যাত হোটেল ডরচেষ্টারে তিনি এক মধ্যাহ্ন ভোজের পার্টি দিলেন। নিমন্ত্রিত হলেন উইনস্টন চার্চিল, এন্টনি ইডেন, এটলি, পেথিক-লরেন্স ও স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্। শেষ মুহূর্তে এটলি, পেথিক-লরেন্স ও ক্রিপ্‌স্ জিন্নাহর ভোজে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন যদিও প্রথমে তারা সকলেই জিন্নাহর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

উইনস্টন চার্চিল তখন হাউস অব কমন্সে বিরোধী দলপতি। সেই হেতু তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন যে, বৃটিশ সরকার ওয়েভেলকে বরখাস্ত করে মাউন্টব্যাটেনের হাতে ভারতের শাসনভার তুলে দিচ্ছে। এবং এটাও তখন উচ্চপদস্থ সরকারী মহলে গোপন ছিল না যে মাউন্টব্যাটেন ভারতে যাচ্ছেন নেহরুর নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে। ওয়েভেলের দিনপঞ্জিতে এর উল্লেখ আছে। চার্চিল ও ইডেন কিন্তু জিন্নাহর ভোজে এলেন এবং যদিও এর কোনো লিখিত প্রমাণ নেই তবুও এটাই স্বাভাবিক যে, চার্চিল জিন্নাহকে বড়লাটরূপে মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগের কথা জানিয়েছিলেন এবং এতে যে নেহরুর হাত ছিল সেটাও নিশ্চয়ই জানিয়েছিলেন।

এর চারদিন পরে ১৮ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী এটলি মাউন্টব্যাটেনকে ডেকে পাঠালেন জানবার জন্য যে ভারতের বড়লাটের পদ নিতে তিনি রাজি আছেন কি না?

জিন্নাহ সন্দেহ করলেন যে যেমন ওয়েভেলকে অনুরোধ করা হয়েছিল পাঞ্জাবে মিলিটারী শাসন চালু করবার জন্যে মাউন্টব্যাটেনের মত একজন

www.pathagar.com

সেনাপ্রধানকে নেহেরু নিয়ে আসছেন মিলিটারীর সাহায্যে মুসলমানদের দাবিয়ে রাখতে। তিনি মন স্থির করে ফেললেন, মাউন্টব্যাটেনের হাতে মুসলিম ভারতও ন্যায়বিচার পাবে না। এই ভেবে জিন্নাহ পাকিস্তানের জন্যই দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। অতএব কুলদীপ নায়ার প্রভৃতি যারা জিন্নাহকে পাকিস্তান সম্বন্ধে অনমনীয় মনোভাবের ধারক হিসেবে প্রচার করতে চাইছেন তারা সর্বদা সত্য কাহিনী প্রচার করছেন না।

জিন্নাহর সবচেয়ে বড় ক্ষোভ ছিল যে নানা মিথ্যা অছিলায় এবং ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের ভুল ব্যাখ্যা করে কংগ্রেস নেতারা মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে নিতে চায়। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে মুসলমানদের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করায় জিন্নাহ ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে কংগ্রেস নেতারা মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় জিন্নাহর পক্ষে স্বতন্ত্র স্বাধীন পাকিস্তান দাবী করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

শেষমেশ গান্ধীজী এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেনঃ "মিঃ জিন্নাহকে নতুন ভারত সরকার গঠনের দায়িত্ব দেয়া হোক-মিঃ জিন্নাহ যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহলে কংগ্রেস তাকে পূর্ণ সমর্থন ও আন্তরিক সহযোগিতার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেবে। কিন্তু মিঃ জিন্নাহকে দেখতে হবে তিনি যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তা যেন সারা ভারতের সকল মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় এবং এই সকল ব্যবস্থা সমগ্র ভারতের সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক হচ্ছে কি না সেটা দেখবেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও মিঃ জিন্নাহ ও মুসলিম লীগকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তারা সারা ভারতের সর্বত্র পূর্ণ শান্তি অক্ষুন্ন রাখবেন-কোথাও কোনো ন্যাশনাল গার্ড বা কারও ব্যক্তিগত বাহিনী থাকবে না। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ও কাঠামোয় মিঃ জিন্নাহ তার প্রস্তাবিত পাকিস্তান পরিকল্পনা সকলকে গ্রহণ করার জন্য পেশ করতে পারতেন না, কিন্তু তাকে বল প্রয়োগের পথ ত্যাগ করে যুক্তিতর্কের পথে এগোতে হবে।"

কিন্তু মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজীর এই প্রস্তাব নেহেরু ও প্যাটেলের নিকট উত্থাপন করলে তারা দুজনেই এটাকে নস্যাৎ করে দেন এবং মাউন্টব্যাটেন ও সেই জন্য এই প্রস্তাব কোনদিন জিন্নাহর গোচরে আনেননি। কংগ্রেস নেতারা যদি উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোতে

www.pathagar.com

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান চালু করতে রাজি হতেন তাহলে জিন্নাহ পাকিস্তানের দাবী তোলবার অবকাশই পেতেন না।

[ইনকিলাবের সৌজন্যে।-১১ই আশ্বিন ১৩৯৮]

www.pathagar.com

সংসক্তি-ঘ
উপমহাদের যখন বিভক্ত হলো
খন্দকার-হাসনাত করিম

জাতি গঠনের যাবতীয় নৃতাত্ত্বিক, জীবতাত্ত্বিক ও সামাজিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের এখানে ওখানে যে সব জাতিসত্তা বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তাদেরকে ভৌগোলিকভাবে টুকরো করে ফেলার প্রস্তাব কখনোই মুসলমানরা করেনি। মুসলিম লীগ এমনকি বৃটিশ রাজেরও এহেন প্রস্তাব ছিলো না কস্মিনকালেও। বিশেষ করে বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তি কখনোই মুসলিম লীগ বা কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌র কাম্য ছিলো না। পাঞ্জাব বা পাঞ্জাবীদের, কাশ্মীর বা কাশ্মিরীদের কিংবা বাংলা বা বাঙ্গালীদেরকে ভেঙ্গে ফেলার ইতিহাস-বিরুদ্ধ কাজ লীগের নয়, বৃটিশ কেবিনেট মিশনেরও নয়। বাংলা ও পাঞ্জাবের অবিভাজ্যতার ব্যাপারে জিন্নাহ্ সাহেবের বলিষ্ঠ বক্তব্য ও অকাট্য যুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় বিদায়ী বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে তাঁর সংলাপ-পর্বে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেনঃ "আমি চাই না, ভারত বিভক্ত হোক"। আমি আমার যুক্তির সপক্ষে সকল বক্তব্য পেশ করলাম জিন্নাহর সামনে। উত্তরে জিন্নাহ্ বললেন, "ভাল কথা। কিন্তু তাদের (কংগ্রেসের) মুখের কথায় কোনো ভরসা নেই। দেখুন ১৯৩৮-৩৯ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে তারা আমাদের প্রতি (ভারতীয় মুসলমানদের উপর) কি ব্যবহার করেছে। আপনারা যখন বৃটেনে ফিরে যাবেন তখন আমাদেরকে চিরতরে হিন্দুদের দয়ার উপর টিকে থাকতে হবে। কোথাও আমাদের কোনো পাত্তা থাকবে না।" আমি বললাম, "নেহরুর মত সৎ কর্মী থাকতেও কি আপনি ভরসা পান না?" উত্তরে জিন্নাহ্ বললেন, "১৯৩৮-৩৯ সালেও তো নেহরু খুব শক্তিশালী কংগ্রেস নেতা ছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের উপর জুলুম ও অবিচার চলতে দেখেও নেহরু তা থামাতে ব্যর্থ হন।". . . . . .

জিন্নাহ্ বলেন, "আপনারা আমাদেরকে একটি টিকে থাকার মত (viable) পাকিস্তান দিন। আমাদেরকে অবশ্যই পুরা পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, সম্পূর্ণ বাংলা প্রদেশ ও আসাম দিতে হবে এবং এগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগের জন্য আমরা একটি করিডোর চাই।" আমি বললাম, "আপনারাই বলছেন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যালঘুদের উপর শাসন আপনারা মেনে নেবেন না। তাই পাকিস্তান যদি আপনাদের কাম্যই হয়,

www.pathagar.com

তাহলে আমাকে অবশ্যই পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করতে হবে।" উত্তরে জিন্নাহ্ স্পষ্ট করে বললেন, "মহামান্য বড়লাট, আপনি কেন বুঝতে চাইছেন না যে, পাঞ্জাবীরা একটি জাতি। বাঙ্গালীরাও একটি জাতি। একজন লোক হিন্দু না মুসলমান তার আগে তার পরিচয় তিনি একজন বাঙ্গালী অথবা একজন পাঞ্জাবী। এই দুইটি প্রদেশ যদি আপনারা আমাদেরকে দেন, তাহলে কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে ভাগ করতে পারবেন না। আর শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশকে ভাঙ্গার সিদ্ধান্তে যদি আপনারা অটল থাকেন, তাহলে এই দু'টি প্রদেশের স্বনির্ভরতাকেই (viability) আপনারা ধ্বংস করে দেবেন। বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তি অন্তহীন রক্তস্রোত বইয়ে দেবে এবং সমস্যা দিনকে দিন জট পাকাতেই থাকবে "(Your excellency does not understand that the Punjab is a nation. Bengal is a nation. A man is a Punjabi or a Bengali first before he is a Hindu or a Muslim. If you give us those provinces you must, under no circumstance, partition them. You will destroy their viability and cause endless bloodshed & troubles.`` MOUNTABTTEN & PARTITION OF INDIA/ INTERVEWS / PART-I/ Peter Collins & Dominique Lappiare) / Page : 43.

বৃটেনের কেবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে ভারতে আসে। ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই মিশনের সদস্য ছিলেন লর্ড পেথিক লরেন্স (সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া), স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ (প্রেসিডেন্ট অব দি বোর্ড অব ট্রেড) এবং এ, ভি, আলেক্সাণ্ডার (ফার্স্ট লর্ড অব দা এ্যাডমিরালটি)। লীগ ও কংগ্রেসের পরস্পর-বিরোধী মতাবস্থান ও দ্বন্দ্বের মধ্যে যেটুকু যোগসূত্র খুঁজে বের করা যায় সেটুকুই হয় এই মিশনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। উপমহাদেশের দেশগুলিকে কেবিনেট মিশন একটি ফেডারেল সরকারের অধীনে তিনটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করার সুপারিশ করে। (এই প্রস্তাবটি সেই বিখ্যাত A, B. C. ফর্মুলা নামে পরিচিত)। কেবিনেট মিশন ২০শে মার্চ, ১৯৪৬ করাচীতে অবতরণ করেন। অবস্থান করেন প্রায় দুই মাস। দীর্ঘ দরবার করেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে। এর পর তাঁরা তাদের সুচিন্তিত প্রস্তাবাবলী পেশ করেন ১৬ মে, ১৯৪৬। কেবিনেট মিশন একটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন বৃহৎ ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করেন- যেমন আজকের সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। মিশন যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তাতে ভারত বিভাগের কোনো নিদর্শন ছিলো না বরং বিশ্বের মানচিত্রে একটি শক্তিশালী ভারত গঠনেরই রূপরেখা ছিলো কেবিনেট মিশন প্রস্তাব। প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

১। বৃটিশ ভারত ও দেশীয় স্বাধীন রাজ্যগুলোকে নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন সংগঠিত হওয়া উচিত, যার বিষয়াবলী থাকবে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ। (কেন্দ্রীয় দফতর)। উপরোক্ত বিষয়াবলীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের আবশ্যকীয় ক্ষমতা থাকা উচিত কেন্দ্রের।

২। ইউনিয়নের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি ছাড়া সকল বিষয় এবং বাদবাকী সকল ক্ষমতা প্রদেশের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত।

৩। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি ছাড়া সকল বিষয় ও ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যগুলোর আয়ত্বাধীন থাকবে।

৪। প্রশাসন ও আইনসভাসহ 'গ্রুপ' গঠন প্রদেশগুলির এখতিয়ারাধীন। কোন্ কোন্ প্রদেশ প্রাদেশিক বিষয় সাধারণভাবে গ্রহন করা হবে, সে বিষয়ে প্রত্যেক গ্রুপই সিদ্ধান্ত নেবে।

৫। কেন্দ্র ও গ্রুপগুলির সংবিধানে সংস্থান থাকা উচিত যে, প্রাথমিক দশ বছর এবং তৎপরবর্তী প্রত্যেক দশ বছর অন্তর অন্তর যে কোনো প্রদেশ স্বীয় আইন পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে সংবিধানের ধারাগুলির ব্যাপারে পুনঃবিবেচনা করতে পারবে।

ভারতবর্ষকে নিম্নোক্তভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করা হোক ঃ

সেকশন ঃ 'এ' মাদ্রাজ, বোম্বে, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ, এবং উড়িষ্যা (১৬৭ টি সাধারণ আসন ও ২০ টি মুসলিম আসন)।

সেকশন ঃ 'বি' পাঞ্জাব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ (৯টি সাধারণ আসন, ২২টি মুসলিম আসন এবং ৪টি শিখ আসন)।

সেকশন ঃ 'সি' বঙ্গদেশ ও আসাম। (৩৪টি সাধারণ আসন ও ৩৬টি মুসলিম আসন)।

এহেন বাস্তবোচিত এবং ফেডারেল কায়দায় বিন্যস্ত পরিকল্পনাকে তাই নাম দেওয়া হয় A. B. C. পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানায় ভারতীয় মুসলমানগণ। ১৯৪৬ সালের ২৫শে জুন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ছয়টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ (যথা অবিভক্ত বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান) সমবায়ে একটি গ্রুপ গঠনের দাবী করে এবং এই দাবী পুরণে বৃটিশ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অখণ্ড ভারতের সংবিধান রচনাকল্পে প্রস্তাবিত গণপরিষদে যোগদান করতে সম্মতি প্রকাশ করে। এই

www.pathagar.com

পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভারতের অখণ্ডতা কোনোদিনই ভঙ্গ হতো না কিংবা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিকভাবে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগ করতে হতো না।

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি বলেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অপ্রিয় ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যে পরিণত হয়েছে। বাংলা-বিভক্তির প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েই ১৯৭১ সালে রক্তগঙ্গায় ভাসতে হয়েছে পূর্ববঙ্গকে এবং আজ ছয় বছর ধরে পাঞ্জাবে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলছে। প্রাণ খোয়াতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল (অবঃ) বৈদ্যকে। তারপরও রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না।

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা কেন বাস্তবায়ন করা গেলো না?

১৯৪৬ সালের ১০ই জুলাই তারিখে বোম্বে শহরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদ্য নিযুক্ত সভাপতি পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু ঐক্যের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে দিয়ে ঘোষণা করেন, "কংগ্রেস গণপরিষদে অংশগ্রহণে সম্মত হয়েছে বটে, তবে কংগ্রেস যাকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করেন সেই মোতাবেক কেবিনেট মিশন প্লানকে পরিবর্তন বা সংশোধন করার ব্যাপারে নিজেকে স্বাধীন মনে করে।" এই ঘোষণা ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান নাগরিককে শংকিত করে তোলে। ফলে পর্যায়ক্রমে সর্ব ভারতীয় একটি অখণ্ড কাঠামো বজায় রাখার যাবতীয় উদ্যোগ বানচাল হয়ে যায়। বিদেশী ইংরেজ জনগণ এবং সরকার যখন অখন্ড ভারত গঠন ও সংবিধান প্রণয়নে সচেষ্ট তখন ভারতীয় বর্ণহিন্দুর সংগঠন কংগ্রেসের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের কারসাজিতে সূচিত হলো ভারতকে খণ্ড খণ্ড করার এক অনাকাঙ্ক্ষিত প্রক্রিয়া। অথচ আজ ভারত বিভক্তির জন্য মুসলিম লীগকে দায়ী করা হয়। ভারত বিভাগের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী বৃটিশ ও হিন্দু নেতৃত্ব। ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী বৃটিশ নেতৃত্ব মাউন্টব্যাটেন-নেহরু-মেনন ও প্যাটেল চক্রকে দিয়েই বাংলা ও পাঞ্জাব ভঙ্গের শর্তসাপেক্ষে ভারতকে দু'টুকরো করে। সেদিন কংগ্রেস যদি কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা খেয়ালখুশি মতো কাট-ছাঁট করার অন্যায় আবদার না ধরতো তাহলে লীগও কেবিনেট মিশন প্লান প্রত্যাখ্যান করতো না। পাঞ্জাব ও বাংলার লক্ষ কোটি হতভাগ্য মানুষকে এভাবে দেশান্তরী হয়ে বাস্তুহারা হতে হতো না। পৃথক পাকিস্তানেরও দরকার পড়তো না। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নামক দুরারোগ্য রাজনৈতিক ব্যাধিরও উদ্ভব ঘটতো না।

বলাবাহুল্য, নেহরুর এহেন বিপজ্জনকও একচোখা ঘোষণার পর ভারতীয় মুসলমানরা ফের ফিরে যেতে বাধ্য হলেন ১৯৪০ সালের বক্তব্যে। ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

আয়ান স্টীফেন্স তাঁর 'পাকিস্তান' গ্রন্থে বলেছেন, "গান্ধী ও নেহরুর একগুয়ে চাপের মুখে কেবিনেট মিশন ব্যর্থ হয়ে বিলাতে ফিরে যায়।" ভাগ্য নির্মাণের দরকষাকষিতে মুসলিম লীগের বলিষ্ঠতাকে আরও বাড়িয়ে দেয় ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে।

এই সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম আসনগুলিতে লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সর্বভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র বৈধ ও আইনগত প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়। কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবে স্বাধীন গ্রুপ গঠনের অধিকার প্রাদেশিক আইনসভার এখতিয়ারভুক্ত করায় সর্বভারতীয় উচ্চ বর্ণ হিন্দু শ্রেণীর কয়েক শতাব্দীর কায়েমী স্বার্থে (অর্থাৎ মাড়োয়ারী স্বার্থে) আঘাত লাগে। পাঞ্জাব এবং বাংলা প্রদেশ দুইটি ছিলো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাজেই উপমহাদেশে মুসলমানদের দাবিয়ে রাখা যাদের প্রধান নীতি সেই উচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণদের আশংকা জাগে এ, বি, সি, ফর্মুলায় গেলে মুসলমানদেরকে কিছুতেই পদানত করে রাখা যাবে না। প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও পররাষ্ট্রনীতির মতো তিনটি বিষয় হাতে রেখে কেন্দ্রের পক্ষেও সম্ভব হবে না প্রদেশগুলিকে যেমন খুশী শোষণ এবং শাসন করা। তাছাড়া ফেডারেল কেন্দ্রেও যে হিন্দুদের একচেটিয়া দখল কায়েম হবে এমনও কোনো কথা নেই। বর্ণ ব্রহ্মণ্য শ্রেষ্ঠত্বের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি থেকেই আসে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত। বৃটিশ সরকার এবং কংগ্রেসের যোগসাজশে লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে তাঁর স্থলে কংগ্রেস-সমর্থক এবং নেহরুর বন্ধু রাজদূত লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে আনার চেষ্টা চলে। মাউন্টব্যাটেনের মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব ছিলো সর্বজনবিদিত। তাঁর মতো একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে ভারতে বৃটেনের রাজদূত নিয়োগের সিদ্ধান্তে সে দেশেও ব্যাপক সমালোচনার ঢেউ তোলে। কংগ্রেসের স্বার্থপরতা, সর্বভূত আগ্রাসী নীতি এবং বৃটেনের অহেতুক কালক্ষেপনের নীতি মুসলিম লীগকে ক্রমেই অসহিষ্ণু করে তোলে। তারা দেখতে পান যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। ১৯৪৬ সালে ২৯ শে জুলাই বোম্বাই সম্মেলনে লীগের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, "যেহেতু কংগ্রেসের অনমনীয়তা এবং বৃটিশ সরকারের বিশ্বাসভঙ্গের কারণে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব কার্যতঃ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, যেহেতু সমঝোতা ও নিয়মতান্ত্রিক পথে ভারতীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে মুসলিম ভারত সর্ব প্রচেষ্টা নিঃশেষ করেছে, যেহেতু বৃটেনের পরোক্ষ সমর্থনে বলীয়ান হয়ে কংগ্রেস বর্ণ হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর, যেহেতু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, ভারতের ব্যাপারে ন্যায় বিচার ও নিরপেক্ষতা নয় বরং ক্ষমতার রাজনীতিই সবকিছু নির্ধারক এবং নিয়ন্তা,

www.pathagar.com

যেহেতু এটি আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, স্বাধীন ও পূর্ণ সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ছাড়া ভারতীয় মুসলমান শান্ত হবে না এবং মুসলিম লীগের অনুমোদন ও সম্মতি ছাড়া কোনো সংবিধান রচনাকারী সংস্থা অথবা দীর্ঘ কিংবা স্বল্পমেয়াদী সংবিধান অথবা কেন্দ্রে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের যে কোনো প্রচেষ্টাকে বাধা দেবে-সেহেতু নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পাকিস্তান অর্জনের জন্য "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম"-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে।

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ভাঙ্গনের মেঘ জমলেও বাংলাকে অখণ্ড রাখার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং লীগ নেতৃবৃন্দ নিরন্তর আপোষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতা শরৎ বসু এবং লীগ সম্পাদক আবুল হাশিমের মধ্যে বাংলার অখণ্ডতার বিষয়ে চুক্তি পর্যন্ত সম্পাদিত হয়। অথচ বঙ্গসন্তান হয়েও হিন্দু মহাসভার নেতা ডাঃ শামা প্রসাদ (২৩-২-১৯৪৭) এক বিবৃতিতে বঙ্গভঙ্গের দাবী করেন। তারেকেশ্বরে (অনুষ্ঠিত) প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলনে হিন্দুবঙ্গ (পশ্চিম বঙ্গ) বঙ্গভঙ্গের দাবী করেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালিনী তারই সমর্থনে বঙ্গভঙ্গের দাবীকে প্রকাশ্য বিবৃতি দেন। স্বাধীন বঙ্গ গঠনের মহৎ স্বপনে বিভোর হয়ে বাংলার কংগ্রেস, লীগ, সকলেই যখন বঙ্গব্যবচ্ছেদ রোখার চেষ্টা করছে, তখন কৃপালিনী, ট্যাণ্ডেন, নেহরু, প্যাটেল এবং শ্যামা প্রসাদের মতো সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতার সিদ্ধান্তে বাংলাকে শেষ পর্যন্ত ভাগ করা হলো।

১৯০৫ সালে যাদের পূর্ব পুরুষরা বঙ্গভঙ্গকে বঙ্গমাতার ব্যবচ্ছেদ বলে হৈ চৈ করেছিল এবার তাদের উত্তরসূরীরাই বঙ্গবিভাগের প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করল। তাদের দাবীই মানলো বৃটিশ। ইংরাজ সরকার ৩রা জুন '৪৭ পরিকল্পনায় ভারত বিভক্তির প্রস্তাব করলো। মুসলিম লীগ কাউন্সিল ৪০০-৮ ভোটে মাউণ্টব্যাটেনের ৩রা জুন পরিকল্পনা মানতে বাধ্য হলো। নেহরু মাউণ্টব্যাটেনের কারসাজিতে মন্দের ভাল হিসেবে পোকায় খাওয়া পাকিস্তানই মেনে নিতে হল। অতীব আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগ সাপেক্ষে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির সুপারিশ কোনো মুসলমান করেননি। ১৯৪৩ সালে ক্রীপ্‌স্ মিশন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার সময় জিন্নাহ্ সাহেবকে এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রাজা গোপালাচারী। রাজা গোপালাচারীর পরিকল্পনা শেষতক নেহরুর হাতেই বাস্তববায়িত হলো। এই ৩রা জুন পরিকল্পনা অনুযায়ী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতাসম্পন্ন প্রদেশগুলিকে খাপছাড়াভাবে একটি ইউনিটভুক্ত করা হলো। একটি থেকে অন্যটির ব্যবধান হাজার মাইলেরও বেশী। সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসীরা মন্ত্রীসভা গঠন

www.pathagar.com

করেছিলো। সুতরাং সীমান্ত প্রদেশ ও সিলেটে দ্বিতীয়বারের জন্য চূড়ান্ত মতামত যাঁচাইমূলক গণভোটের ব্যবস্থা করা হলো। গণভোটে সীমান্ত প্রদেশ ও সিলেটবাসী বিপুল ভোটে পাকিস্তানে যোগ দেবার পক্ষে রায় দেয়।

১৪ ও ১৫ই আগস্ট পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটল পাকিস্তান ও ভারত নামের দু'টি রাষ্ট্র। লাহোর প্রস্তাব, ক্রীপস্ মিশন ও কেবিনেট মিশন প্রস্তাবের পরিবর্তে সম্পূর্ণ কংগ্রেসী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটেছিলো ৩রা জুন (বা মাউন্টব্যাটেন) পরিকল্পনায়। আর সেই পরিকল্পনা অনুসারেই উপমহাদেশের মানচিত্রে শেষ চাকু বসিয়েছিলেন র‍্যাডক্লিফ সাহেব। সে চাকুর রক্ত এখনও ঝরছে। উপমহাদেশের ক্রমবিবর্তনশীল রাজনৈতিক হাল অবস্থা কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সেদিনের দুঃখজনক ভবিষ্যদ্বাণীকেই অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত করে চলেছে।

[ইনকিলাব-১০/১/৯৮]

www.pathagar.com

সংসক্তি-৬
[ইনকিলাব-১/৮/৮৮]
১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময় বঙ্গদেশ বিভক্ত হল কেন? কারা ভাগ করল?

ভারত বিভাগে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যে সমান অবদান ছিল, এবং এক পর্যায়ে গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল, কৃষ্ণমেনন প্রমুখ কংগ্রেস নেতা সে জন্য যে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন, সে কথা মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর "ইনডিয়া উইনস ফ্রিডম" গ্রন্থে (ওরিয়েন্ট লংম্যানস, কলকাতা, ১৯৫৯) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশ বিভাগ? আশ্চর্য! এখানেও সেই হিন্দু নেতাদের জেদই জয়ী হয়েছে।

ভাইসরয়ের প্রেস এটাচী অ্যালান ক্যাম্পবেল-জনসন বলেছেন যে, কংগ্রেসের সভায় পার্টিশন প্লান আনুষ্ঠানিকভাবে পাস হওয়ার আগে "১৯৪৭ সালের ২রা জুন সোমবার নয়াদিল্লীর ভাইসরয় হাউজে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাতজন শীর্ষস্থানীয় নেতার সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি সমস্যার প্রকৃতি বর্ণনা করে বলেন যে, কংগ্রেস নীতিগতভাবে ভারত বিভাগ সমর্থন করতে চায় না। তবে তাদের দাবী হচ্ছে এই যে, ভারত বিভাগ যদি অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে হিন্দু বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভীতি পরিহার করার জন্য প্রদেশগুলিও অবশ্যই ভাগ করতে হবে। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ ভারত বিভাগ চায়। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ তাঁকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা কোনও প্রদেশের বিভাগ মেনে নেবেন না।" (মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, জয়কো পাবলিশিং হাউজ, বোমবাই, ১৯৫১-১১৫ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ সোজা কথায় বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে কংগ্রেস বিভক্তি চায় এবং মুসলিম লীগ চায় না। কিন্তু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ও দ্বিজাতিতাত্ত্বিক বলে প্রমাণের মতলবে ইদানীং যারা বানোয়াট ইতিহাস গড়গড় করে মুখস্থ বয়ান করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তারা স্পষ্টতই এইসব খবর রাখেন না। কারণ, রাখলে তাদের মতলব হাসেল হয় না। আসলে হিন্দুদের বাংলা ভাগের চেষ্টা শুরু হয়েছিল আরও অনেক আগে।

শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন (দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন বার্তা ও নির্বাহী সম্পাদক) তাঁর "ডেইজ-ডিসাইসিভ" গ্রন্থে (সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা, ১৯৭০) হিন্দুদের এই প্রচেষ্টার একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ১৯৪৭ সালের ৫ই এপ্রিল হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে তারকেশ্বরে যে

www.pathagar.com

..ায় প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে প্রেরিত এক বাণীতে হিন্দু নেতা শ্রী ভি আর সাভারকার বলেন- "প্রথমত পশ্চিমবঙ্গে একটি হিন্দু প্রদেশ কায়েম করতে হবে, এবং দ্বিতীয়ত: যে কোনও মূল্যে আসাম থেকে মুসলিম অনধিকার প্রবেশকারীদের বিতাড়ন করে এই দুইটি হিন্দু প্রদেশের মাঝে ফেলে পূর্ব পাকিস্তানকে পিষে মারতে হবে।"

ঐ সম্মেলনে বাংলার হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য ডকটর শ্যামাপ্রসাদ মুখারজিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তারও আগে ১৯৪৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্ণর ফ্রেডারিক বারোজের সঙ্গে দেখা করার পর ডকটর মুখারজি এক বিবৃতিতে বলেন- "ভারত বিভাগ করা হলে বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ।" সিরাজুদ্দীন হোসেন মন্তব্য করেছেন- "হিন্দু মহাসভার এই দাবীর প্রতি প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অবাঙ্গালী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তারা এই দাবী লুফে নেয়। তারপর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আচার্য কৃপালনী বাংলা বিভাগের সমর্থনে বিবৃতি দিলে বঙ্গ-ভঙ্গের দাবীটি রীতিমত একটি প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়।"

এই পরিস্থিতিতে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি দিল্লী সফরে গিয়ে বুঝতে পারেন যে, কংগ্রেসের উচ্চতর প্রভাবশালী মহল বাংলা ভাগ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আছেন। তখন ১৯৪৭ সালের ২৭শে এপ্রিল তিনি সেখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার দাবী জানান এবং তার সমর্থনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি প্রদর্শন করেন। অনেকের ধারণা সাংবাদিক সম্মেলনের আগে তিনি কায়দে আজমের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। যাহোক, বাংলার লীগ নেতৃবৃন্দ মওলানা আকরম খাঁ, আবুল হাশেম, ফজলুর রহমান প্রমুখ এই দাবী সমর্থন করেন। তাছাড়া বাংলার কংগ্রেস নেতা সৌরিন্দ্র মোহন ঘোষ, কিরণশংকর রায়, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখও স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার পক্ষে সমর্থন জানান। কিন্তু তথাপি তখন সেই স্বাধীন অবিভক্ত বাংলা কায়েম হল না কেন? এই প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানের আগে বড়লাট ভবনের দুইজন লোক সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমজন ভিপি মেনন। সামান্য একজন টাইপিষ্ট হিসেবে চাকুরিতে ঢুকে ক্রমান্বয়ে তিনি বড়লাটের ব্যক্তিগত ষ্টাফের অন্তর্ভুক্ত হন এবং খোদ মাউন্টব্যাটেনের বিশ্বস্ততা অর্জন করেন। অ্যালান ক্যাম্পবেল-জনসন বলেছেন যে, তিনি সরদার বল্লবভাই, প্যাটেলের "অতি বিশ্বস্ত আপনজন" ছিলেন। (১০০ পৃষ্ঠা)। দ্বিতীয়জন ভাইসরয় পত্নী লেডি এডুইনা মাউন্টব্যাটেন। তাঁর সঙ্গে পণ্ডিত

www.pathagar.com

নেহরুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মওলানা আজাদও উল্লেখ করেছেন। (১৮৪ পৃষ্ঠা)।

তবে তার একটি বিবরণ দিয়েছেন লারি কলিনস ও ডোমিনিক লাপিয়ের তাঁদের "ফ্রিডম ও এট মিডনাইট" গ্রন্থে (বিকাশ পাবলিশিং হাউজ, নয়াদিললি, ১৯৭৬-১২৫ পৃষ্ঠা)। তাঁরা বলেছেন- "নেহরু সন্দেহ বা দুশ্চিন্তায় মগ্ন হলে ঐ আকর্ষণীয় অ্যারিসটোক্রাট মহিলার চেয়ে সহজে আর কেউ তাঁকে ভারমুক্ত করতে পারতেন না। তিনি সর্বদা সহানুভূতি, বুদ্ধিমত্তা ও উষ্ণতা বিকীরণ করতেন। প্রায়শ চায়ের পেয়ালায়, মোগল গার্ডেনে পায়চারিতে, কিম্বা বড়লাট ভবনের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে কাটতে মোহিত করে তিনি নেহরুকে দুর্ভাবনামুক্ত করতেন।" আর খোদ মাউন্টব্যাটেন "নেহরুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বকেভারতে তাঁর নিজের অনুসৃত নীতির প্রতি প্রধান সমর্থন বলে গণ্য করতেন।"

এই পটভূমিকা মনে রেখে আমরা স্বাধীন অখন্ড বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে পারি। সংকীর্ণমনা ও সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের ষড়যন্ত্র ও একগুঁয়েমীর ফলে মুসলমানদের স্বাধীন অখণ্ড বাংলা কায়েমের প্রচেষ্টা যে কিভাবে বানচাল হয়ে গেল, সিরাজুদ্দীন হোসেন তাঁর গ্রন্থের ১২৩ পৃষ্ঠার মধ্যে ৬২ পৃষ্ঠা ব্যাপীই তার তথ্য সমৃদ্ধ বিবরণ দিয়েছেন, এবং পরিশিষ্টে সংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজও সংযোজন করেছেন। তাছাড়া ভূমিকায় সাংবাদিক-সাহিত্যিক আওয়ামী লীগ নেতা আবুল মনসুর আহমদও অনেক সাধারণত অজানা তথ্য দিয়েছেন। পক্ষান্তরে লারি কলিনস ও ডোমিনিক লপিয়েরের গ্রন্থখানি ৫০০ পৃষ্ঠার হলেও তাঁদের বিষয়বস্তু সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘটনাবলী হওয়ায় বাংলার জন্য বোধগম্য কারণেই বেশি জায়গা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ২২৪-২২৮ পৃষ্ঠায় তাঁরা স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব বানচাল হওয়ার শেষ পর্যায়ের কাহিনী সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য যে পরিকল্পনা লনডনে পাঠিয়েছিলেন, তাতে ভারতে দুইটি নয়, তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ছিল। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধারণাটি তাঁকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গটি তিনি বঙ্গীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের নজরে আনলে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তিনি তাদের উৎসাহিত করেন। তিনি আরও আবিষ্কার করেন যে, জিন্নাহ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করবেন না। কিন্তু বিষয়টি তিনি নেহরু বা প্যাটেলকে জানাননি। ফলে মনে মনে তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তখন ১৯৪৭ সালের মে

www.pathagar.com

সময় তিনি সিমলায় অবস্থান করছিলেন এবং সেখানে কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে অবকাশ যাপনের জন্য তিনি পণ্ডিত নেহরুকে দাওয়াত করেন।

তাঁর ব্যক্তিগত অফিসারগণ বলেন যে, জিন্নাহকে না জানিয়ে প্রস্তাবটি নেহরুকে জানানো উচিত নয়। তাহলে ব্যাপারটি জিন্নাহর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের শামিল হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের কথায় তিনি কর্ণপাত করেননি। নেহরু সিমলায় আসার পর মাউন্টব্যাটেন তাঁকে "এক গ্লাস পোর্ট" (মদ) পানের দাওয়াত করেন এবং পানাহার শেষে তাঁর হাতে একখানি কাগজ দিয়ে তাঁকে অবসর সময়ে পড়ে দেখতে অনুরোধ করেন। নিজের কামরায় ফিরে এসে নেহরু সেই রাতেই কাগজখানি পড়েন এবং "দেখে আতংকিত হন যে, দুইটি নয়, তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। মাউন্টব্যাটেন বাংলার জন্য যে দরজা খুলে দিয়েছেন, তা ক্রমেই একটি জখমে পরিণত হবে এবং সেই পথে ভারতের সকল রক্ত বেরিয়ে যাবে। ভারতের ফুসফুস কলকাতা বন্দরও হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাছাড়া কংগ্রেস তহবিলের অর্থ জোগানদার শিল্পপতিগণ কলকাতার চারপাশে যে সকল কাপড়ের কল স্থাপন করেছেন, তাও বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। তিনি রাগে গরগর করতে করতে পাশের কামরায় গিয়ে কৃষ্ণমেননকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। তারপর তাঁর বিছানায় একখানি কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বললেন- এই দেখুন! সব খতম!" পরদিন সকালেই নেহরু একখানি কড়া চিঠি লিখে মাউন্টব্যাটেনকে জানালেন যে, পরিকল্পনায় যে "খণ্ডবিখণ্ড, বিরোধ ও বিশৃংখলা" সৃষ্টির প্রস্তাব আছে, তা কংগ্রেসের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাটি রদবদলে তাকে সহায়তা করার জন্য আরও একরাত থেকে যাওয়ার অনুরোধ করলে নেহরু তা কবুল করেন। তারপর একদিনের মধ্যেই রদবদল করা হয় এবং এই কাজে ভিপি মেনন বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। নতুন পরিকল্পনায় ভারতের প্রদেশগুলিকে একটিমাত্র পছন্দ দেওয়া হল। হিন্দুস্থান অথবা পাকিস্তানে যোগ দিতে হবে। এবং এই পছন্দ প্রাদেশিক পরিষদে ভোটাভুটির মারফত প্রকাশ করতে হবে। "এইভাবে স্বাধীন অখণ্ড বাংলার স্বপন শেষ হয়ে গেল।" (ফ্রিডম এট মিডনাইট, ১২৭ পৃষ্ঠা)। এই পরিবর্তিত পরিকল্পনা নিয়ে মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে লনডন যান এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তা অনুমোদন করিয়ে আনেন।

সুতরাং দেখা যায় মুসলমানগণ স্বাধীন অখণ্ড বাংলাকায়েমের দাবীতে অটল থাকলেও শেষপর্যন্ত ইংরেজদের সক্রিয় সহযোগিতায় সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতাত্ত্বিক হিন্দুগণ তা বানচাল করে দেন। অথচ আশ্চর্য! ইদানীং এক শ্রেণীর তথাকথিত প্রগতিশীল লেখক নির্লজ্জের মত হামেশা তাদের বানোয়াট ইতিহাস বয়ান করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

সংসক্তি-চ
ভারত বিভাগ কেন হল?

"আমরা পছন্দ করি বা না করি ভারতে দুইটি জাতি আছে। মুসলমান ও হিন্দুদের এক জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। এই সত্য স্বীকার করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ নেই। একমাত্র এই পথেই হিন্দু-মুসলিম ঝগড়ার মীমাংসা করা যেতে পারে। দুই ভাই একত্রে বাস করতে না পারলে পৃথক হয়ে যায়। এবং সম্পত্তি ভাগাভাগির পর তারা আবার পরস্পরের বন্ধু হয়ে যায়। কিন্তু তাদের যদি একত্রে বাস করতে বাধ্য করা হয়। তাহলে তারা প্রত্যেক দিনই ঝগড়া করে। সুতরাং প্রত্যেক দিন ঝগড়া করার চেয়ে একদিন একবার ঝগড়া করে পৃথক হয়ে যাওয়াই উত্তম। ভারত বিভাগ কোনও দুর্বলতা বা বাধ্যবাধকতার কারণে করা হচ্ছে না। এই প্রস্তাব এই জন্য করা হচ্ছে যে, এটাই একমাত্র প্রকৃত সমাধান।" এই যুক্তি মুসলিম লীগেরও নয়, কিম্বা তার প্রেসিডেন্ট কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহরও নয়। এই যুক্তি দিয়েছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা সরদার বল্লভভাই প্যাটেল। আজীবন মুসলিম লীগ বিরোধী এবং স্বাধীন অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামকারী কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর "ইনডিয়া উইনস ফ্রিডম" গ্রন্থে সরদার প্যাটেলের ঐ যুক্তি উধৃত করেছেন। (ওরিয়েন্ট লংম্যানস, কলকাতা, ১৯৫৯ --১৮৫ ও ১৯৭ পৃষ্ঠা)। সাম্প্রাদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের জন্য এককভাবে ও সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের উপর দোষারোপ করে ইদানীং যারা হিন্দু, কংগ্রেস ও সেই সঙ্গে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিবাদী ও অসাম্প্রদায়িক বলে জাহির করার চেষ্টা করেছেন, উধৃতিটি সম্ভবত সরাসরি তাদের চোখের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। মওলানা আজাদ বলেছেন- "তিনি (সরদার প্যাটেল) প্রকাশ্যেই বললেন যে, মুসলিম লীগকে ভাগিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে তিনি তাদের ভারতের অংশবিশেষ দিয়ে দিতেও রাজি আছেন।" (১৮৩ পৃষ্ঠা) । এই উক্তিতে কি প্যাটেল বাবুর ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে?

উল্লেখযোগ্য যে, অখণ্ড স্বাধীন ভারত কায়েমের জন্য যে ক্যাবিনেট মিশন প্লান কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি যা হাউজ অব কমনসে ঘোষণা করেছিলেন, তা পণ্ডিত নেহরুর একটি দুর্ভাগ্যজনক উক্তির জন্য ভণ্ডুল হয়ে যায়। তিনি

www.pathagar.com

...ছিলেন যে, কংগ্রেসের ঐ প্লান রদবদল করার অধিকার থাকবে। তাঁর এই মন্তব্যের পরই মুসলিম লীগ সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের কোনও নেতা নেহরুর মন্তব্যের কোনও প্রতিবাদ করেননি এবং কংগ্রেসের পরবর্তী সভায় বিষয়টি উল্লেখ পর্যন্তও করা হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ক্যাবিনেট মিশন প্লান যখন কংগ্রেসের সভায় পাশ হয়, তখন মওলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। আর পণ্ডিত নেহরু যখন ঐ প্লান-ভণ্ডুল করার বিবৃতি দেন, তার মাত্র কিছুদিন আগেই তিনি কংগ্রেসের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরই ১৯৪৭ সালের ২৪শে মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন লর্ড ওয়াভেলের স্থলে ভারতের ভাইসরয় ও গবর্ণর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এটলি সরকারের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে আসেন যে, ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুনের আগে অবশ্যই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তাঁর প্রেস এটাচি অ্যালান ক্যাম্পবেল-জনসন বলেছেন যে, ইতিমধ্যে কলকাতা, বিহার, বোমবাই, লাহোর, অমৃতসর, তক্ষশীলা ও রাওয়ালপিণ্ডিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছিল। "এই পটভূমিকায় কংগ্রেস ও লীগ প্রেসিডেন্টদ্বয় পৃথক পৃথকভাবে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, অতি শীঘ্র একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত না হওয়া গেলে তাঁরা নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারবেন না।" (মিশন ইউথ মাউন্টব্যাটেন, জয়কো পাবলিশিং হাউজ, বোমবাই, ১৯৫১ ২ পৃষ্ঠা)। মওলানা আজাদের তখনও একটি "ক্ষীণ আশা" ছিল যে, ক্যাবিনেট মিশন প্লান ঐ পর্য্যায়েও সম্ভবত প্রবর্তন করা যেতে পারে এবং প্রথম সাক্ষাতেই তিনি মাউন্টব্যাটেনকে সেকথা বললেন। তাঁর কাছ থেকে সাড়া পেয়ে তিনি জিন্নাহ ও নেহরুর সঙ্গে কথা বলেন। ঐ প্লানে আসাম ও বঙ্গদেশকে যে একই গ্রুপভুক্ত করা হয়েছিল তাতে কংগ্রেস আপত্তি জানাল। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের তরফ থেকে বলা হয় যে, প্লানটি যেভাবে প্রণীত হয়েছে সেইভাবেই মেনে নিতে হবে। এই পর্যায়ে কোনও রদবদল করা যাবে না। মওলানা সাহেব বলছেন- "লীগের বক্তব্য আনুষ্ঠানিকতা ও আইনগত দিক থেকে সঠিক হলেও নৈতিক ও রাজনৈতিকগত দিক থেকে দূর্বল ছিল।" তথাপি তিনি এই বিষয়ে মাউন্টব্যাটেনকে সালিশ মানার প্রস্তাব দেন। কিন্তু জওয়াহেরলাল বা সরদার প্যাটেল, কেউই এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না।" (১৮২ পৃষ্ঠা)। এইভাবে ভারতকে অবিভক্ত রাখার জন্য মওলানা সাহেবের শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মাউন্টব্যাটেন ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশ বিভাগের চিন্তাভাবনা শুরু করে

www.pathagar.com

দিয়েছেন। "আমি অবশ্যই লিখে রেখে যেতে চা[illegible], মাউন্টব্যাটেনের ভারত বিভাগের ধারণার প্রতি ভারতে সর্বপ্রথম যি[illegible]ন জানান তিনি হচ্ছেন সরদার প্যাটেল। আমি দুই ঘণ্টা যাবত তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু তিনি ভারত-বিভাগ ছাড়া অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গির কথা শুনতেও রাজি নন।" ক্রমে ক্রমে দেখা গেল নেহরুও নরম হয়ে এসেছেন। মওলানা সাহেবের ধারণা সরদার প্যাটেল এবং কৃষ্ণমেননই তাঁকে প্রভাবিত করেছেন। "কিন্তু তাঁকে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন লেডি এডুইনা মাউন্টব্যাটেন। এই মহিলা কেবল অতিশয় বুদ্ধিমতীই ছিলেন না অতিশয় আকর্ষণীয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী ছিলেন।" নেহরুর এই পরিবর্তনে মওলানা সাহেব ব্যথিত হলেন। "আমি জওয়াহেরলালকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললাম, আমরা যদি দেশ বিভাগ মেনে নিই তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। ইতিহাস এই রায়ই দেবে যে, ভারত-বিভাগে মুসলিম লীগের যতোখানি ভূমিকা ছিল কংগ্রেসেরও ঠিক ততখানি ভূমিকাই ছিল।"

কয়েকদিন পর মওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসে জওয়াহেরলাল "দেশবিভাগের বিরোধিতা থেকে আমাকে বিরত থাকতে বললেন। তিনি বললেন, দেশবিভাগ অবশ্যম্ভাবী এবং যা অবশ্যম্ভাবী তার বিরোধিতা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি আরও বললেন যে, আলোচনায় যদি প্রসঙ্গটি এসে যায় তাহলে এই ব্যাপারে আমি যেন মাউন্টব্যাটেনের বিরোধিতা না করি।" (১৮৩-১৮৬)।

তারপর মওলানা আজাদ দেখা করতে গেলে গান্ধীজি বললেন- "মনে হয় বল্লভভাই ও জওয়াহেরলাল আত্মসমর্পণ করেছেন। তবে কংগ্রেস যদি দেশবিভাগ মেনে নিতে চায়, তাহলে তা আমার লাশের উপর দিয়ে মেনে নিতে হবে। আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত দেশবিভাগ মেনে নেব না।" কিন্তু কয়েকদিন পর মওলানা সাহেব যখন আবার দেখা করলেন তখন "আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত পেলাম। গান্ধীজি ভারত বিভাগের পক্ষে সরদার প্যাটেলের যুক্তিগুলিই আমাকে শুনিয়ে দিলেন। তাঁকে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় যাবত বুঝিয়ে যখন কোনও ফায়দা হল না, তখন আমি হতাশ হয়ে বললাম, এখন আপনিও যদি এই কথা বলেন তাহলে ভারতকে বিপর্যয় থেকে রক্ষার আর কোনও আশা দেখি না। গান্ধীজি আমার কথার কোনও জবাব দিলেন না। তবে বললেন, তিনি এই মর্মে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন যে, সরকার গঠন ও মন্ত্রিসভার সদস্য বাছাইয়ের জন্য আমাদের মিষ্টার জিন্নাহকে অনুরোধ করা উচিত। পরদিন আমি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বললেন যে,

www.pathagar.com

ক[illegible]া যদি গান্ধীজির প্র[illegible] মেনে নেয়, তাহলে এখনও দেশবিভাগ এড়ানো যায়। কারণ, ঐ প্রস্তাব [illegible] হলে মুসলিম লীগের আস্থা ফিরে আসবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জওয়াহেরলাল ও সরদার প্যাটেল প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে গান্ধীজিকে বাধ্য করেন।" (১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা)। এইভাবে খোদ গান্ধীজির শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। তার পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থের প্রস্তাবক্রমে ভারত বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি পেশ করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ প্রমুখ। মওলানা আজাদ বলেছেন- "এই সম্পূর্ণ নতজানু আত্মসমর্পণ বরদাশত করা অসম্ভব ছিল। জন্ম থেকে কংগ্রেস যা বলে এসেছে এই প্রস্তাব কি তার সম্পূর্ণ বিরোধী নয়? কংগ্রেসে সর্বদাই এমন কিছু লোক সক্রিয় থেকেছেন, যারা জাতীয়বাদীর ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকেন, কিন্তু আসলে তারা ঘোরতর সাম্প্রদায়িক। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরাই অবিভক্ত ভারতের সমথক সেজে হঠাৎ পাটাতনে উঠে পড়েছেন।" (১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা)।

মওলানা আজাদ কাদের সাম্প্রদায়িক বলেছেন? কাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন?

[ইনকিলাবের সৌজন্যে-ইনকিলাব-১/৮/৮৮

www.pathagar.com

সংসক্তি--

মহারাষ্ট্র পুরান

"বর্গীদের অত্যাচার সম্বন্ধে সম সাময়িক গঙ্গঁরাম কর্তক রচিত মহারাষ্ট্র পুরান হইতে কয়েক ছত্রঃ

ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল
বরগির ভয়ে সব পলাইল।।
চাইর দিগে লোক পালাএ ঠাঞি ঠাঞি।
ছত্তিস বর্নের লোক পালাএ তার অন্ত নাঞি।।
এই মতে সব লোক পালাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে।।
মাঠে ঘেরিয়ে বরগি দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া।।
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারো বধয়ে পরান।।
ভালো ভালো স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া যাএ।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ।।
এক জনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে
রমনের ভরে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করে।।
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া।।
তবে মাঠে লুটিয়া বরগি গ্রামে সাধাএ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ।
বাঙ্গাঁলা চৌআরি যত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব।।
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দিকে বরগি বেড়াএ লুটিয়া।।
কাহুকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠ মোড়া।

www.pathagar.com

চি[illegible]রা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া।
রু[illegible]রুপি দেহ বোলে বারে বারে।
রুপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে।।
কাহুকে ধরিয়া বরগি পখইরে ডুবাএ।
ফাফর হইঞা তবে কারু প্রাণ জাএ।।
--মহারাষ্ট্র পুরাণ- চিন্তয়সী সংস্করণ, ১৩৭৩"--

(বাংলাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগ- ভারত তত্ত্ব ভাস্কর
শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, এম, এ, পি এইচ, ডি, ডি-লিট-সম্পাদিত।
পৃ- ১৪৯-১৫০)

উপরোক্ত ছত্র গুলি মারাঠা বর্গী, শিবাজী ও মারাঠা ধর্ম রাজ্যের যে বীভৎস চিত্র উৎঘাটিত করে, শিবাজী ও মারাঠা বন্দনা কাব্যের কবি জগৎ কবি গুরু শ্রী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের যে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী ইমেজ দিবালোকের মতো উদভাসিত করে তা কী রবীন্দ্র মানস পুজারী বৃন্দকে কোন প্রকার বিবেক দংশনে সচকিত করে না? এখনও কি হিন্দু ললনাদের হৃদয়ে এই সব নর পিশাচদের ধান দূর্ব্বা হুলুধ্বনি দিয়ে বরণ করবার সাধ জাগে? রবীন্দ্র মানস মোহান্ধ রবীন্দ্র ভক্তদের মোহ আর কবে ভাঙবে? ধিক্ রবীন্দ্রনাথ-- শতধিক্ এই রবীন্দ্র মানস পুজারী বৃন্দ! দেশ ব্যাপী সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততায়, রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, তথাকথিত ধর্ম্ম নিরপেক্ষ ভারতে প্রায় চারিশত বৎসরের পুরাতন বাবারী মসজিদ ধর্ম্মান্ধ হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক ধ্বংসের অত্যল্প কাল পরেই গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে- বোম্বাই-এ মুসলিম কুলললনাদের উপর অকল্পনীয় পাশবিক অত্যাচারের কথা দুনিয়া এখনও বিস্মৃত হয়নি। হালাকুখানের বাগদাদ ধ্বংসের কাহিনীকে লজ্জাদেয়া এই পাশবিক জুলুমের স্বীকার অসহায়া মুসলিম নারীদের "রহম করো, রহম করো"- করুণ আহাজারিতে-আর্তনাদে-এবার অল্লাহর অপ্রতিরোধ্য গজব নেমে এসেছে- ভূমিকম্প, প্লেগ, সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া নামে মহামারী রূপে! শত্রু মিত্র হুশিয়ার!

www.pathagar.com

ছবি পরিচি

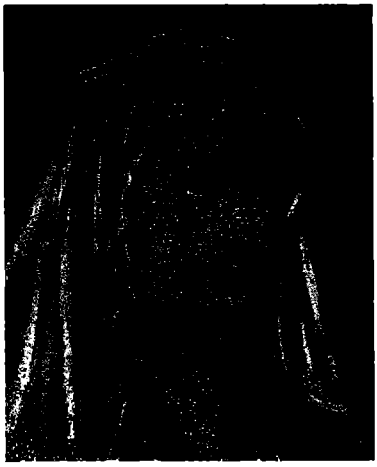

সিন্ধু বিজেতা মুহম্মদ বিন কাশেম

মীরজা মোগল বাহাদুর শাহের একপুত্র (শহীদ)
(১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের শহীদ)

সুলতান মুহম্মদ ঘোরী

ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্

www.pathagar.com

ব পরিচিতি

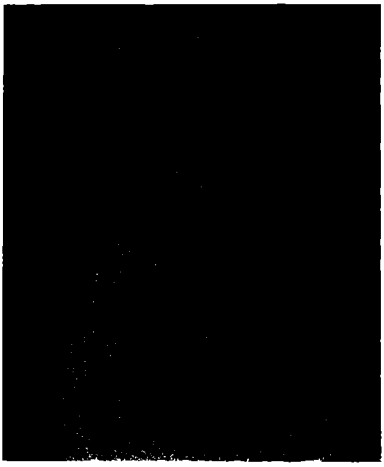

সুলতান মাহমুদ গজালী

শেরে-বাংলা ফজলুল হক

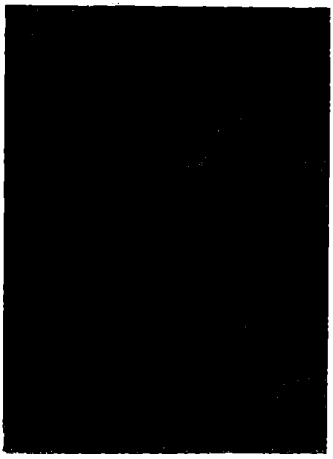

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

আবুল হাশিম

www.pathagar.com

ছবি পরিচিতি

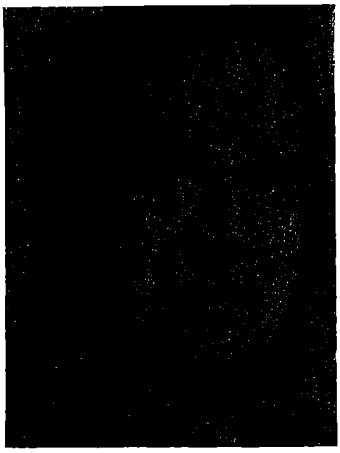

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল

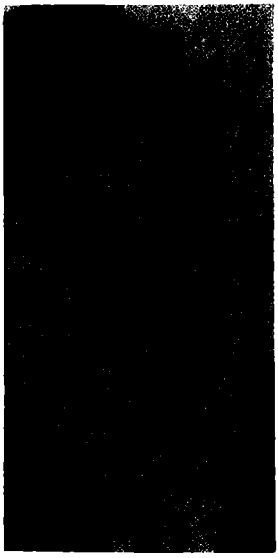

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্

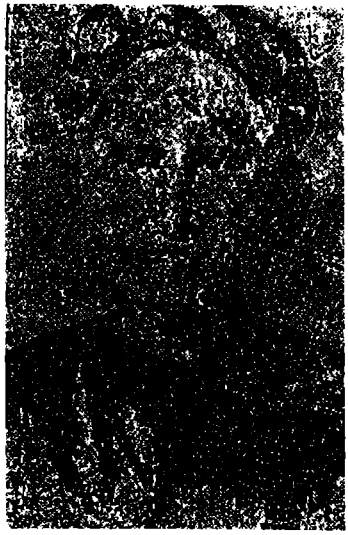

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টপাধ্যায়

www.pathagar.com

পরিচিতি

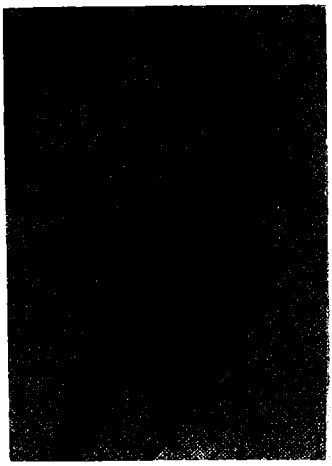

করম চাঁদ গান্ধী

পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু

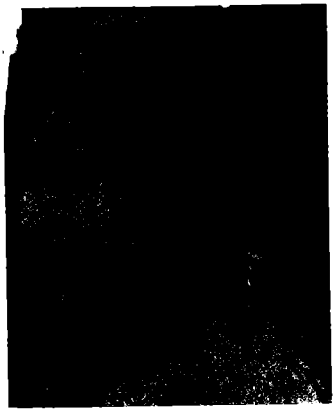

ইন্দিরাগান্ধী

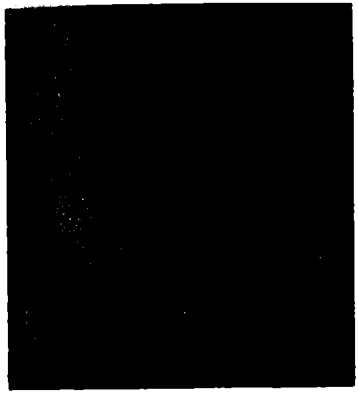

শেখ মজিবুর রহমান

www.pathagar.com

ছবি পরিচিতি

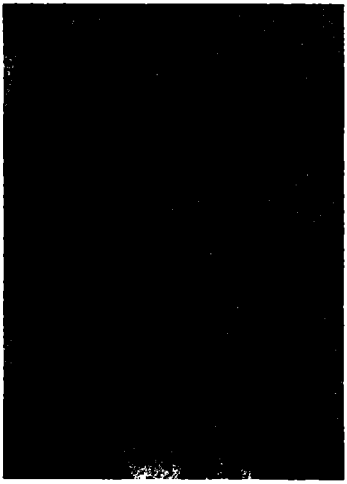

জেনারেল জিয়াউর রহমান

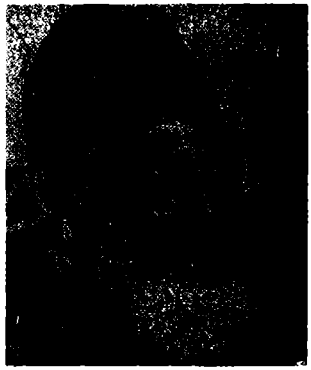

গোলাম আযম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

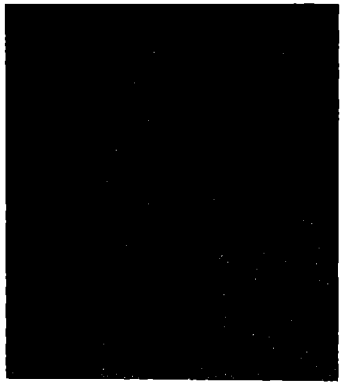

কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

ছাবি পরিচিতি

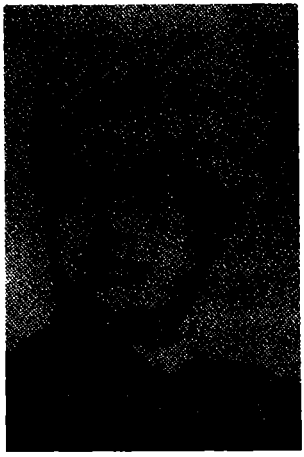

স্বামী বিবেকানন্দ

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

আবু আহম্মদ ফজলুল করীম, এম, এ, (ইকনমিক্স-পলিটিক্স)- ১৯৩৩। জন্ম-৩১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫, সাহিত্য জীবন----১৯৩১ হতে।

লেখা প্রকাশিত হয় ঃ-

ছাত্র-জীবনে ঃ- (১৯৩১-৩৩) ঢাকা ইউনিভার্সিটি মুসলিম হল ম্যাগাজিন, দ্বিসাপ্তাহিক-চাবুক (ঢাকা) ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন ঃ-প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা।

চাকুরী জীবনে-বিভাগ পূর্ব্ব যুগে কলিকাতায়-(১৯৩৪-১৯৪৭)

মাসিক মোহাম্মাদী (কলিকাতা) বুলবুল, শনিবারের চিঠি, দৈনিক আজাদ, (কলিকাতা) ও বঙ্গশ্রী ঃ-

গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটক ঃ

চাকুরী জীবনে-বিভাগোত্তর কালে-(ঢাকায়) ঃ (১৯৪৮-৬৫) দৈনিক আজাদ, (ঢাকা) মাসিক মোহাম্মাদী, (ঢাকা), আলাপনী, মাহে নও ঃ নতুন দিন ও নকশা ঃ- গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটক।

অবসর জীবনে- (ঢাকায়)-(১৯৬৬-৯৫) ঃ দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক জাহানে নও, মাসিক দুর্ব্বার দৈনিক সংগ্রাম, ত্রৈমাসিক/মাসিক কলম, দৈনিক মিল্লাত ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ঃ- গল্প ও প্রবন্ধ। এ ছাড়া আছে অপ্রকাশিত বহু গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটক। বর্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে আটাশ টি বই। (১) পাঁচটি গল্প সংহিতা ঃ- টি, বি, র রোমান্স, হাওয়া বদল, একটি মিথ্যা কথা, তেজগাম ও বি, বি, আ, না, (২) দুইটি কবিতা সংহিতা- বসন্ত বায়স (প্রকাশিত) ও উত্তর বসন্তবায়স (৩) ছয়টি উপন্যাস ও বড় গল্প ঃ রক্তের টান, দেবদাসের পার্ব্বতী 'নব পর্য্যায়, গণনারী সম্মেলন ও কয়েকটি সাক্ষাৎকার, গল্পনয়, যে গল্প কথা কয়, স্মৃতির মুকুরে। (৪) বারোটি নাটক ঃ- স্বর্গ ভ্রষ্ট, তকদীরের খেলা, কানিজা, তারকার মৃত্যু, গন্ধ বিধুর ধূপ, লপেটা মঙ্গল, বহবারম্ভে, বাবুরচি, কলমী দোস্তী, দুই সকালের রোমান্স, (দুই চরিত্রের নাটক) ইজ্জতের দায়ে, ক্রান্তিকালের রোমান্স (এক চরিত্রের নাটক Monoloque জাতীয়।

(৫) একটি প্রবন্ধ সংহিতাঃ পাঁচ মিশেলি।

(৬) আমাদের জাতীয়তা বাদ সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ (বিভ্রান্ত নিশান) (৭) নজরুল সম্বন্ধে মৌলিক চিন্তাধারা সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ, (একটি বিতর্কিত যুগ প্রতিভা) এবং (৮) নজরুলের প্রথমা স্ত্রী নার্গিস আসার খানম ও দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রমীলা সম্বন্ধে অভিনব তথ্য সম্বলিত গবেষনা মূলক রচনা -(নার্গিস নজরুল ও প্রমীলা নজরুল।)

প্রথম দিকের লেখাগুলি প্রকাশিত হয় আবু আহমদ ফজলুল করীম, এ, এ, ফজলুল করীম, এ, এ, এফ, করীম, ফজলুল করীম ও শনি ঠাকুর নামে প্রাগ বিভাগযুগে- বিভাগোত্তর যুগে আল করীম, জরীন চশম ও দিলফেরেব, ইবনুল হক এইসব ছদ্ম নামেও অনেক লেখা প্রকাশিত হয়।

বাবুরচি নাটক-রেডিও বাংলাদেশ হতে প্রচারিত হয় (১০/৯/৮৩)।